বঙ্গীয় মৃৎশিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতি (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতক): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পি এইচ ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

সায়নী রায়

রেজিস্ট্রেশন নং - AOOHI1100619

রেজিস্ট্রেশন তারিখ - 21.08.2019

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী মুখার্জী

সহযোগী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৫

Certified that the Thesis entitled

'বঙ্গীয় মৃৎশিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতি (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতক): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Chandrani Banerjee Mukherjee and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:

Dated:

Candidate:

Dated:

DECLARATION

I, Ms. Sayani Roy, **Registration No. - AOOHI1100619 (Dated 21.08.2019)** do hereby declare that the dissertation titled **বঙ্গীয় মৃৎশিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতি (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতক): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা s**ubmitted by me in order to fulfill the partial requirement for the degree of PhD in Arts at the department of History, Jadavpur University.

This work is original and was prepared by me under the supervision of Dr. Chandrani Banerjee Mukherjee, Associate Professor of History, Jadavpur University. The research committee approved it, and no part of it has been submitted anywhere else for any other degree or diploma.

Sayani Roy

Date: (Signature of the Student)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার পি এইচ ডি উপাধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণা পত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে। এই কাজটি সম্পূর্ণ করার পশ্চাতে একাধিক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের অবর্ণনীয় ভূমিকা রয়েছে, যাদের সক্রিয় উদ্যোগ ও সহায়তা ব্যতীত বর্তমান গবেষণা পত্রটি হয়তো অসম্পূর্ণই থেকে যেত।

প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-কে, যারা আমাকে এই গবেষণা কার্যটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী মুখার্জী মহাশয়ার নিকট। তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও সুপরামর্শ ব্যতীত আমার গবেষণা পত্রটি রূপায়িত হওয়া সম্ভব ছিলনা। তাঁর অধীনে কৃত এম.ফিল এর মধ্য দিয়েই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গবেষণা পর্বের যাত্রার সূচনা। উক্ত সময় থেকেই অদ্যাবধি তাঁর ক্রমাগত উৎসাহ, পরামর্শ, বিপুল সহযোগিতা ও অপরিসীম স্নেহ এই গবেষণা নিবন্ধটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বদা আমার প্রধান পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। আমার প্রতি তিনি সর্বদা যে ধৈর্য ও ভরসা প্রদর্শন করেছেন এবং জীবনের অত্যন্ত কঠিন সময়গুলিতেও যেভাবে পাশে থেকেছেন তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার আরএসি সদস্য প্রফেসর নূপুর দাশগুপ্ত ম্যামকে। এম.ফিল এবং পি এইচ ডি কালীন দীর্ঘ গবেষণা পর্বের প্রতি মুহূর্তে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ, ব্যতিক্রমী চিন্তন, অফুরন্ত সহযোগিতা আমাকে ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে এবং প্রকৃত ইতিহাস বোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা আদতেই কঠিন। তাঁর প্রজ্ঞা, উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং অফুরন্ত সমর্থন সামগ্রিকরূপে আমার গবেষণা পত্রটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বদাই অন্যতম প্রধান শক্তি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছে। একইসাথে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার অপর আরএসি সদস্য ড. সমর্পিতা মিত্র ম্যামকে। এই দীর্ঘ পিএইচডি কালীন পর্বে নানা ভাবে তাঁর সুচিন্তিত, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং অভিনব চিন্তন বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে আমার গবেষণা পত্রের যথাযথ রূপদানের ক্ষেত্রে। আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এবং আরএসি সদস্যগণ সকলের বিপুল সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান ব্যতীত আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধটি যে সম্পন্ন হতনা বলা বাহুল্য। শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁরা সর্বদা যেভাবে আমার

পাশে থেকেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন আমি প্রকৃতই তাঁদের সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ। এই উপলক্ষে তাঁদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ড. দেবজিৎ দত্ত, ড. তিলোত্তমা মুখার্জী ও শ্রী সমীর দাস মহাশয়কে বিভিন্ন সময় আমাকে নানান অমূল্য পরামর্শ ও সাহায্য প্রদানের জন্য। পাশাপাশি আমার বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দদের কাছেও বিভিন্ন সময় নানান সহায়তা ও পরামর্শ পেয়েছি। তাঁদের প্রতিও আমার ধন্যবাদ ও প্রণাম।

আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গৌতম সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকট। নানান ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমায় তাঁর মূল্যবান সময় প্রদান করেছেন এবং আমার গবেষণা সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ আমার একাধিক দ্বিধার অবসান সহ আমার গবেষণা পত্রের সার্বিক রূপনির্মাণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. রজত স্যান্যাল স্যারকে। এম.ফিল পর্বে আমার পরীক্ষক রূপে স্যারের সাথে প্রথম পরিচয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত গবেষণা সংক্রান্ত যেকোনো পরামর্শ বা যেকোনো সমস্যায় বারংবার স্যারের কাছে উপস্থিত হয়েছি এবং স্যার সর্বদা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে পথপ্রদর্শক রূপে পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ, অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই আমার গবেষণা পরিসরে বিশেষ রূপে আমাকে সহায়তা করেছে। সর্বোপরি আমার গবেষণা ক্ষেত্রের বিপুল অংশ জুড়ে রয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষা নির্ভর আলোচনা। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার কিংবা বাংলাদেশ সর্বত্র ক্ষেত্র সমীক্ষায় স্যারের বিপুল অবদান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ, পরামর্শ এবং সহযোগিতা ছাড়া আমার ক্ষেত্র সমীক্ষা হয়তো অসম্পূর্ণই থেকে যেত।

পাশাপাশি অন্যান্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান তথা একাধিক গ্রন্থাগার ও সংগ্রহালয়ের প্রতিও আমি দায়বদ্ধ ও কৃতজ্ঞ যেখান থেকে সমগ্র গবেষণা পর্ব জুড়ে একাধিক সহযোগীতা লাভ করেছি। যেমন- প্রথমেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিকদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, যারা বিভিন্ন সময়ে নানান রকম ভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং সেখানকার সকল কর্মীবৃন্দকে বিভিন্ন সময় নানান সহযোগিতার জন্য। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অন্যান্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে, যথা- জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার এর গ্রন্থাগার,

সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস অ্যান্ড ট্রেনিং-ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়ার গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহালয়, চন্দ্রকেতুগড় স্মৃতি শহীদুল্লাহ মহাবিদ্যালয় এর সংগ্রহশালা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা, ভারতীয় সংগ্রহালয় এবং তাদের গ্রন্থাগার, বিহার সংগ্রহালয়, বিক্রমশীলা সংগ্রহালয়(অ্যান্টিচক) প্রভৃতি এই সকল প্রতিষ্ঠান এবং সকল কর্মীবৃন্দের নিকট আমি আন্তরিকরূপে কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন সময় এসকল বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সংগ্রহালয় থেকে প্রয়োজনীয় অসংখ্য উপাদান সংগ্রহ করেছি যা আমার গবেষণা পত্রের অপরিহার্য অংশ।

পাশাপাশি উল্লেখ করব আমার গবেষণা পরিসরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশে কৃত আমার ক্ষেত্রসমীক্ষা। আর সেক্ষেত্রে একাধিক মানুষের ভূমিকা রয়েছে যাদের অবদান অসামান্য। প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সহিদুল হাসান স্যারকে, যিনি বাংলাদেশের দীর্ঘ ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্বে অভিভাবকের ন্যায় আমাকে আগলে রেখেছেন, প্রয়োজনীয় সমস্ত পরামর্শ দিয়েছেন, এক বার বলাতেই সমস্ত প্রায় অসম্ভব কিছুকে সম্ভব করে দিয়েছেন। তিনি সক্রিয় উদ্যোগে ঢাকা এবং রাজশাহীতে আমার ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্বে সেখানে থাকার যথাযথ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এমনকি তার পরেও দ্বিতীয়বার কনফারেন্স এ অংশগ্রহনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে গেলেও স্যারের বিপুল সহযোগিতা ও আতিথেয়তা আমাকে আদতেই ঋণী করে রেখেছে। পাশাপাশি ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানাই সহিদুল স্যারের ছাত্র ছাত্রীদের যারা ঐ সময়ে আমাদের পাশে থেকেছে, বিশেষত কৃতজ্ঞতা জানাই জাবেদুল হাসান এবং কাওছারা বেগমকে যাদের অনবদ্য আতিথেয়তা কখনো ভোলার নয়। সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক শ্রী স্বাধীন সেন স্যারকে, যিনি সক্রিয় উদ্যোগে বগুড়া, কুমিল্লা, নওগাঁতে অবস্থিত বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীন অতিথিশালা গুলিতে আমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যা এই যাত্রাকে বৃহৎ মাত্রায় সহজ করে তুলেছিল। এই সূত্রে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে।

পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে এবং সংগ্রহালয়ের মূল্যবান প্রত্নসম্পদের ছবি সংগ্রহের ক্ষেত্রে অপরিসীম সহযোগিতার জন্য। এই উদ্দেশ্যে ঢাকার বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, নওগাঁর পাহাড়পুর মিউজিয়াম, কুমিল্লার ময়নামতী মিউজিয়াম, বগুড়ার মহাস্থান মিউজিয়াম, রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম এবং তাঁদের মিউজিয়াম কিউরেটর, অন্যান্য পদাধিকারী বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক

কৃতজ্ঞতা জানাই। একইসাথে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সহযোগী পরিচালক মহম্মদ আমিরুজ্জামান, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক এ কে এম সৈফুর রহমান প্রমুখের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণার ক্ষেত্রে নানান সময়ে নানাভাবে আমাকে সহায়তা করার জন্য আমি আরও কিছু মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইব। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমার সহগবেষক ঋত্বিক বাগচীকে, যাদবপুরের একদম শুরুর দিকেই যার সাথে পরিচয়। বিভিন্ন অফিসিয়াল খুঁটিনাটি থেকে দুর্মূল্য বই এর সন্ধান, কিংবা গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা বা পরামর্শ সব ক্ষেত্রে তাকে বারংবার বিরক্ত করেছি এবং অফুরন্ত সাহায্য পেয়েছি। সর্বোপরি বাংলাদেশের দীর্ঘ ক্ষেত্রসমীক্ষায় একসাথে যাত্রায় অপরিসীম সমর্থন এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পাশে থাকার জন্য ঋত্বিককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সবসময় পাশে থাকার জন্য, আমাকে ভালো রাখার জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা শিল্পী ও ধৃতীকে। এছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপিকা প্রীতা ভট্টাচার্য দিদি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য গবেষকবৃন্দ প্রিয়ংকরাদি, পৌলমিদি, মনীষা, দেবজ্যোতি, আফতাব, মুন্না, পুরঞ্জয়, প্রসেনজিৎ দা, নন্দদুলাল প্রমুখ সকলকে গবেষণা পর্বের বিভিন্ন সময়ে নানান সংশয়, নানান সমস্যায় নির্দ্বিধায় পাশে থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এই বিভাগের বাইরেও একাধিক মানুষ রয়েছে এই সময়ে যারা আমায় অফুরন্ত মানসিক শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ভালোবাসা জানাই আমার বন্ধু কৌশিক, রূপা, শুভেন্দু ও মৌমিতাকে এত বছর ধরে আমাকে সহ্য করার জন্য এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে আমার পাশে থাকার জন্য, মানসিক শক্তি প্রদানের জন্য। এছাড়া অবশ্যই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে আমার রুমমেটরা দেবাঞ্জনা, রুনু, ইন্দ্রাণী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানাই আমার পাশে থাকার জন্য এবং আমার পিএইচডি র দিনগুলিকে অত্যন্ত সুন্দর ও স্মরণীয় করে তোলার জন্য।

সবশেষে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই আমার পরিবারের প্রতিটি মানুষকে যাদের অদম্য প্রচেষ্টা, বিশ্বাস, সহযোগিতা ও আশীর্বাদ আমাকে মানসিক দৃঢ়তা প্রদান করে এসেছে সর্বদা। তাঁদের সমর্থন ও ভালোবাসা ব্যতীত আমার গবেষণা জীবনের এই অধ্যায়ে প্রবেশ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হতনা। প্রথমেই আমার বাবা স্বর্গীয় শ্রী সুভাষ রঞ্জন রায়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। গবেষণা পর্বেই আমি হারিয়েছি আমার অত্যন্ত কাছের বহু মানুষকে, যাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সীমাহীন

ভালোবাসা ব্যতীত আমি, আমার সার্বিক শিক্ষাজীবন আদতেই অসম্পূর্ণ। আমার দুর্ভাগ্য, যে তাঁদের জীবদ্দশায় আমার গবেষণা পত্রটি তাঁদের চাক্ষুষ দেখানোর সুযোগ পেলাম না, অথচ এই মানুষগুলিকে বাদ দিলে আমার অস্তিত্ব কতখানি আমার জানা নেই। যার মধ্যে প্রথমেই প্রণাম জানাই আমার মেসো স্বর্গীয় শ্রী সুব্রত রাহাকে, যার ভালোবাসা, জ্ঞান, সুপরামর্শ, সমর্থন, অমূল্য বই এর সম্ভার প্রত্যক্ষভাবে গবেষণার পরিসরে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আন্তরিক প্রণাম জানাই আমার জেঠু স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন রায়কে, সারা জীবন যিনি অভিভাবক রূপে নিজ ছত্রছায়ার মধ্যে ভালোবাসায় আগলে রেখেছিলেন আমাকে, যে কোনও পরিস্থিতিতে পাশে ছিলেন। সবশেষে বলব আমার ছোটপিসি স্বর্গীয়া কৃষ্ণা রায়ের কথা, যার আকস্মিক অনুপস্থিতিতে আমি এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। আমি নিশ্চিত, ঠিক তাঁর মত করে আমাকে আর কেউ ভালবাসবেনা। আমার জীবনে তাঁর উপস্থিতি, ভূমিকা কোনকিছুই ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এই মানুষগুলিকে।

আমি কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের অন্যান্য প্রতিটি মানুষের নিকট যাদের অবদান আমার জীবনে অপরিসীম। এই উপলক্ষে প্রণাম জানাই আমার মা রীতা রায়কে, যার অক্লান্ত পরিশ্রম, জেদ, জীবন সংগ্রাম আর আমার উপর অগাধ বিশ্বাস আমাকে সর্বদা জীবনে এগিয়ে চলার সাহস ও শক্তি জুগিয়েছে। অগাধ ভালোবাসা জানাই আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আমার ভাই জয়দীপ রায়কে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমাকে ভরসা দেওয়ার জন্য এবং পাশে থাকার জন্য। এছাড়াও সকল পরিস্থিতে আমার পাশে থাকার জন্য, ভালোবাসার জন্য এবং জীবনপথে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য আমি প্রণাম ও ভালোবাসা জানাই আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বড়মা লীলা রায়, বড় ও মেজো পিসি সন্ধ্যা রায় এবং ঊষা পাল, মেজো পিসেমশাই নিমাই চন্দ্র পাল, দাদা অরিন্দম রায়, বৌদিভাই ঝুমা রায়, এবং ভাইঝি অর্যমাকে। এছাড়া আমি বিশেষ ভাবে ভালোবাসা ও প্রণাম জানাই কলকাতায় আমার আরেক পরিবার মাসি দীপালী রাহা ও দাদাভাই সুপ্রতিম রাহাকে। এই সমগ্র গবেষণা পর্বে যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা ব্যতীত এই সমগ্র কাজটি করে তোলা কখনোই সম্ভবপর ছিলনা। পাশাপাশি অন্যান্য সেসকল মানুষ যারা নীরবে সর্বদা আমার পাশে থেকেছেন; আমার স্কুল, প্রাক্তন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যারা আমার অনুপ্রেরণা, যারা আমার উপর সর্বদা বিশ্বাস রেখেছেন এবং এই গবেষণা জীবনে এগিয়ে চলার জন্য ক্রমাগত উৎসাহ ও সাহস প্রদান করেছেন তাঁদের সকলকে আমার ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

সায়নী রায়
পিএইচডি গবেষিকা, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পৃষ্ঠা

১) সূচনা ১-৩৪

২) প্রথম অধ্যায় - প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পঃ ঐতিহাসিক প্রসার ও বিবর্তন ৩৫-৮৭

৩) দ্বিতীয় অধ্যায় - আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প: ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচিত প্রত্নকেন্দ্রসমূহ ৮৮- ১৩৯

৪) তৃতীয় অধ্যায় - আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পঃ বর্ণনা ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ১৪০- ১৯২

৫) চতুর্থ অধ্যায় - মৃৎশিল্প, সমাজ ও ইতিহাসঃ একটি পর্যালোচনা ১৯৩-২৫৮

৬) উপসংহার ২৫৯-২৮৩

৭) গ্রন্থপঞ্জী ২৮৪ - ৩০০

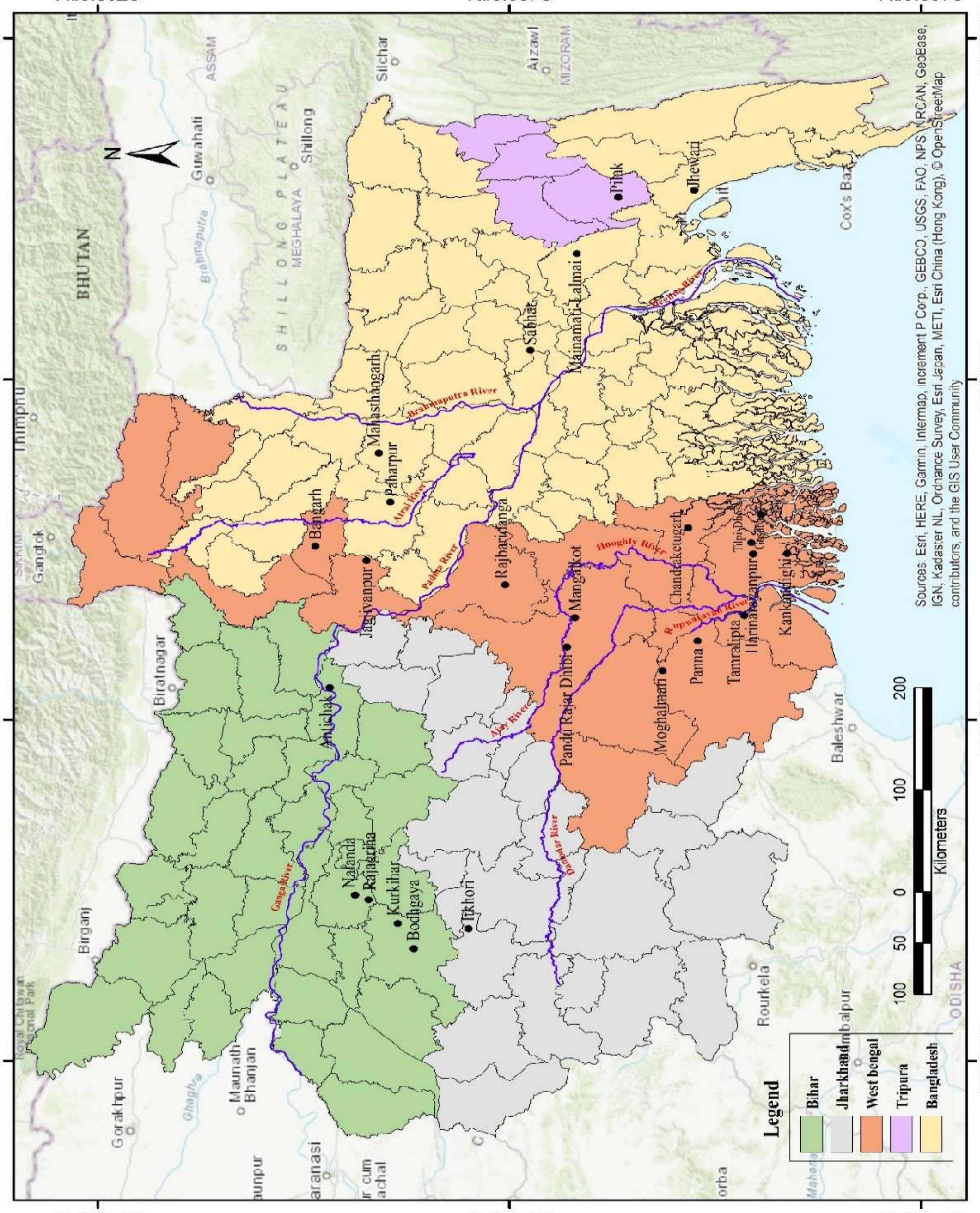

বর্তমান গবেষণা পত্রে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্রসমূহ, গবেষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত।

সূচনা

শিল্প মানুষের জ্ঞান ও নান্দনিকতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিকতা বা সৃষ্টিশীলতার সূক্ষ্ম চেতনা নিহিত থাকে। সকলেই নিশ্চিত রূপে পেশাদার শিল্পী না হলেও কম বেশি কোন না কোন শিল্পরসে সমৃদ্ধ, হয়তো তাঁদের প্রকাশের পরিসরটি কেবল ভিন্ন। আর সেজন্যই শিল্পচর্চার ইতিহাসে কেবল 'শিল্প' বা 'শিল্পী'ই একমাত্র নয়, বরং তার সাথে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে চিরাচরিত 'পৃষ্ঠপোষক', 'দর্শক' কিংবা আধুনিক 'Art connoisseur' এর ন্যায় অভিধাগুলি; যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে জনমানসে শিল্পচেতনার উপস্থিতির আভাষ দেয়। আর সেকারণেই শিল্প ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র আজ ব্যাপক ও সুপ্রসারিত। বিগত বেশ কিছু সময়ে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে নতুন নতুন অসংখ্য ক্ষেত্র বা বিষয়ের ওপর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু সম্প্রসারিত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম নিঃসন্দেহে এই শিল্পচর্চার ইতিহাস।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক কালপর্ব থেকেই শিল্পইতিহাস চর্চার সূত্রপাত ঘটে। যার ফলস্বরূপ সুদূর অতীতের গুহাচিত্র থেকে শুরু করে ক্রমে বিবিধ প্রাচীন স্থাপত্য-ভাস্কর্য, মধ্যযুগীয় উজ্জ্বল ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রাবলী বা বিবিধ ইসলামীয় স্থাপত্য কাঠামো, আধুনিক পর্বের বিবিধ সমৃদ্ধ শিল্পশৈলী যথা বিবিধ চিত্র ঘরানা (কোম্পানি চিত্রকলা, বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট, কালীঘাট পটচিত্র, বিমূর্ত শিল্পকলা প্রভৃতি আরও অন্যান্য), আধুনিক ভাস্কর্য কিংবা কাষ্ঠশিল্প, শঙ্খশিল্প, কাঁথাশিল্পের ন্যায় কারিগরী শিল্প থেকে বর্তমান অত্যাধুনিক গ্রাফিক্স বা ডিজিটাল কার্টুন প্রভৃতি সহ আরও বিবিধ শিল্পমাধ্যমকে কেন্দ্র করে একাধিক শিল্পইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা বা আলোচনা সার্বিকরূপে ভারতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তবে কেবল ভারত নয় বিশ্বইতিহাসেই শিল্পচর্চার ইতিহাস সাম্প্রতিক পর্বের অন্যতম প্রাসঙ্গিক পরিসর।

শিল্পের সংজ্ঞা বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, মানুষ তার জীবনধারণের প্রয়োজন মেটাতে যা তৈরি করে তার মূলে থাকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান, কিন্তু অনেক সময় প্রয়োজনীয় বস্তুর বাইরেও সে এমন অনেক সম্ভার তৈরি করে যা হয়তো জাগতিকভাবে অপ্রয়োজনীয় অথচ সেগুলি দেখেও মনে নিঃস্বার্থ আনন্দ, ভালোলাগা তৈরি হয় যার

উৎস বিশুদ্ধ শিল্পবোধ। শিল্প মানুষের নান্দনিক সৃষ্টি ক্ষমতার মূর্ত প্রকাশ, যার স্রষ্টা হলেন শিল্পী।[1] অর্থাৎ যেকোনো শিল্প সৃষ্টিতে দক্ষতার পাশাপাশি নান্দনিকতা, সৃষ্টিশীলতা, সৌন্দর্যবোধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পের সংজ্ঞা জনিত যেকোনো আলোচনাতেই এসকল প্রেক্ষিত উঠে আসে। কিন্তু শিল্পকে কি কেবলই এজাতীয় কিছু শব্দবন্ধের মধ্যে সীমায়িত করা যায়? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেকোনো পর্বের শিল্পইতিহাস বিশ্লেষণে তার সৃষ্টি উৎস বা সন্নিহিত উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট রূপে নির্ধারণ করা যথেষ্টই জটিল। যেকোনো শিল্প শুধুমাত্র শিল্পীর কল্পনা বা নান্দনিক চেতনার ফলশ্রুতি নয় কিংবা শিল্প অবয়ব মাত্রই কেবল তা নির্দিষ্ট রং, রেখা, ছাঁচ, পরিমাপ বা বাহ্যিক শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারিগরি তে আবদ্ধ নয়, বরং তা এক নির্দিষ্ট যুগের সাথে, সমাজের সাথে তথা ইতিহাসের সাথে সংযোগমাধ্যমকারী রূপে কাজ করে থাকে। মানুষের বিশ্বাস, প্রেম, দুঃখ, ক্রোধ, আনন্দ প্রভৃতি জীবনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম আবেগ বা অনুভূতিগুলিকেও প্রকাশের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় শিল্পের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি তার চরিত্র বিন্যাশে প্রভাব বিস্তার করে সমকালীন ধর্মীয় বিশ্বাস, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি উপাদানগুলি। ফলত, বিশেষ রূপে প্রাথমিক কালপর্বে সৃষ্ট নির্দিষ্ট উপাদানসমূহ যা ইতিহাসে আপেক্ষিকভাবে 'শিল্প' রূপে আখ্যায়িত তা আদৌ কতখানি কেবল নান্দনিকতার বহিঃপ্রকাশ বা সচেতনভাবে শিল্প অবয়ব রূপেই নির্মিত হয়েছিল এবং কতখানি তা মানুষ বা সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে নির্মিত, তার সুস্পষ্ট নিশ্চিত উত্তর নির্ধারণ আদতেই জটিল। তবে নিঃসন্দেহেই ক্রমে সময়ের সাথে যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদানকেও মার্জিত, নান্দনিক করে তোলার প্রবণতা যে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছে বা বিবিধ প্রথাগত শিল্পশৈলীর আবির্ভাব ঘটেছে তার আভাষ দেয় বিস্তীর্ণ শিল্পইতিহাস। অর্থাৎ শিল্প একদিকে যেমন মানুষের সৌন্দর্যচেতনা ও নান্দনিকতার বহিঃপ্রকাশ, তেমনই সংশ্লিষ্ট সমাজ-বিন্যাস প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ উক্ত শিল্পমাধ্যম।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সৃষ্ট বিবিধ শিল্পমাধ্যমের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন, ধারাবাহিক ও তাৎপর্যপূর্ণ শিল্প হল মৃৎশিল্প বা টেরাকোটা শিল্প, যা বর্তমান গবেষণা পত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর বিশেষত্বই হল একদিকে শিল্পইতিহাসের পরিসরে এবং অন্যদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই শিল্প। মানব সভ্যতার অতি প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে

---

[1] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে,* কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা -১৩

আজও বিবিধ মৃৎপাত্র, শিশুদের খেলনা, ভাস্কর্য নির্মান কিংবা নিত্যনতুন অলংকার নির্মানেও এই উপাদান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল এই 'টেরাকোটা' আসলে কি? সেক্ষেত্রে বলা যায় এটি মূলত একটি লাতিন শব্দ যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'পোড়ামাটি' বা ইংরেজিতে 'Fired Clay'. এই মৃত্তিকা সাধারণত সিলিকা, লোহা, চুন, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি যৌগ সহযোগে গঠিত নমনীয় আঠালো পদার্থ, জলের সংমিশ্রণে যাকে ইচ্ছেমত আকার বা রূপ দেওয়া যায় সহজেই এবং তারপর তাকে শুকনো করে সাধারণত ৭৫০°-৮০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মোটামুটি প্রায় ৬-৮ ঘন্টা আগুনে পোড়ানো হয়। তবে এক্ষেত্রে পোড়ানোর সময়সীমা সাধারণত উক্ত নির্মিত উপকরণের আকৃতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে থাকে। এই প্রক্রিয়ার পর তা দৃঢ় ও স্থিতিশীল হয় যা একদমই ভঙ্গুর নয় এবং লালচে রং ধারণ করে নির্দিষ্ট পোড়ামাটি উপকরণ রূপে পরিচিতি লাভ করে।[2] তবে এটি টেরাকোটা প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় একেবারেই জটিলতা বিহীন অতি সহজ সরল প্রাথমিক ধারণা, ইতিহাসের সুদীর্ঘ অধ্যায়ের সাক্ষী এই শিল্পধারা সম্পর্কে যা একেবারেই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানাবিধ প্রযুক্তি, কলাকৌশল যা সময়ের ব্যবধানে ও সামাজিক চাহিদার প্রয়োজনে ক্ষেত্র নির্বিশেষে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে নানারূপে, মূল অধ্যায়ে যার আলোচনা রয়েছে।

বর্তমান গবেষণা পত্রের আলোচনা যদিও নির্দিষ্ট রূপে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার পোড়ামাটি শিল্প কেন্দ্রিক কিন্তু এই শিল্পকে কেবল বাংলা বা ভারতীয় শিল্প রূপে কখনোই সীমিত করা যায়না, এর এক বিশ্বপরিচিতি রয়েছে। এই শিল্পের অস্তিত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায় বিবিধ প্রাচীন সভ্যতা গুলিতেই। সিরিয়া, ক্রিট, ইজিপ্ট, মেসোপটেমিয়া সহ বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় মানুষের প্রাথমিক বিশ্বাস বা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ একাধিক নারী পুরুষ অবয়ব, পশু মূর্তি, রতিক্রিয়া সম্পন্ন একাধিক পোড়ামাটি ফলকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় বলে অনুমিত।[3] ইজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়া থেকে এরূপ একাধিক পোড়ামাটির মৃৎপাত্র ও ধর্মীয় অবয়ব পাওয়া যায় যা আদিমতম টেরাকোটা উপাদানের মধ্যে অন্যতম বলে অনুমিত হয়।[4] মেসোপটেমিয়া তে আনুমানিক ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

---

[2] অর্পুঠারানী সেনগুপ্ত, *আর্ট অফ টেরাকোটাঃ কাল্ট অ্যান্ড কালচারাল সিন্থেসিস ইন ইন্ডিয়া,* দিল্লী, আগম কলা প্রকাশন, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১

[3] এরিখ নিউম্যান, *দ্য গ্রেট মাদার; অ্যান অ্যানালিসিস অফ দ্য আর্কিটাইপ,* র‍্যালফ ম্যান্সিম অনুবাদিত, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা- ১০১

[4] সেনগুপ্ত, *আর্ট অফ টেরাকোটাঃ কাল্ট অ্যান্ড কালচারাল সিন্থেসিস ইন ইন্ডিয়া,* পৃষ্ঠা-

থেকেই ছাঁচের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় টেরাকোটা অবয়ব নির্মাণের জন্য এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আগত উপাসকদের জন্য উক্ত ক্ষেত্রে পোড়ামাটির নিবেদন ফলক নির্মাণের প্রবণতা প্রচলিত ছিল।[5]

অনুরূপভাবেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে টেরাকোটা নিবেদন ফলক বা অবয়বের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন গ্রীসেও। এক্ষেত্রেও পোড়ামাটি অবয়ব নির্মাণকারীরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী কোনও দোকানে কর্মরত থাকত এবং আগে থেকেই পোড়ামাটির নিবেদন অবয়ব প্রস্তুত থাকত যা উপাসকবৃন্দ তাঁদের ভক্তি প্রদর্শন স্বরূপ মূল আরাধ্যের নিকট দান করতেন। পাশাপাশি সমাধিস্থলেও পোড়ামাটি অবয়বের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আবার আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে দক্ষিণ ইতালিতে ক্রমে নবগঠিত গ্রীক শহরগুলিতে পূর্বোক্ত ঐ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় জীবনের অংশ রূপে সীমিত না থেকে অন্যান্য ছোট ভাস্কর্য এবং বিবিধ স্থাপত্যিক অলংকরণে পোড়ামাটির প্রয়োগ হতে থাকে, সম্ভবত মার্বেল ও চুনা পাথরের স্থানীয় অপ্রতুলতা এই মৃৎশিল্প প্রসারের পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল।[6] ফলত এসকল নিদর্শনের নিরিখে অতি প্রাচীন কাল থেকেই পোড়ামাটি শিল্পের বিচিত্র উপস্থাপনা ও এক সমৃদ্ধ শিল্পঐতিহ্যের উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাংলা বা ভারতে পোড়ামাটি শিল্পের বিকাশচিত্রের সাথে এসকল ঐতিহ্যের বিপুল সামঞ্জস্য রয়েছে এবং বাহ্যিক শিল্পশৈলী ও নান্দনিকতার ধারণার ঊর্ধ্বে সংশ্লিষ্ট সমাজ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে যে মুখ্যত প্রাচীন পোড়ামাটি শিল্পের গুরুত্ব ও প্রসার ঘটেছিল তাঁর এক বিশ্বজনীন চেতনা বিদ্যমান।

টেরাকোটার বিশ্বইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ্য চৈনিক টেরাকোটা ঐতিহ্যের কথা। আনুমানিক ২২১-২০৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ কালীন পর্বে চীনের শানচি প্রদেশে কিন সাম্রাজ্যের প্রথম শাসক কিন শি হুয়াং এর সমাধি কেন্দ্রে প্রায় ৮০০০ টেরাকোটা সৈন্য বাহিনীর উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। এজাতীয় উপস্থাপনের পশ্চাতে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে রাজার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ধারণা জড়িত ছিল বলে মনে করা হয়। যাদের দৈহিক ভঙ্গিমা, অবয়ব ভেদে স্বতন্ত্র মৌখিক অভিব্যক্তি, অস্ত্রাদি তথা সার্বিক

---

[5] বনি এম.কিংসলি, *দ্য টেরাকটাস অফ দ্য ট্যারেন্টাইন গ্রীক,* অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য কালেকশান ইন দ্য জে.পল গেটি মিউজিয়াম, জে.পল গেটি মিউজিয়াম পাবলিকেশন, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা- ৩

[6] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩

উপস্থাপনা অনুরূপ বাস্তব সৈন্যবাহিনীর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।[7] এমনকি উপস্থাপিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শ্রেণী বিভাজনও বিদ্যমান, পদাতিক সৈন্য, বর্ম পরিহিত সৈন্য, ঘোড়া বা রথ সহ, হাঁটু মুড়ে বসা তীরন্দাজ প্রভৃতি একাধিক উপস্থাপনা লক্ষণীয়।[8] তবে শুধু টেরাকোটা সৈন্যই নয়, জিয়ান শহরের একটি সমাধিস্থলে ব্রোঞ্জের ফলক নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আকৃতি সম্পন্ন একাধিক পোড়ামাটি ছাঁচের সন্ধান মেলে। আবার কিন বংশের পরবর্তীতেও হান শাসনাধীনেও (২০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ – ২২০ খ্রিস্টাব্দ) অনুরূপভাবে সমাধিস্থলে টেরাকোটা সৈন্য সমাধিস্থকরণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়[9]। ফলত উপরোক্ত এসকল উল্লেখ স্বাভাবিক রূপেই সংশ্লিষ্ট প্রাচীন সমাজে পোড়ামাটি উপাদানের ব্যবহার, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ও গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত দেয়।

ভারতীয় উপমহাদেশেও পোড়ামাটি শিল্প ঐতিহ্যের এক দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য বিদ্যমান। সার্বিকভাবে আদিমতম মৃৎশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় মেহেরগড়ের প্রথম পর্ব থেকে, উৎখননকারীগন যার সময়সীমা অনুমান করেন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম সহস্রাব্দ। তবে এই নিদর্শন পোড়ামাটির ছিলনা। ‘টেরাকোটা’ বা ‘পোড়ামাটি’র উপকরণ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় মেহেরগড়ের ৩য় পর্যায়ে এবং ক্রমে তার বিকাশও পরিলক্ষিত হয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়কালে যার ফলস্বরূপ একাধিক নারী ও পুরুষ মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায় উক্ত প্রত্নস্থলের সাম্প্রতিক স্তরগুলিতে। মেহেরগড়ের এই ধরনের অবয়বগুলিকে সাধারণত শিল্পক্ষেত্রে মানবীয় উপস্থাপনার অগ্রদূত বলে মনে করা হয়ে থাকে।[10] মেহেরগড়ের পরবর্তী পর্যায়ে টেরাকোটা পশু ও মানবীয় অবয়বের উপস্থাপনা মেলে প্রাক হরপ্পীয় বিভিন্ন কেন্দ্র যথা বালুচিস্তানের কুল্লি, জোব প্রভৃতি থেকে। হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র (হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি) থেকেও অজস্র পোড়ামাটি ফলক ও মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাপ্ত পোড়ামাটি ফলকের মূলত বিভিন্ন পশু পক্ষী এবং বিভিন্ন ভঙ্গীতে মাতৃকা অবয়ব, সন্তান ধারণরতা নারী, বিবিধ দৈনন্দিন কাজকর্মে নিযুক্ত নারী প্রভৃতি।[11] যদিও

---

[7] চেন শেন, *দ্য ওয়ারিয়র এম্পেরর অ্যান্ড চায়না'স্ টেরাকোটা আর্মি*, টরেন্টো, অন্টারিও, কানাডা, রয়্যাল অন্টারিও মিউজিয়াম প্রেস, ২০১০, পৃষ্ঠা- ১০-১৫

[8] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯-৫৩

[9] শেন, *দ্য ওয়ারিয়র এম্পেরর অ্যান্ড চায়না'স্ টেরাকোটা আর্মি*, পৃষ্ঠা- ৫৭

[10] অরুন্ধতী ব্যানার্জী, *আর্লি ইন্ডিয়ান টেরাকোটা আর্ট ২০০০ -৩০০০ বিসি – নর্দান- ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লী, হারমন পাবলিকেশন হাউস, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৭

[11] তদেব, পৃষ্ঠা- ৭

বিবিধ বিতর্ক বিদ্যমান তা সত্ত্বেও অনুমান করা হয়ে থাকে এই পর্বেও মুখ্যত মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান জনিত ধ্যানধারণার অংশ হিসেবেই অধিকাংশ পোড়ামাটি অবয়বের প্রসার ঘটেছিল। এছাড়া খুব সামান্য কিছু পুরুষ অবয়ব লক্ষণীয়। হরপ্পীয় পর্যায়ের পর পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে কিছুটা স্থবিরতা আসে এবং পুনরায় তা উজ্জীবিত হয় আদি ঐতিহাসিক পর্যায় বা আনুমানিক ষষ্ঠ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে দ্বিতীয় নগরায়নের কালে গাঙ্গেয় উপত্যকাকে কেন্দ্র করে। এই পর্ব থেকেই ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্প এক সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা লাভ করে যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বাংলার মৃৎশিল্প। সমগ্র আদি ঐতিহাসিক পর্যায় ব্যাপী গাঙ্গেয় উপত্যকা কেন্দ্রিক বিস্তৃত ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্প উক্ত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রযুক্তিগত, গুনগত, বিষয়গত, সংখ্যাগত বিপুল সমৃদ্ধি ও বিবর্তন লাভ করে। প্রাকমৌর্য পর্ব থেকে শুরু করে প্রায় গুপ্ত পর্ব পর্যন্ত এই শৈলীর সন্ধান পাওয়া যায় বৈশালী, কুমরাহার, বুলন্দীবাগ, পাটলিপুত্র, রাজগীর, অহিচ্ছত্র, ভিটা, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী, মথুরা, রাজঘাট প্রভৃতি উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার অজস্র কেন্দ্রে। যেখানে কালভেদে নানান নতুন চরিত্র বৈশিষ্ট্য অর্পিত হয় উক্ত ধারায়। এর অনুরূপ ধারা পরিলক্ষিত হয় নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা তথা বাংলা তেও। বাংলায় এই পর্বে সমৃদ্ধ মৃৎশিল্প ঐতিহ্যের উপস্থিতির প্রমাণ দেয় আবিষ্কৃত অসংখ্য টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলি যথা- বর্তমান বাংলাদেশের মহাস্থানগড় সহ পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, বাহিরি, পান্না, তিলদা, মঙ্গলকোট, পাণ্ডু রাজার ঢিবি, হরিনারায়নপুর, তিলপি, ধোসা প্রভৃতি আরও অন্যান্য যারা আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটা শিল্পের চরিত্র নির্ধারণে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আদি ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে বাংলায় বিবিধ ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পন্ন (বিভিন্ন দেবদেবীর অবয়ব, যক্ষ-যক্ষিণী, পশুপাখি, কৃষি- শিকার, নৃত্য-গীত, মিথুন ফলক, নানা কাহিনী সম্বলিত বর্ণনামূলক ফলক প্রভৃতি) নানা প্রযুক্তিসম্পন্ন (হস্ত নির্মিত, একক ছাঁচ নির্মিত, দুটি ছাঁচ নির্মিত ইত্যাদি) পোড়ামাটি ফলক বা অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায়। যেগুলি মূলত ছিল স্বতন্ত্র ফলক এবং মূলত সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহৃত। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত নয়। বাংলায় এই মৃৎশিল্পের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল প্রায় সমগ্র খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দ ব্যাপী, এবং সময়ের সাথে নানা শৈল্পিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় বৌদ্ধ বিহার বা ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের অলংকরণের অংশ রূপে পোড়ামাটি ফলকের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় যা বর্তমান গবেষণা পত্রের প্রধান আলোচ্য পরিসর। তবে এখানেই বাংলায় মৃৎশিল্পের সমাপ্তি নয়, একদিকে যেমন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক পর্বের বিভিন্ন ইসলামীয় স্থাপত্য ও মন্দির স্থাপত্যেও পোড়ামাটি অলংকরণ অত্যন্ত

প্রাণবন্ত; তেমনই আজও বাংলা তথা ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ব্রত বা উক্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় অলংকরণ বর্জিত অতি সাধারণ পোড়ামাটির পশু বা মানবীয় অবয়বগুলি। ফলত ইতিহাসে মৃৎশিল্পের শিকড় যে অতি গভীরে তার আভাষ দেয় উপরোক্ত আলোচনা, যা এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বা প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রটিকে অতি দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

১. গবেষণার ভৌগোলিক পরিসর ও নির্ধারিত সময়কালঃ

বর্তমানে প্রধান আলোচ্য বিষয় আদি মধ্যযুগীয় (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক) বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস। এই পর্বে বাংলায় একাধিক পোড়ামাটি শিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া যায়। আদি মধ্যযুগীয় পর্বে ‘বাংলা’ বলতে কোনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিলনা এবং এক বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিসরের ধারণা যুক্ত এর সাথে। যার মধ্যে অধুনা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খন্ড সহ বর্তমান একাধিক অঞ্চল এর অধীন। কিন্তু আলোচ্য গবেষণা পত্রে বারংবার ‘বাংলা’ শব্দটি ব্যবহৃত হলেও উক্ত বৃহত্তর বাংলার সমস্ত অংশ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্দিষ্ট রূপে এই ভূখণ্ডের অধীন আদি মধ্যযুগীয় পর্বের মৃৎশিল্প/মৃৎভাস্কর্য সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলিকে আবর্ত করেই বর্তমান গবেষণা পত্রের রূপনির্মাণ করা হয়েছে। যার মধ্যে মুখ্যত রয়েছে অধুনা বাংলাদেশের মহাস্থানগড় ও তার নিকটবর্তী পুরাকেন্দ্রসমূহ (বগুড়া, রাজশাহী), পাহাড়পুর (নওগাঁ, রাজশাহী), ময়নামতী ও তার নিকটবর্তী পুরাকেন্দ্রসমূহ, (কুমিল্লা, দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশ) ভারতের জগজ্জীবনপুর (মালদা, পশ্চিমবঙ্গ) অর্থাৎ যেগুলি আদতে বর্তমানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বাস। নীহার রঞ্জন রায়ের ‘বাংলা’র ধারণা অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী এলাকা পর্যন্ত ‘বাংলা’ অঞ্চলের প্রসার ধরলে উপরিউক্ত এই ৪টি কেন্দ্রের মধ্যেই আলোচনাকে সীমিত রাখতে হয়। কিন্তু আদি মধ্যযুগীয় পর্বে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর সাথে সমরূপ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যথাক্রমে অ্যান্টিচক (ভাগলপুর, বিহার) ও পিলাক (জোলাইবাড়ি, ত্রিপুরা) কেন্দ্রদুটিকেও আলোচ্য পরিসরে বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাস চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা এগুলি আলোচ্য পর্বে সমরূপ মৃৎশিল্প ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল তো বটেই, পাশাপাশি কেবল মৃৎশিল্প নয় অন্যান্য স্থাপত্য, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্য ছিল। অনুরূপ চরিত্রের তাম্রশাসন বা অভিলেখের

সন্ধান মেলে বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অংশে। অর্থাৎ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বিবিধ পরিসর থেকে এই কেন্দ্রগুলি সম্পর্কিত থাকায় এগুলিও বর্তমান আলোচনার অন্তর্গত ।

তবে আলোচনার প্রয়োজনে মোগলমারি, (পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) কর্ণসুবর্ণ(মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ), নালন্দা (বিহার), কুর্কিহার (বিহার) সহ আরও বেশ কিছু প্রত্নস্থলের কথা ক্ষেত্র বিশেষে উপস্থাপিত হয়েছে; যদিও প্রধান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উপরিল্লিখিত মৃৎশিল্প সমৃদ্ধগু কেন্দ্রগুলিই।

আলোচনার ভৌগোলিক পরিসরের সাথেই আবশ্যিকভাবে থাকে সন্নিহিত সময়কাল নির্বাচনের যৌক্তিকতা। বর্তমানের আলোচনা আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক কেন্দ্রিক। এই পর্বের অন্যতম বিশেষত্বই হল এই সময়কালে বাংলার মৃৎশিল্পে এক নব স্ফুরণ আসে, সম্পূর্ণ নতুন চরিত্রে নতুন উদ্দেশ্যে তা প্রসার লাভ করে। যা পূর্ববর্তী অধ্যায় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এই পর্বে তা প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র লাভ করে যা এর সমৃদ্ধি ও প্রসারকে যেমন পরিশীলিত করে তেমন সমাজ বিন্যাশ প্রক্রিয়া তথা সমকালীন অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যাবস্থার সাথে আরও জোরালো রূপে একে সংযুক্ত করে যা নিঃসন্দেহে ইতিহাস চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত। পাশাপাশি আলোচ্য পর্বে প্রাপ্ত একাধিক পারিপার্শ্বিক তথ্য উপাদানের উপস্থিতি যথা, অভিলেখ সাক্ষ্য, সাহিত্যিক উপাদান, অন্যান্য স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সার্বিকভাবে সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস, তথা বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস অন্বেষণে সহায়ক রূপে ভূমিকা পালন করে যা ইতিপূর্বে বাংলায় সেভাবে উপস্থিত ছিলনা। এছাড়াও বাংলার শিল্প ইতিহাস চর্চা লক্ষ করলে দেখা যায়, এর পূর্ববর্তী পর্যায়ের টেরাকোটা নিয়ে একাধিক কাজ থাকলেও এই পর্ব অনেকখানিই ব্রাত্য। ফলত এই পর্ব বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানে যে গুরুত্বপূর্ণ তা বলা বাহুল্য।

আলোচ্য পর্বে মূলত বিবিধ বৌদ্ধবিহার এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের বহির্দেওয়ালগাত্রে অলংকরণের অংশ রূপে পোড়ামাটি ফলকের উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয়। মোটামুটিভাবে প্রায় সকল কেন্দ্রেই বিবিধ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ঐশ্বরিক উপস্থাপনা, অর্ধ ঐশ্বরিক উপস্থাপনা, নানান উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ এর উপস্থাপন সংক্রান্ত অজস্র ফলক, দৈনন্দিন কাজকর্মে লিপ্ত সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র, সৈন্যবাহিনী, শিকার বা কৃষি সংক্রান্ত উপস্থাপন, ক্রীড়াজগৎ, নৃত্যগীত বা বিনোদন জগতের নানান উপস্থাপন, বিভিন্ন কাহিনীনির্ভর উপস্থাপন প্রভৃতি নানান

বিষয়বস্তু সম্পন্ন ফলকের বিস্তৃত উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলিতে। প্রায় সকল কেন্দ্রেই মোটামুটি সমজাতীয় শিল্প উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেলেও সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় দেখা যায় ক্ষেত্র নির্বিশেষে বাহ্যিক আঙ্গিক, মৌখিক ভঙ্গিমা, বিষয়বস্তু কিংবা সংখ্যাগত উপস্থাপনায় কিন্তু তারতম্যও বিদ্যমান যা এই শিল্পের স্থানীয় স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রটিকে তুলে ধরে। এই শিল্পধারা বাংলার ভিন্ন ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক পরিসরে বিকশিত, ফলত স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ভিন্ন আর্থ সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে উক্ত তারতম্য বা স্বতন্ত্রতার উপস্থিতি হয়তো অস্বাভাবিক নয়, যদিও তা আলোচনা সাপেক্ষ।

২. গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমান গবেষণা পত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু একান্ত রূপেই বাংলার মৃৎশিল্প কেন্দ্রিক হলেও এই চর্চা ঠিক প্রথাগত 'শিল্পইতিহাস' নয়। শিল্প অবয়বের প্রতীক, ভঙ্গিমা, গঠনতন্ত্র বা প্রতিমালক্ষণ রীতির নির্দিষ্ট স্বকীয় ভাষা রয়েছে যা শিল্প ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে শিল্পের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে সেক্ষেত্রে উপরিউক্ত এসকল বিষয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিল্প নির্মাণের উদ্দেশ্য, অনুপ্রেরণা, সামাজিক অবস্থান, সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, তার নির্মাণ ও পরিচালন পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সমাজ, দর্শক বা সাধারণ মানুষ ইত্যাদি একাধিক প্রেক্ষিত উঠে আসে। আর বর্তমানের গবেষণা আদতে বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস। কেননা, যেকোনো শিল্প অবয়বের বিশেষত্বই হল তা সম্পৃক্ত আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সাক্ষ্যরূপে কাজ করে। ফলত সংশ্লিষ্ট সমাজ সংস্কৃতি ও মানব ইতিহাস ব্যতিরেকে কোনও শিল্প ইতিহাস চর্চা যথার্থ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। ভারতীয় শিল্প ইতিহাস চর্চায় মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস প্রায় নেই। ক্ষেত্র বিশেষে সীমিত কিছু রচনায় মৃৎশিল্পের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রেক্ষিত গৃহীত হলেও, মুখ্যত সেক্ষেত্রে আলোচ্য মৃৎশিল্পে প্রতিফলিত সমাজচিত্র সম্পর্কে আলোচনার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উক্ত 'মৃৎশিল্প'ই যে সংশ্লিষ্ট সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং তার পৃথক ইতিহাস অনুসন্ধান প্রয়োজন সেই প্রবণতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলত বর্তমান গবেষণা পত্রে প্রধানত সমাজ বিন্যাস প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে যে শিল্পঐতিহ্য বিকশিত হয় তার সামাজিক ইতিহাস চর্চায় আলোকপাতের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, এবং সেই অনুযায়ী নির্দিষ্টরূপে আদি মধ্য যুগীয় বাংলায়

বিকশিত মৃৎশিল্প কে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদান রূপে গণ্য করে তার ইতিহাস অন্বেষণ এর প্রয়াস করা হয়েছে। ফলত, কোন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে, কি এবং কার উদ্দেশ্যে, কাদের দ্বারা কিংবা কাদের তত্ত্বাবধানে আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় এই শিল্প গড়ে উঠেছে ও সমৃদ্ধ প্রসার লাভ করেছে ? ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে বাংলার মৃৎশিল্পের অবস্থান কোথায়? এই শিল্পধারার প্রসারের পশ্চাতে নিহিত সমাজকে কতখানি বিশ্লেষণ সম্ভব? এজাতীয় আলোচনা কিন্তু বাংলার মৃৎশিল্পচর্চায় অদ্যাবধি প্রায় অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে বলা চলে, যার পুরোদস্তুর অন্বেষণ প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে এজাতীয় বিবিধ প্রেক্ষিতের অনুসন্ধান এর প্রয়াস গৃহীত হয়েছে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে। আলোচ্য পরিসরে যাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত নির্ধারণ জটিলতাপূর্ণ হলেও একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন যে যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গত, বিবিধ আলোচনার নিরিখে তা তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে গবেষণা পত্রটির মধ্য দিয়ে।

৩.প্রাসঙ্গিক পূর্বস্থিত রচনাবলীর সমীক্ষাঃ

সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আলোচনার পাশাপাশি বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটেও এই শিল্পধারা সম্পর্কিত একাধিক রচনা বিদ্যমান। কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে মৃৎশিল্প সংক্রান্ত গ্রন্থাদির আলোচনার পূর্বে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানের আলোচনা নির্দিষ্ট রূপে আদি মধ্যযুগীয় বৃহত্তর বাংলার 'পোড়ামাটির ভাস্কর্য' কেন্দ্রিক এবং প্রাচীন বাংলা তথা ভারতীয় শিল্প ইতিহাস চর্চার ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেখানে বৃহৎ অংশ ব্যাপী রয়েছে ভাস্কর্যের ইতিহাস। তবে উক্ত ভাস্কর্যের ইতিহাসে তথা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে পোড়ামাটি ভাস্কর্যের অবস্থান কোথায় তা এক অন্যতম প্রশ্ন। মোটামুটিভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যের চর্চার সূত্রপাত ঘটে বিগত দুশতক পূর্বে তথা আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনবিংশ শতক জুড়ে। তবে যথাযথ পদ্ধতিগত ও বিজ্ঞানসম্মত শিল্প ইতিহাসের সূচনা মূলত জেমস ফার্গুসন (১৮০৮-১৮৮৬) কিংবা আলেকজান্ডার কানিংহাম (১৮১৪-১৮৯৩) কর্তৃক ভারতীয় স্থাপত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনাকে কেন্দ্র করে; যাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তন মূলত পাশ্চাত্য ধারায় প্রভাবান্বিত ছিল।[12] এনাদের ন্যায় প্রাথমিক পর্বের আরও অন্যান্য কৌতূহলী পাশ্চাত্য গবেষকরা ভারতীয় শিল্পকে কেবলমাত্র গ্রীক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

[12] পারুল পান্ড্য ধর, 'আ হিস্ট্রি অফ আর্ট হিস্ট্রি, দ্য ইন্ডিয়ান কন্টেক্সট', পারুল পান্ড্য ধর,(সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান আর্ট হিস্ট্রি, চেঞ্জিং পার্সপেক্টিভ* , নিউ দিল্লী, ডি কে প্রিন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইন্সটিটিউট, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১

দ্বারা প্রভাবান্বিত রূপে ব্যাখ্যা করে তার গুরুত্বকে সীমায়িত করেন।[13] সেখানে ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব প্রেক্ষাপট, আদর্শ বা গুরুত্ব সম্পূর্ণই উপেক্ষিত। যদিও ক্রমে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। সূচনা পর্বের এসকল গবেষকগণ মূলত উত্তর ও মধ্য ভারতীয় বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপত্য যথা অমরাবতী, সাঁচি, সারনাথ, ভারহুত ইত্যাদি বিভিন্ন হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন স্থাপত্য কেন্দ্রিক আলোচনার উপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বর্তমানের আলোচনা যেহেতু বৃহত্তর বাংলা বা বহুলাংশে পূর্বভারত কেন্দ্রিক, ফলত এই পরিসরে শিল্প-স্থাপত্য ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত মনে করা হয়ে থাকে জেমস ফার্গুসনের অনুসরণে কৃত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *অ্যান্টিকুইটিস অফ ওড়িশা* এবং *বুদ্ধ গয়া* রচনার মধ্য দিয়ে, যেখানে মূলত স্মৃতিস্তম্ভ বা স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য কেন্দ্রিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা উপস্থাপিত। আর নির্দিষ্টরূপে বাংলার শিল্পইতিহাস চর্চার সম্ভাব্য সূত্রপাত ঘটে ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গের পর। প্রাথমিক রূপে বাংলা ও বিহারে বেশ কিছু প্রস্তর নির্মিত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী মূর্তি প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে অধুনা বাংলাদেশের বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি এবং কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে বাংলার শিল্প অনুসন্ধান ও চর্চার সূত্রপাত ঘটে।[14] তবে বঙ্গীয় শিল্প ইতিহাস চর্চার পরিসরে প্রথমেই উল্লেখ্য মনমোহন গাঙ্গুলীর *হ্যান্ডবুক টু দ্য স্কাল্পচারস্ ইন দ্য মিউজিয়াম অফ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ*[15] গ্রন্থটি যেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত গান্ধার, মথুরা, মগধ সহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ নির্মিত একাধিক বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী মূর্তির বিস্তৃত বর্ণনা, প্রতীক, মুদ্রা, ভঙ্গিমা প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত স্বল্প কিছু সংখ্যক টেরাকোটা অবয়বও উপস্থাপিত। এর কিছু সময় পরেই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ জে.সি.ফ্রেঞ্চ এর *দ্য আর্ট অফ দ্য পালা এম্পায়ার অফ বেঙ্গল*[16], যেখানে অধুনা বাংলা ও বিহার এর নানান অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত একধিক প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি এবং কিছু স্থাপত্য সম্পর্কে

---

[13] প্রমোদ চন্দ্র, *দ্য স্কাল্পচার অফ ইন্ডিয়া, ৩০০০ বি সি -১৩০০ এ ডি,* ওয়াশিংটন, ন্যাশনাল গ্যালারি অফ আর্ট, ১৯৮৫ পৃষ্ঠা- ১৬

[14] অশোক কুমার ভট্টাচার্য, 'অ্যান ইন্ট্রোস্পেকশন অন দ্য স্টাডিস ইন ইন্ডিয়ান আর্ট', সুদীপা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *জার্নাল অফ এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি,* ভলিউম- ২৪, কলকাতা, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৯৩

[15] মনমোহন গাঙ্গুলী, *হ্যান্ডবুক টু দ্য স্কাল্পচারস্ ইন দ্য মিউজিয়াম অফ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,* কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯২২

[16] জে.সি.ফ্রেঞ্চ, *দ্য আর্ট অফ দ্য পালা এম্পায়ার অফ বেঙ্গল,* লন্ডন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৮

বিস্তৃত শৈল্পিক আলোচনা করেছেন। এই পর্যায়ে বাংলার শিল্প তথা মুখ্যত ভাস্কর্যের ইতিহাস চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর *আইকনোগ্রাফি অফ বুদ্ধিষ্ট অ্যান্ড ব্রাহ্মানিক্যাল স্কাল্পচারস ইন দ্য ঢাকা মিউজিয়াম*[17] গ্রন্থটি। যেখানে ঢাকা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বিস্তীর্ণ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্যের শৈল্পিক ও Iconography সংক্রান্ত সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন যার অধিকাংশই প্রস্তর ভাস্কর্য এবং ধাতব ভাস্কর্য। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বাংলার ভাস্কর্যে সামাজিক প্রেক্ষিত আলোচনা প্রসঙ্গে স্বল্পরূপে মৃৎশিল্পের উল্লেখও করেছেন। এই পরিসরে অবশ্য উল্লেখ্য আর.ডি.ব্যানার্জীর *ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মিডিএভাল স্কাল্পচার*[18] গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে অন্যতম পথপ্রদর্শক রূপে কাজ করে। এখানে লেখক পূর্ব ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সার্বিক রূপে ভাস্কর্যের ইতিহাস তুলে ধরেছেন, যেখানে মৌর্য পর্ব থেকে শুরু করে পাল সেন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিভিন্ন আঞ্চলিক ঘরানা নির্বিশেষে আলোচনাটিকে রূপদান করেছেন। পাশাপাশি প্রস্তর নির্মিত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেবদেবী ভাস্কর্যগুলিকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিবিধ ধাতব জৈন অবয়ব, বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির বা স্থাপত্যিক নির্মাণকাঠামো সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ও তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। মূলত শৈলীগত এবং আইকনোগ্রাফিক আলোচনা উপস্থাপিত এই গ্রন্থে। এর পরবর্তীতে ক্রমে একাধিক স্বনামধন্য গবেষক বা ঐতিহাসিকরা বাংলার ভাস্কর্য বা শিল্প সংক্রান্ত একাধিক আলোচনা করেছেন। যার মধ্যে অন্যতম নাম স্টেলা ক্র্যামরিশ। তাঁর *ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার*[19] গ্রন্থে আনুমানিক ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যার মুখ্য কেন্দ্র জুড়ে রয়েছে প্রস্তর ভাস্কর্য, আবার *দ্য আর্ট অফ ইন্ডিয়া*[20] নামক রচনায় বিবিধ প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাবলী সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। প্রসঙ্গত এই গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে ১৯৩৩ ও ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত। কিন্তু এই পর্যন্ত বাংলা বা ভারতীয় ভাস্কর্য তথা শিল্প ইতিহাস চর্চায় মৃৎভাস্কর্য বিশেষ স্থান অর্জন করেনি। যদিও পরবর্তীতে স্টেলা ক্র্যামরিশ ভারতীয় পোড়ামাটি ভাস্কর্য নিয়ে অসামান্য লেখনী বিদ্যমান যা পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে।

---

[17] নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *আইকনোগ্রাফি অফ বুদ্ধিষ্ট অ্যান্ড ব্রাহ্মানিক্যাল স্কাল্পচারস ইন দ্য ঢাকা মিউজিয়াম,* ঢাকা, রাই এস এন ভদ্র বাহাদুর প্রকাশিত, ১৯২৯

[18] আর.ডি.ব্যানার্জী, *ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মিডিএভাল স্কাল্পচার,* দিল্লী, ম্যানেজার অফ পাবলিকেশনস্,১৯৩৩

[19] স্টেলা ক্র্যামরিশ, *ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার,* লন্ডন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৩

[20] স্টেলা ক্র্যামরিশ, *দ্য আর্ট অফ ইন্ডিয়া,* লন্ডন, দ্য ফাইডন প্রেস, ১৯৫৪

রয়েছে জে এন ব্যানার্জীর *দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি,* মূর্তিতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঐশ্বরিক অবয়বের নির্ধারিত মুদ্রা, ভঙ্গিমা, আসন, প্রতীক ইত্যাদি বিশ্লেষণ, যা মূর্তির নির্দিষ্ট পরিচিতি প্রদান করে। বর্তমানে বাংলা বা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আদি মধ্যযুগীয় পর্বের শিল্প ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনায় সর্বাধিক চর্চিত এবং গ্রহণযোগ্য প্রেক্ষিত আবিষ্কৃত বিবিধ প্রস্তর বা ধাতব ভাস্কর্যের মূর্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ। যার অন্যতম পথপ্রদর্শক আলোচ্য গ্রন্থটি। হিন্দু মূর্তি উপাসনা এবং তার ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, মূর্তিতাত্ত্বিক বিবিধ আলোচনা বিস্তৃত রূপে তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। এর পরবর্তীতে পূর্ব ভারতীয় প্রেক্ষাপটে শিল্প ইতিহাস চর্চায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যথাক্রমে এফ এম আশার এর *আর্ট অফ ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া ৩০০-৮০০*[21] যা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে বিশেষত আদি মধ্যযুগীয় পূর্ব ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে অন্যতম মূল্যবান রত্ন। প্রাথমিক গুপ্ত পর্যায় থেকে পাল সেন যুগ পর্যন্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যার মন্দির বা মঠ স্থাপত্য, প্রস্তর ভাস্কর্য, টেরাকোটা, ধাতব ভাস্কর্যের শৈল্পিক বর্ণন, মূর্তিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সম্পৃক্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। তবে মৃৎভাস্কর্যের আলোচনা থাকলেও তা মুখ্যত প্রস্তর বা ধাতব ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যিক আলোচনার প্রভাবে কিছুটা ব্রাত্য রয়ে গেছে। অন্যদিকে সুসান এল হান্টিংটন এর *পাল সেন স্কুল অফ স্কাল্পচার*[22] আদি মধ্যযুগীয় বাংলার ভাস্কর্য তথা শিল্প ইতিহাসের অমূল্য দলিল। কিন্তু সেখানেও ভাস্কর্য রূপে কেবল বাংলা ও বিহারের প্রস্তর ও ধাতব মূর্তির উপর আলোকপাত করা হয়েছে; তাদের শৈলীতাত্ত্বিক, মূর্তিতাত্ত্বিক, ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা বিদ্যমান। কিন্তু সমসাময়িক পর্বেই আলোচ্য ভৌগোলিক পরিসরের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাস্কর্য মৃৎশিল্প তাঁর আলোচনায় ব্রাত্য। ফলত উপরিল্লিখিত এই ইতিহাস চর্চার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাংলা বা ভারতীয় ইতিহাস চর্চার মুলস্রোতের যে ধারা বা যে সকল স্বনামধন্য ঐতিহাসিকদের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্প ইতিহাস চর্চার সমৃদ্ধি তাদের আলোচনাতে মৃৎশিল্প প্রায় ম্লান। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক বিবিধ সমীক্ষা বা উৎখনন রিপোর্ট গুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আবিষ্কৃত মৃৎ উপাদানের ঘাটতি নেই। যা বাংলা বা ভারতীয় শিল্প ইতিহাস চর্চায় ভাস্কর্য রূপে মৃৎশিল্পের গুরুত্ব বা অবস্থানের ক্ষেত্রটিকে হয়তো প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

---

[21] এফ এম আশার, *আর্ট অফ ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া ৩০০-৮০০,* মিনিয়াপোলিস, দ্য ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা প্রেস, ১৯৮০

[22] সুসান এল হান্টিংটন, *দ্য পাল-সেন স্কুল অফ স্কাল্পচার,* লেইডেন,ই জে ব্রিল , ১৯৮৪

তবে প্রাথমিক পর্বে ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাস চর্চায় মৃৎভাস্কর্যের অবস্থান কিছুটা ম্লান হলেও পৃথকভাবে মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা ব্রাত্য নয়। মোটামুটি বিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে স্বতন্ত্র রূপে মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রীকরূপে ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্পধারার উদ্ভব, বিকাশ জনিত চর্চার পাশাপাশি তার ওপর প্রযুক্ত রীতি বা কলাকৌশল, উপস্থাপিত বিষয়বস্তু, ব্যবহার, অবয়বে উপস্থাপিত ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান প্রভৃতি নানান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে কয়েকটি ভাগে এই রচনাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যথা- সার্বিক রূপে প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা, সার্বিক রূপে বাংলার মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা এবং আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে পোড়ামাটি ফলকে উপস্থাপিত নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক আলোচনা।

৩.১ সার্বিক রূপে প্রাচীন ভারতীয় মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা

প্রথমেই বলা যায় সি সি দাশগুপ্ত তাঁর *অরিজিন অ্যান্ড ইভোলিউশন অফ ইন্ডিয়ান ক্লে স্কাল্পচার*[23] গ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে শুরু করে হরপ্পা সংস্কৃতি, প্রাক মৌর্য, মৌর্য-শুঙ্গ- কুষান, গুপ্ত এমনকি মধ্যযুগীয় পোড়ামাটি শিল্পের উদ্ভব, বিকাশ, প্রাপ্তিস্থান, সম্পৃক্ত প্রযুক্তি, চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন।

উল্লেখ করা চলে, ঐতিহাসিক ষ্টেলা ক্র্যামরিশ এর কথা, প্রাচীন ভারতীয় টেরাকোটার ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় যিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক। তাঁর '*ইন্ডিয়ান টেরাকোটা*'[24] নামক প্রবন্ধে পোড়ামাটি অবয়বের কারিগরী প্রযুক্তি পদ্ধতি ও সম্ভাব্য ব্যবহারের প্রেক্ষিতে তাকে 'চিরন্তন' (Ageless) ও 'সময়াবদ্ধ' (Timed Variation) রূপে আখ্যায়িত করে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম প্রকারটি দ্বারা বুঝিয়েছেন মূলত সেই সকল শিল্প উপাদান যেগুলি অপরিবর্তিত রূপে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান এবং অপরটি সময়ের সাথে পরিস্থিতির সাথে নানান প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারন করেছে। চিরন্তন প্রকৃতির উপাদানগুলি মূলত হাতে তৈরি, খুব সাধারণ আকৃতি বিশিষ্ট

---

[23] সি সি দাশগুপ্ত, *অরিজিন অ্যান্ড ইভোলিউশন অফ ইন্ডিয়ান ক্লে স্কাল্পচার,* ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯৬১

[24] স্টেলা ক্র্যামরিশ, 'ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস', *এক্সপ্লোরিং ইন্ডিয়াস সেক্রেড আর্ট,* সিলেক্টেড রাইটিংস অফ স্টেলা ক্র্যামরিশ, বারবারা স্টোলার মিলার (সম্পাদিত), ফিলাডেলফিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভ্যানিয়া পাবলিকেশন, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ৬৯-৮৪

যার নিদর্শন হরপ্পা সংস্কৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতের গ্রামাঞ্চল সর্বত্র মেলে। এর মধ্যে মূলত রয়েছে আদিম মাতৃকামূর্তি ও অসংখ্য পশুমূর্তিগুলি, প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে যাদের গুরুত্ব অসামান্য। তাঁর মতে এগুলির নির্ধারিত কোনও ব্যবহার নেই, ক্ষেত্র হিসেবে তা যেমন উপাসনার অঙ্গ তেমনই শিশুর নিকট তা খেলনা হিসেবে গৃহীত হতে পারে। অপর দিকে দ্বিতীয় প্রকৃতির শিল্পে ছাঁচের প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়। নিত্য নতুন ধাঁচে, নতুন নতুন পদ্ধতি ও বিষয়াদিকে কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সময়ের ব্যবধানে। যথা সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্পন্ন বিভিন্ন যক্ষ-যক্ষী অবয়ব, মিথুন অবয়ব, পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত উপস্থাপনা প্রভৃতি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাজন ধরেই উত্তর ভারতীয় কেন্দ্র যথা- পাটলিপুত্র, হস্তিনাপুর, বুলন্দীবাগ প্রভৃতি অঞ্চল প্রাপ্ত বিভিন্ন মাতৃ অবয়ব, নাগিনী, পঞ্চচূড়া যক্ষিণী বা পশুপাখি অবয়বগুলিকে তিনি নিখুঁত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের দৈহিক ভঙ্গিমা, প্রযুক্ত কলাকৌশল, পোশাক, উষ্ণীষের ধরণ প্রভৃতি বিস্তারে আলোচনা করেছেন। তবে কেবল উপরিউক্ত কেন্দ্রসমূহই নয়, তাঁর আলোচ্য অবয়ব অনুরূপ ভাবেই পরিলক্ষিত হয় আদি ঐতিহাসিক বাংলার বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রগুলিতে এবং তাঁর কৃত পোড়ামাটি শিল্পের চরিত্রায়ন একই ভাবে প্রযোজ্য বাংলার ক্ষেত্রেও এবং সর্বোপরি আজও গবেষকদের নিকট তা সাদরে গৃহীত। এছাড়াও প্রাক মৌর্য পর্যায় থেকে ক্রমে গুপ্ত পর্বীয় অবয়বের ক্রমবিকাশ এবং এসকল বিভিন্ন অবয়বের সহিত সম্পৃক্ত ধর্মীয়-সামাজিক প্রেক্ষিত ও জীবন দর্শনের দিকগুলিকেও উপস্থাপিত করেন বলা চলে।

অরুন্ধতী ব্যানার্জী তাঁর '*ইমেজেস, অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড মোটিফসঃ স্টাডিস ইন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড নিউমিসমেটিকস্*'[25] গ্রন্থে সমগ্র উপমহাদেশীয় পটভূমিতে টেরাকোটা শিল্পের ক্রমবিকাশের এক সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছেন। সুদূর অতীতে মেহেরগড় সভ্যতা থেকে শুরু করে হরপ্পা সংস্কৃতি এবং পরবর্তীতে আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী যে সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পধারার প্রসার ঘটেছিল তার এক সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। প্রাপ্ত বিভিন্ন অবয়বগুলির ক্রমবিকাশ, তার নির্মাণের উদ্দেশ্য বা সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করেছেন নিজের লেখনীতে।

---

[25] অরুন্ধতী ব্যানার্জী, *ইমেজস, অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড মোটিফসঃ স্টাডিস ইন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড নিউমিসমেটিকস্*, খন্ড-১, দিল্লী ,সন্দীপ প্রকাশন, ১৯৯৩

উল্লেখ করা চলে অর্পুঠা রাণী সেনগুপ্তের '*আর্ট অফ টেরাকোটাঃ কাল্ট অ্যান্ড কালচারাল সিন্থেসিস ইন ইন্ডিয়া*'[26] গ্রন্থটির কথা। এখানে তাঁর মূল আলোচনার পরিসর অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়কালের এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দির টেরাকোটা সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন তাঁর রচনায়। উক্ত মন্দির টেরাকোটার উপস্থাপিত বিবিধ বিষয় এবং আলোচ্য শিল্পের ধর্মীয় ও সামাজিক সাংস্কৃতিক গুরুত্বের আভাষ দিয়েছেন এবং সেই আলোচনা প্রসঙ্গেই পোড়ামাটি শিল্পের সাথে সুদূর অতীত থেকেই যে ধর্মীয় বিশ্বাস তথা উর্বরতা বা মঙ্গল চেতনা জনিত ধারণা যুক্ত রয়েছে যা আজও বিদ্যমান সেই প্রেক্ষিতটি তুলে ধরেছেন এবং পাশাপাশি টেরাকোটা নির্মাণ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্ত বিবিধ পদ্ধতি বা কলা কৌশল এর দিকটিও তুলে ধরেছেন।

আলোচ্য ক্ষেত্রে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ লেখনী দেবাঙ্গনা দেশাই এর '*সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস*'[27]। তিনি দেখান ভারতে মূলত দুটি কালপর্বে সমৃদ্ধ টেরাকোটার বিকাশ ঘটেছিল। প্রথম, হরপ্পার নাগরিক সভ্যতায় এবং পুনরায় দ্বিতীয় নগরায়ন কালে অর্থাৎ আদি ঐতিহাসিক পর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী। ফলত তিনি এই শিল্পধারার বিকাশকে মূলত উক্ত পর্বীয় নগরায়ন ও আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করেন। কেননা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা, বাজার, তার পৃষ্ঠপোষক, সেই অনুযায়ী শিল্পের জাঁকজমক বা রুচিশীল চরিত্রের বিকাশ উপযুক্ত নাগরিক পরিবেশেই সম্ভব আর আলোচ্য অধিকাংশ টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল ছিল নগরকেন্দ্র। ফলত তৎকালীন বিকশিত এই সমৃদ্ধ, বিচিত্র শিল্পের চরিত্র একান্তই নাগরিক ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। যদিও এপ্রসঙ্গেই অপর এক মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ, সোনালিকা কল তাঁর সম্পাদিত উক্ত '*কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া*'[28] গ্রন্থেরই সূচনায় দেশাই এর এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন এই ধরণের শিল্প অবয়বের চরিত্রকে 'গ্রামীণ' বা 'নাগরিক' রূপে আখ্যায়িত করা সম্ভবপর নয়। কেননা এগুলি অধিকাংশ সাধারণ মানুষের ধর্মীয়

---

[26] সেনগুপ্ত, *আর্ট অফ টেরাকোটাঃ কাল্ট অ্যান্ড কালচারাল সিন্থেসিস ইন ইন্ডিয়া*, প্রাগুক্ত

[27] দেবাঙ্গনা দেশাই, 'সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস', সোনালিকা কল সম্পাদিত, *কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া*, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৪

[28] সোনালিকা কল সম্পাদিত, *কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া*, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৪

চিন্তন বা বিশ্বাসের সাথে জড়িত ছিল ফলে উক্ত আদর্শকে বাদ দিয়ে কেবল তাঁর বাহ্যিক চাকচিক্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট রূপে সংজ্ঞায়িত না করার পক্ষেই মত প্রকাশ করেন।

আদি ঐতিহাসিক পর্বের ভারতীয় টেরাকোটা শিল্পকে বুঝতে হলে পরমেশ্বরী লাল গুপ্তার *'গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট'*[29] নামক গ্রন্থটি আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বিশেষ রূপে পাটনা মিউজিয়াম, এলাহাবাদ মিউজিয়াম, ভারত কলা ভবন, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম সহ অন্যান্য সংগ্রহালয়ে রক্ষিত গাঙ্গেয় উপত্যকীয় টেরাকোটা উপাদান সমূহের বিস্তীর্ণ চিত্র উপস্থাপনা করেন। পাশাপাশি টেরাকোটা শিল্পধারার সহিত সম্পর্কিত নানান প্রযুক্তি পদ্ধতি, সম্প্রসারণের কেন্দ্র, বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রেক্ষিত গুলিকে পৃথক পৃথক অধ্যায়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

এস কে শ্রীবাস্তব ও একইভাবে তাঁর *'টেরাকোটাস অফ নর্দান ইন্ডিয়া'*[30] গ্রন্থে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষান ও গুপ্ত পর্বে সম্প্রসারিত টেরাকোটার বিভিন্ন দিক ও ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকগুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি মৃৎশিল্পের সহিত সম্পর্কিত নানান দিকের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণে নানা সাহিত্যিক বা তাৎপর্যপূর্ণ লিখিত উপাদানের যুক্তির প্রয়োগ করেছেন তাঁর লেখনী ব্যাপী। একই সূত্রে উল্লেখ করা যায় এস সি কলার *'টেরাকোটা আর্ট অফ নর্থ ইন্ডিয়া'*[31] গ্রন্থটির কথা, যা আদতে একপ্রকার ক্যাটালগের কাজ করে। সমগ্র গ্রন্থটি জুড়ে টেরাকোটা চিত্রের বিপুল সম্ভার বিদ্যমান যা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে এক সার্বিক ধারণা পোষণ করে। শিল্পধারার আলোচনায় এজাতীয় চিত্র সম্বলিত গ্রন্থের আবশ্যিকতা নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

এপ্রসঙ্গে অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত,*'ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড'*[32]। যেখানে সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় টেরাকোটা শিল্পের এক বিস্তীর্ণ চিত্র উপস্থাপিত। বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক রচিত ভিন্ন অঞ্চল ও সময়পর্বে বিকশিত টেরাকোটা

---

[29] পি এল গুপ্তা, *গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট,* বারাণসী-৫(ইন্ডিয়া), পৃথিবী প্রকাশনী, ১৯৭২

[30] এস কে শ্রীবাস্তব, *টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া,* দিল্লী,পরিমল পাবলিকেশন, ১৯৯৬

[31] এস সি কলা, *টেরাকোটাস অফ নর্থ ইন্ডিয়া,* দিল্লী,আগম কলা প্রকাশন, ১৯৯৩

[32] প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, *ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড,* ভলিউম ৫৪, মুম্বাই, মার্গ, ২০০২

শিল্পইতিহাসের একাধিক প্রবন্ধের উপস্থাপনা রয়েছে গ্রন্থটিতে যা নিঃসন্দেহে আলোচ্য পরিসরে বিশেষ সহায়ককারী উপস্থাপনা। যার মধ্যে উল্লেখ করা চলে সমীর কুমার মুখার্জ্জী রচিত '*টেরাকোটা আর্ট ইন দ্য গাঙ্গেটিক ভ্যালী আন্ডার দ্য কুষানাস্*'[33], যেখানে লেখক বাংলা সহ সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ব্যাপী বিস্তীর্ণ টেরাকোটায় কুষান শৈলীর বিশেষত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন। উক্ত পর্বে এই শিল্পধারার প্রযুক্তিগত, বিষয়বস্তুগত তথা চারিত্রিক বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে সূক্ষ্ম ভাবে তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় অবয়বের পাশাপাশি কিছুটা ভিন্ন প্রবণতা সম্পন্ন অবয়বেরও উপস্থাপনা করেছে এবং পাশাপাশি ধর্মীয় অবয়বের সহিত সম্পর্কিত সাংকেতিক দিকগুলিরও উল্লেখ করেছেন তিনি।

সার্বিক রূপে প্রাচীন ভারতীয় মৃৎশিল্পের ইতিহাসে এজাতীয় লেখনী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি একদম প্রাথমিক পর্বের কিংবা আদি ঐতিহাসিক পর্বের আলোচনায় সীমিত। যেহেতু আদি মধ্য যুগীয় পর্বে মৃৎশিল্পের বিকাশ মুখ্যত বাংলা কেন্দ্রিক (ব্যতিক্রম বিহারের অ্যান্টিচক) ফলত সার্বিক রূপে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই সংক্রান্ত আলোচনা বিরল। তবে আদি ঐতিহাসিক পর্বকে বাদ দিয়ে সরাসরি আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের সম্পূর্ণ অনুধাবনও সম্ভব নয় ফলত আলোচ্য পরিসরে উক্ত কালপর্বের রচনাবলীকেও সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে।

৩.২ বাংলার মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা

বাংলায় পোড়ামাটি শিল্পের এক দীর্ঘকালীন ক্রমপ্রবাহমানতা লক্ষণীয়, যা ভারতের অন্য যেকোনো অঞ্চলে বিরল। ফলত এই সম্পর্কিত আলোচনাও নেহাত কম নয়। প্রথমেই বলা যায় সরসী কুমার সরস্বতীর, *আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল*[34] আলোচ্য পরিসরে প্রথম দিকের উপস্থাপনা যেখানে অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের পাশাপাশি বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারা বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। প্রায় মৌর্য পর্বের তমলুক, চন্দ্রকেতুগড় থেকে শুরু করে পাল পর্বীয় পাহাড়পুর শিল্পরীতির এক বিস্তীর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে নানান শিল্পশৈলী, রীতি পদ্ধতি, পোড়ামাটি উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার, তাদের সমস্যা ও বিচিত্র বিষয় সম্পন্ন পোড়ামাটি অবয়বের

---

[33] সমীর কুমার মুখার্জ্জী, 'টেরাকোটা আর্ট ইন দ্য গাঙ্গেটিক ভ্যালী আন্ডার দা কুষানাস', ইন প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, *ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড*, ভলিউম ৫৪, মুম্বাই মার্গ, ২০০২

[34] সরসী কুমার সরস্বতী,*আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল*, কলকাতা, সম্বোহী পাবলিকেশন, ১৯৬২

ক্রমবিকাশ জনিত দিকগুলিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন বঙ্গীয় টেরাকোটা অবয়বের সময়সীমা নির্ধারিত নয়। এর জন্য তিনি সমকালীন প্রস্তর শিল্পের সহিত তুলনামূলক আলোচনা এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের ভিত্তিতে সময়সীমা নির্ধারনের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক বিদ্যমান।

এই সূত্রেই বলা যায় বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পধারায় অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সীমা রায় চৌধুরীর '*স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজি' : প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল*[35] প্রবন্ধটি। যেখানে তিনি যথাযথ উৎখনন নথীর অভাবে বঙ্গীয় টেরাকোটার সময়কাল নির্ধারনের জটিলতার দিকটি উপস্থাপনা করে দেখিয়েছেন এই সমস্যার দরুন সাধারণত অবয়বের শৈলীর (Style) ওপর নির্ভর করে উত্তর ভারতীয় টেরাকোটা শৈলী কিংবা প্রস্তর শিল্পের সহিত তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে এর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যথাযথ নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন এবং পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত উৎখনন বা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের কথা বলেন। তবে যেহেতু আরোপিত শৈলী যেকোনো শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাই যদিও বা শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলোচনা করতে হয় সেক্ষেত্রে সমজাতীয় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে অবস্থিত অঞ্চলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় অধিক আলোকপাত করা উচিৎ কেননা ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে ভিন্ন আর্থ-সামাজিক,রাজনৈতিক উপাদানের ফলে শিল্প বিকাশের প্রেক্ষিতও সম্পূর্ণ ভিন্ন, ফলে সেক্ষেত্রে এইরূপ আলোচনা সংশয়াত্মক ফলপ্রদান করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তবে এই সময়কাল নির্ধারণ জনিত সমস্যা বাংলায় আদি ঐতিহাসিক মৃৎশিল্পের আলোচনায় প্রযোজ্য হলেও আদি মধ্যযুগীয় পর্বে কিন্তু ততখানি প্রযোজ্য নয়। কেননা সেক্ষেত্রে মৃৎশিল্প মূলত প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্যের অংশ হিসেবে উপস্থাপিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যান্য প্রত্নসাক্ষ্যের নিরিখে যাদের সময়কাল নির্ধারণ তুলনামূলক সহজসাধ্য।

[35] সীমা রায় চৌধুরী, 'স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজিঃ প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল', গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত *আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, নিউ পার্সপেক্টিভস,* কলকাতা, সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০২

সীমা রায় চৌধুরীরই *টেরাকোটা আর্ট*[36] নামক অপর এক লেখনী আলোচ্য পরিসরে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এর মধ্যে তিনি একদম প্রায়ঐতিহাসিক পর্ব থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার টেরাকোটার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যদিও এই আলোচনা প্রধানত বর্ণনামূলক এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের প্রয়াস সেভাবে লক্ষণীয় নয়। তবে বঙ্গীয় টেরাকোটার বিস্তৃত ধারণা প্রদানে এই লেখনীটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর এস এস বিশ্বাসের '*টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল*'[37] এর কথা উল্লেখ্য যেখানে তিনি বঙ্গীয় বিভিন্ন টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলের উল্লেখ সহ এই শিল্পধারার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন শৈলী বা ভঙ্গীর দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। তবে শুধু যে অবয়বের বাহ্যিক আঙ্গিক বা শৈলীই যথেষ্ট নয় সে দিকটিও উল্লেখ করেন এবং এর পশ্চাতে নিহিত সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই শিল্পধারাকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। বাংলার টেরাকোটার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনায় তাঁর কাজটিই প্রথম বিস্তৃত প্রয়াস বলা চলে।

বাংলার মৃৎশিল্পের আলোচনায় অবশ্য উল্লেখ্য গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত '*এলোকোয়েন্ট আর্থ, আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল*' গ্রন্থটি।[38] এটি মূলত কলকাতার স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম এ সংরক্ষিত প্রায় ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে মোটামুটি গুপ্ত পর্যায় পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা উপাদান সমূহের বিস্তীর্ণ উপস্থাপনা, যেখানে সুস্পষ্ট চিত্র সহকারে বিষয় ভিত্তিক বিভাজন দ্বারা প্রতিটি অবয়বের নিখুঁত বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রন্থের প্রথমার্ধে আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পের সাথে সম্পর্কিত পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন দিক এবং প্রত্নস্থল সমূহেরও বিস্তীর্ণ উল্লেখ

---

[36] সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', আব্দুল মোমিন চৌধুরী অ রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ*, ভলিউম-২, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮

[37] এস এস বিশ্বাস , *টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল*, দিল্লী, আগম কলা প্রকাশনী, ১৯৮১

[38] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ, আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল* , কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম , ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭

করা হয়েছে। নির্দিষ্ট রূপে আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটা শিল্পের আলোচনায় এটি বিশেষ আকর গ্রন্থ সন্দেহ নেই।

প্রাচীন বা আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ সৈফুদ্দিন চৌধুরীর *আর্লি টেরাকোটা ফিগারিনস্ অফ বাংলাদেশ*[39], এই গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা জুড়ে বিস্তৃত মৃৎশিল্পের সমৃদ্ধ উপস্থাপন করেছেন। যেখানে বিশেষরূপে অধুনা বাংলাদেশের কেন্দ্রগুলির সূক্ষ্ম উপস্থাপন রয়েছে এবং মৃৎশিল্পের উদ্ভব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু, নির্মাণ প্রযুক্তি সহ বিবিধ প্রেক্ষিত তুলে ধরেছে। বর্তমান আলোচনার পরিসরে এটি নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্পক্ষেত্রে অন্যতম পথপ্রদর্শক গ্রন্থ অবশ্যই ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত '*লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে*[40] প্রাক গুপ্ত বঙ্গীয় বাংলার বিভিন্ন শিল্পের আভাষ থাকলেও তার রচনাটিতে বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছে পোড়ামাটি শিল্পের উল্লেখ। যেখানে তিনি উক্ত পর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি-কলাকৌশল, বিচিত্র বিষয় সম্পন্ন টেরাকোটা অবয়বের উপস্থাপনা সহ উক্ত শিল্পের সহিত সম্পৃক্ত বহির্বঙ্গীয় ঐতিহ্যের দিকটিকে উপস্থাপিত করেন এবং বঙ্গীয় টেরাকোটায় উত্তর ভারতীয় আদর্শ কিরূপে সংমিশ্রিত তার আভাষ দেন। পাশাপাশি এই শিল্পের চরিত্র নিয়ে ভাবনার দিকটিকেও সম্প্রসারিত করেন অর্থাৎ বহুক্ষেত্রে খুব সহজ ভাবে এরূপ শিল্পকে লোকশিল্প বা প্রান্তীয় শিল্প রূপে গন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন একই শিল্পী লোকশিল্পের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ মার্গের শিল্পের সৃষ্টিকর্তা রূপে পরিচিতি লাভ করতে পারে উপযুক্ত আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ পেলে। ফলত সর্বদা শিল্পের মাধ্যম, আর্থ-সামাজিক পটভূমি, পৃষ্ঠপোষকের চরিত্র প্রভৃতি বিষয় খেয়াল রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর এই আলোচনায় সময়কাল ভিন্ন হলেও আদি মধ্য যুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় তাঁর আলোচনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি যে অনুরূপভাবেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বলা বাহুল্য।

---

[39] সৈফুদ্দিন চৌধুরী, *আর্লি টেরাকোটা ফিগারিনস অফ বাংলাদেশ*, ঢাকা,বাংলা একাডেমী, ২০০০

[40] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে*, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এর *‘টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি*[41] নামক প্রবন্ধটিও আলোচ্য পরিসরে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও তাঁর ক্ষেত্র সমীক্ষার কেন্দ্র বা পরিসর ভিন্ন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছেন যে এই জাতীয় আলোচনায় কখনোই শিল্পের বাহ্যিক আঙ্গিকগত আলোচনার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়। এসকল অবয়বের সহিত একটি নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপট বা নির্দিষ্ট চিন্তন জড়িত থাকে যার দ্বারা দীর্ঘকাল ব্যাপী তা সমাজে প্রবহমান থাকে। ফলত উক্ত সামাজিক প্রক্রিয়াকে অন্বেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখ্য সাম্প্রতিক পর্বে প্রকাশিত ডঃ উমা চক্রবর্তীর *বেঙ্গল টেরাকোটাসঃ এ নিউ এপ্রোচ, ফ্রম আর্লিয়েস্ট টাইম টু টুয়েলভথ সেঞ্চুরি সি ই*[42] গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে লেখিকা সমগ্র প্রাচীন বাংলার প্রেক্ষাপটে পোড়ামাটি শিল্পের প্রাপ্তি, প্রযুক্ত পদ্ধতি, প্রসার কেন্দ্রসমূহ, উপস্থাপিত বিষয়বস্তু এবং আলোচ্য মৃৎশিল্পের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের বিস্তৃত আলচনা করেছেন। আলোচ্য মৃৎশিল্পের অনুধাবনে যা নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত উপস্থপিত হলেও এই শিল্পের নিরিখে আদতে সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ কিন্তু সেভাবে লক্ষণীয় নয়।

সার্বিক রূপে প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি পোড়ামাটি সমৃদ্ধ নির্দিষ্ট কিছু প্রত্নস্থল কেন্দ্রিক আলোচনাও এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। আদি ঐতিহাসিক বাংলার কেন্দ্রগুলিকে বাদ দিয়ে প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাস হয়তো অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এই সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষ উল্লেখ্য চন্দ্রকেতুগড়ের কথা এবং সেক্ষেত্রে প্রায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এনামুল হকের

---

[41] কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ‘টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি’ , গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত *আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া* , *নিউ পার্সপেক্টিভস,* কলকাতা, সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০২

[42] ডঃ উমা চক্রবর্তী, *বেঙ্গল টেরাকোটাসঃ এ নিউ এপ্রোচ, ফ্রম আর্লিয়েস্ট টাইম টু টুয়েলভথ সেঞ্চুরি সি ই,* আর্লি বেঙ্গল আর্ট সিরিজ, ভলিউম ১, কলকাতা, লেভান্ত বুকস, ২০২১

'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেসার হাউস অফ বেঙ্গল টেরাকোটাস'[43] গ্রন্থ, যেখানে তিনি চন্দ্রকেতুগড়ের ভৌগোলিক অবস্থান, উৎখনন সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যাবলী, ও অন্যান্য প্রত্নসাক্ষ্য সহ প্রায় ৯৬৩ টি পোড়ামাটি অবয়বের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেখানে মৌর্য থেকে গুপ্তপর্ব পর্যন্ত এই শিল্পের রীতি শৈলী, বিষয়বস্তু সহ নানা দিকের পাশাপাশি তৎকালীন শিল্পীদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু চিত্র তুলে ধরেন যা অন্যত্র বিরল। চন্দ্রকেতুগড়ের নাগরিক সংস্কৃতির ইঙ্গিতবাহী রূপে তিনি শিল্পধারার বিকাশকে উল্লেখ করেছেন।

আবার চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে দীর্ঘ কাজ রয়েছে গৌরীশংকর দে-র। গৌরীশংকর বাবু এবং তার পুত্র শুভ্রদ্বীপ দে কর্তৃক সম্পাদিত দুই খণ্ডে বিভক্ত *'চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশন'*[44] নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে। একটি খণ্ডে(দ্বিতীয়) চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থান, পরিবেশ, বাণিজ্য বা আনুসাঙ্গিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিতের উপস্থাপনা করেছেন এবং অপর খণ্ডটি(প্রথম) বিশেষ রূপে শিল্প উপাদান কেন্দ্রিক যার মূল অংশ জুড়ে রয়েছে পোড়ামাটি শিল্প উপাদানের বিস্তৃত বর্ণনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আদি ঐতিহাসিক বাংলার অন্যতম টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল ছিল অধুনা বাংলাদেশের মহাস্থানগড় কেন্দ্রটি যা বর্তমান আদি মধ্য যুগীয় টেরাকোটা শিল্পের আলোচনাতেও অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্র। তবে তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা যায় ফ্রান্স বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত উৎখনন জনিত কর্মকান্ডের (১৯৯৩-১৯৯৯) রিপোর্টে বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত টেরাকোটা অবয়বগুলির উপস্থাপনা থাকলেও এই সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়ককারী তথ্য বা সেকেন্ডারি উপাদান কিন্তু একান্তই সীমিত। তা স্বত্তেও অবশ্য উল্লেখ্য যে প্রবন্ধটির কথা বলতে হয় এম এফ ব্যুসাক ও স্যান্ড্রিন গিল রচিত *'মোল্ডেড টেরাকোটা প্লাকস্ ফ্রম মহাস্থান'*[45] যেখানে উৎখননের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন টেরাকোটা অবয়বের প্রাপ্তিকে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারা উল্লেখ করেছেন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দিক হল চন্দ্রকেতুগড় বা অন্যান্য গাঙ্গেয়

---

[43] এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, *চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরাকোটাস*, আই সি এস বি এ, ঢাকা ২০০১

[44] গৌরীশংকর দে ও শুভ্রদীপ দে, *চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ লস্ট সিভিলাইজেশন, আর্ট অ্যান্ড আর্ট মোটিফ,* সাগ্নিক বুকস, কলকাতা ২০০৪

[45] এম এফ ব্যুসাক ও স্যান্ড্রিন গিল, 'মোল্ডেড টেরাকোটা প্লাকস্ ফ্রম মহাস্থান', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,* খন্ড-৬, বাংলাদেশ, আই সি এস বি এ, ২০০১

উপত্যকীয় কেন্দ্রের তুলনায় এখানে আদি ঐতিহাসিক পর্বীয় টেরাকোটার প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে। কিন্তু প্রাপ্ত উপাদানগুলির শৈল্পিক দক্ষতা, উপস্থাপিত বিষয়াবলী বা সংখ্যাগত দিক থেকে অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় সীমিত হলেও এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ন বিষয় হল, পূর্ববর্তী অধিকাংশ প্রত্নস্থলগুলির ক্ষেত্রে শিল্প উপাদান যত্রতত্র প্রাপ্ত হওয়ায় সময়কাল জনিত সংশয় বিদ্যমান কিন্তু মহাস্থানে অধিকাংশ টেরাকোটাগুলি উৎখনন সূত্রে নির্দিষ্ট স্তরে প্রাপ্ত, ফলে তা কালপর্যায় নির্ধারনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন। উল্লেখ্য এখানেও কিন্তু মৌর্য রীতি থেকে শুরু করে সমৃদ্ধ শুঙ্গ ও কুষান শৈলীর বিচিত্র ভঙ্গীর একাধিক পোড়ামাটি উপস্থাপনার সন্ধান মেলে।

এরপর সরাসরি আদি মধ্য যুগীয় বাংলার বিবিধ প্রত্নস্থল কেন্দ্রিক মৃৎশিল্প সংক্রান্ত চর্চায় প্রবেশ করে দেখা যায় এক্ষেত্রে অধিকাংশ লেখনীই বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আবিষ্কৃত টেরাকোটা ফলকের বিষয়বস্তু বা অন্যান্য পরিসর সংক্রান্ত বর্ণনামূলক আলোচনা, তাঁর সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস প্রায় নেই বললেই চলে। প্রথমেই উল্লেখ করা চলে আফরোজ আকমাম রচিত *'মহাস্থান'*[46] গ্রন্থটির, মহাস্থানে আদি ঐতিহাসিক পর্বের টেরাকোটা সাক্ষ্য কিছুটা সীমিত হলেও গুপ্ত পরবর্তী ও পাল পর্যায়ের ক্ষেত্রে এই চিত্রটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। লেখিকা উক্ত পরবর্তী পর্যায়েরই কিছুটা ভিন্নধর্মী টেরাকোটা উপাদানের বিপুল সম্ভারের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে সামগ্রিকরূপে মহাস্থানগড়ের পোড়ামাটি শিল্প ঐতিহ্যকে বিশেষ খ্যাতি প্রদান করে সন্দেহ নেই। তিনি প্রত্নস্থলরূপে মহাস্থানগড়ের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, মূল উৎখনন সংক্রান্ত নানান নথী সহ পারিপার্শ্বিক বিস্তৃত অসংখ্য স্তূপ, প্রাপ্ত প্রত্নসাক্ষ্য সম্পর্কেও লিপিবদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি গুপ্ত ও তৎ পরবর্তী পর্যায়ের প্রাপ্ত অসংখ্য অবয়ব যথা- বিভিন্ন ভঙ্গীর বোধিস্বত্ব, ভৈরব, তীর্থংকর, নানান পশুপাখি, গান্ধর্ব প্রভৃতি আরও নানান উপস্থাপনার চিত্র সহ উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি অন্যতম উল্লেখ্য আবার মহাস্থান দূর্গাঞ্চলের নিকটবর্তী একটি ঢিবি পলাশবাড়ি থেকে গুপ্ত পর্বীয় বেশ কিছু ফলক পাওয়া যায় যেখানে রামায়নের আদিকান্ড ও অযোধ্যাকান্ডের প্রায় সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণিত বিস্তীর্ণ ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেগুলি প্রতিটি ব্রাহ্মী লিপি সম্বলিত, ফলে উক্ত অঞ্চলে একাধারে বর্ণনা মূলক শৈলীর উপস্থিতি ও রামায়ণ কাহিনীর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আলোচ্য উপাদান থেকে।

[46] আফরোজ আকমাম – *মহাস্থান,* বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা ২০১৬

বলা বাহুল্য আলোচ্য পরিসরের শিল্পধারা অপেক্ষা এই শৈলী যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা কিন্তু তা স্বত্তেও মহাস্থানগড়ের শিল্প ইতিহাসে তা অসামান্য।

জগজ্জীবনপুর সম্পর্কে উল্লেখ করা চলে গৌতম সেনগুপ্তের *নন্দদীর্ঘিবিহারঃ অ্যান ওভারভিউ*[47] প্রবন্ধটির কথা যেখানে জগজ্জীবনের অন্যান্য আলোচনার পাশাপাশি মৃৎশিল্পের বিস্তার ও তার বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন আলোচ্য পরিসরে যা বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়া এই কেন্দ্রের উৎখনন রিপোর্টটি থেকে এই অঞ্চলের টেরাকোটা সম্পর্কে বিস্তীর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

উপরিল্লিখিত এজাতীয় একাধিক রচনা প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্প সম্পর্কে বিবিধ ধারণা প্রদান করে।

৩.৩ আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে পোড়ামাটি ফলকে উপস্থাপিত নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক আলোচনাঃ

আদি ঐতিহাসিক বাংলার ক্ষেত্রে যেমন চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, তিলপি, বানগড়, মহাস্থানগড় সহ বিবিধ প্রত্নকেন্দ্রের মৃৎশিল্প সংক্রান্ত একাধিক আলোচনা রয়েছে আদি মধ্যযুগীয় পর্বেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয়। আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বিভিন্ন মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল কেন্দ্রিক কিংবা উক্ত কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত মৃৎফলকের বিষয়বস্তু বা অন্যান্য পরিসর সংক্রান্ত একাধিক আলোচনা রয়েছে। কিন্তু সেগুলি মূলত বর্ণনামূলক আলোচনা, তাঁর সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস প্রায় নেই বললেই চলে।

উল্লেখ করা চলে গৌতম সেনগুপ্ত ও মধুরিমা সেনগুপ্ত রচিত *প্রাচীন বাংলার লোকায়ত শিল্পধারা*[48] প্রবন্ধটির কথা, যেখানে বাংলার লোকায়ত শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে মহাস্থানের নিকটবর্তী

---

[47] গৌতম সেনগুপ্ত, ‘নন্দদীর্ঘিবিহারঃ অ্যান ওভারভিউ’, *গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অ্যান্ড বিয়ন্ডঃ এক্সপ্লোরিং আর্ট অ্যান্ড আইকনোগ্রাফি অফ ইস্টার্ন অ্যান্ড নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া*, দিল্লী, প্রাইমাস বুকস, ২০২৩

[48] গৌতম সেনগুপ্ত ও মধুরিমা সেনগুপ্ত, ‘প্রাচীন বাংলার লোকায়ত শিল্পধারা’, *লোকশ্রুতি*, রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৪

পলাশবাড়ী কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত মৃৎশিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং তার সাথে লোকায়ত চেতনার ক্ষেত্রটিকে সংযুক্ত করেছেন।

পলাশবাড়ী সম্পর্কেই উল্লেখ করা চলে পারুল পান্ড্য ধরের *এপিক ভিসনস ইন টেরাকোটা, স্টোন অ্যান্ড স্টাকো, রামায়না ইন ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার* [49] রচনাটির কথা, যিনি সার্বিকভাবে বাংলার শিল্পে রামায়ণ উপস্থাপনার আলোচনা প্রসঙ্গে পলাশবাড়ীর আলোচনা করেছেন। পলাশবাড়ী থেকেই একমাত্র বৈষ্ণব পরিসরে মৃৎশিল্পের সন্ধান মেলে এবং রামায়ণ কাহিনীর বিস্তীর্ণ উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় যা বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

জগজ্জীবনপুরের মৃৎশিল্প সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ নিকোলাস মরিসের *অ্যাপোট্রোপেয়িক পাওয়ার অ্যান্ড রিচুয়াল এফিকেসি ইন দ্য বুদ্ধিস্ট আর্ট অফ মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অবসারভেশনস অন দ্য টেরাকোটা স্কাল্পচারস অফ নন্দদীর্ঘি বিহার*[50] শীর্ষক প্রবন্ধটি যেখানে জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত মৃৎ অবয়ব সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন। যেখানে মূলত উপস্থাপিত অবৌদ্ধ দেবদেবী বা অর্ধঐশ্বরিক অবয়বগুলিকে বৌদ্ধ তন্ত্র দর্শন ও সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট রূপে বিশ্লেষণ করা যায় কিনা সেই সংক্রান্ত আভাষ দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ রূপে বৌদ্ধসাহিত্যের 'প্রতিরক্ষা' চেতনার উপস্থিতির কথা বলেছেন। এমনকি উপস্থাপিত পশুপক্ষী, গাছপালা, নৃত্যবাদ্যকর প্রভৃতি উপস্থাপনার সাথেও আচার বিশ্বাস জনিত চেতনা জড়িত ছিল কিনা তার উল্লেখ করেন। সার্বিকভাবে বৌদ্ধ বিহারে উপস্থাপিত এজাতীয় টেরাকোটা ভাস্কর্য সম্পর্কে ভিন্ন ভাবনার কথা বলেন এবং প্রচলিত ধারণা অপেক্ষা অধিক কৌশলপূর্ণ চেতনায় বৌদ্ধ ভাস্কর্যের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেন। আদি মধ্য যুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনায় এটি অন্যতম সমৃদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা।

[49] পারুল পান্ড্য ধর, 'এপিক ভিসনস ইন টেরাকোটা, স্টোন অ্যান্ড স্টাকো, রামায়না ইন ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার', পারুল পান্ড্য ধর (সম্পা.) *কানেক্টেড হিস্টরিস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া,* সেজ পাবলিকেশনস, ২০২৩

[50] নিকোলাস মরিসে, 'অ্যাপোট্রোপেয়িক পাওয়ার অ্যান্ড রিচুয়াল এফিকেসি ইন দ্য বুদ্ধিস্ট আর্ট অফ মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অবসারভেশনস অন দ্য টেরাকোটা স্কাল্পচারস অফ নন্দদীর্ঘি বিহার', *অভিষেক সিং অমর,* নিকোলাস মরিসে এবং আকিরা সিমাডা (সম্পাদিত), *অন দ্য রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট অফ আর্লি মিডিএভাল বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন সাউথ এশিয়া,* রিওকোকু ইউনিভার্সিটি, জাপান, রিভাস, সিরিজ অফ ওয়ার্কিং পেপার ৩৪, ২০২১

মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন এর *পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকচিত্রে উদ্ভিদবৈচিত্র্যের প্রতীকায়ন*[51] যেমন একদিকে উক্ত কেন্দ্রে মৃৎশিল্পে উপস্থাপিত উদ্ভিদ জগতের সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দেয় তেমনই মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন ও শরমিন রেজয়ানা এর যুগ্মভাবে রচিত *কৃষ্ণা লিজেন্ড ইন ভবদেব বিহার,*[52] *অ্যানিম্যাল রিপ্রেসেন্টেশন (ম্যামেলস) ইন সোমপুর মহাবিহার ইন সিটু টেরাকোটা প্লাকস,*[53] *পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাচীন বাংলার নৃত্যগীত*[54] প্রভৃতি সহ আরও একাধিক প্রবন্ধ সমকালীন বাংলার বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রের পোড়ামাটি ফলকে উৎকীর্ণ বিবিধ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দেয়।

একইভাবে আরও একাধিক প্রবন্ধের উপস্থাপনা রয়েছে 'ইতিহাস অনুসন্ধান', 'জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট', 'পুরাবৃত্ত' প্রভৃতি সহ বিবিধ গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকা সমূহে। এই সকল প্রবন্ধের কথা আলোচ্য পরিসরে তুলে ধরা সম্ভবপর নয় কিন্তু তা স্বত্তেও আলোচ্য পরিসরে এদের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি সমকালীন আদি মধ্যযুগীয় ইতিহাসের আর্থসামাজিক,রাজনৈতিক বিবিধ পরিসরে রিওসুকে ফুরুই, সায়ন্তনী পাল, সুচন্দ্রা ঘোষ, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের একাধিক রচনা সার্বিক ভাবে বাংলার টেরাকোটা শিল্পের প্রেক্ষাপট অনুধাবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সন্দেহ নেই।

সুতরাং উপরিল্লিখিত এই আলোচনার ভিত্তিতে দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে পোড়ামাটি শিল্প সম্পর্কে মোটামুটিভাবে এসকল গবেষকরা কি ধরণের কাজ করেছেন। দেখা যায় নির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত কিছুটা বর্ণনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়েছে, অর্থাৎ নানান বিষয়ের উপস্থাপনা, তাদের শ্রেণীবিভাগ, প্রযুক্ত কলাকৌশল, বাহ্যিক গড়ন প্রভৃতি বিষয়ের

---

[51] মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন, পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকচিত্রে উদ্ভিদবৈচিত্র্যের প্রতীকায়ন, এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১০

[52] মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন ও শরমিন রেজয়ানা, 'কৃষ্ণা লিজেন্ড ইন ভবদেব বিহার', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,* খন্ড ২০, ঢাকা, আই সি এস বি এ, *২০১৫*

[53] মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন ও শরমিন রেজয়ানা, 'অ্যানিম্যাল রিপ্রেসেন্টেশন (ম্যামেলস) ইন সোমপুর মহাবিহার ইন সিটু টেরাকোটা প্লাকস', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,* খন্ড ১৭, ঢাকা, আই সি এস বি এ, ২০১২

[54] মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন ও শরমিন রেজয়ানা, *পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাচীন বাংলার নৃত্যগীত, প্রত্নতত্ত্ব,* বাংলাদেশ, জার্নাল অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ২০১৪

ওপরই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত নির্দিষ্ট আকৃতির অবয়ব গড়ে তোলার তাৎপর্য কি কিংবা আলোচ্য শিল্পের নিরিখে সম্পৃক্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায় সেজাতীয় আলোচনা লক্ষণীয় নয়, আবার সামাজিক প্রেক্ষিতের কথা বললেও তা বিশ্লেষণের ভঙ্গীও বহুক্ষেত্রেই সীমিত। খুব সাধারণভাবে দেবদেবী অবয়ব সমূহকে ধর্মীয় ইতিহাসের অঙ্গ রূপে বা অন্যান্য অবয়বগুলিকে সামাজিক জীবনযাত্রার অঙ্গ রূপে তুলে ধরা হয় কিন্তু কয়েক সহস্র বছর পূর্বের সমাজকে বা মানুষের চিন্তনকে কি প্রকৃতই ততখানি সহজে নিশ্চিত রূপে তুলে ধরা সম্ভব? সে জাতীয় কোনও বিশ্লেষণ কিন্তু অনুপস্থিত। ফলত একাধিক প্রেক্ষিত কিন্তু জড়িয়ে রয়েছে বাংলার টেরাকোটা শিল্প সংক্রান্ত আলোচনায়,যেখানে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আলোচ্য গবেষণা পত্রটিতে উক্ত উপেক্ষিত প্রেক্ষিতগুলিকেই তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

৪. গবেষণা প্রস্তাবনা/প্রশ্নাবলীঃ

অদ্যাবধি আলোচনায় বর্তমান গবেষণা পরিসর, গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিক বিবিধ রচনাবলীর সমীক্ষা, অস্পর্শিত গবেষণা পরিসর ও সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে গবেষণা পত্রটিতে।

বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় উপস্থাপিত মৃৎশিল্পের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ কতখানি সম্ভব? সেক্ষেত্রে উপস্থাপিত এই শিল্পের নিরিখে তার সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়? এই প্রেক্ষিত থেকে আরও একাধিক আনুসাঙ্গিক প্রশ্নের উপস্থাপন করা হয়েছে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে যা নীচে উল্লিখিত হল। যথা-

- আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় সমগ্র পর্ব জুড়ে ভিন্ন ধাঁচের একাধিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন টেরাকোটা অবয়বের বিকাশ ঘটেছে কিন্তু উক্ত বিচিত্র বিষয়বস্তুর পশ্চাতে নিহিত সম্ভাব্য চিন্তন বা উদ্দেশ্যকে কিভাবে দেখা প্রয়োজন? সেগুলি কি কেবলই শিল্পীর নান্দনিক শিল্পস্বত্তার প্রতিচ্ছবি

নাকি যথেষ্ট সচেতন ভাবেই যথাযথ কৌশল ও পরিকল্পনা মাফিক এজাতীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে? উপস্থাপিত এসকল বিষয়াদির সামাজিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কতখানি সম্ভব?

- এই শিল্পের সামাজিক ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তথা এই শিল্প নির্মাণকারী বা মৃৎশিল্পীদের সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়? তাঁদের অস্তিত্ব, সামাজিক অবস্থান ও ইতিহাস সম্পর্কে কিরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব?
- এই শিল্প সৃষ্টির পশ্চাতে নিহিত অনুপ্রেরণা কি ছিল? আলোচ্য পর্বে বৃহৎ পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অঙ্গ রূপে বিকশিত মৃৎভাস্কর্যের পশ্চাতে নিহিত অনুদান বা পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র কিরূপ ছিল? আর সেই পৃষ্ঠপোষকের সমাজ সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়?
- উপস্থাপিত এই মৃৎ ভাস্কর্যের অবলোকনকারী সমাজ তথা সাধারণ মানুষের সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে কতখানি বিশ্লেষণ সম্ভব? এই শিল্প বিকাশে ও চরিত্র গঠনে তাঁদের ভূমিকার ক্ষেত্রটিকে কতখানি নির্মাণ করা যায়?
- সমকালীন সমাজে এই মৃৎশিল্প কি সামাজিক মর্যাদার স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিল? পাশাপাশি বাংলা তথা ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এই মৃৎশিল্পের অবস্থান কোথায়?

উপরিল্লিখিত এজাতীয় বিবিধ প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণা পত্রে। এগুলি আলোচনার স্বার্থে সমগ্র বিষয়টিকে মূলত ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.অধ্যায় বিভাজনঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পঃ ঐতিহাসিক প্রসার ও বিবর্তন – এই অধ্যায়ে টেরাকোটা শিল্পের প্রাথমিক পরিচিতি প্রদান সহ বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। আদি ঐতিহাসিক পর্ব তথা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়- দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে বাংলার মৃৎশিল্প কিরূপ উত্থান বা বিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে, সমকালীন সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিসরের সাথে এই শিল্প ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশের সম্পর্ক কিভাবে বিকশিত হয়েছে, তা উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। যেখানে দেখা যায় আদি মধ্যযুগীয় পর্বে

বাংলার মৃৎশিল্প এক সম্পূর্ণ নবচরিত্রে বিকাশ লাভ করে। এর পূর্বে বাংলার মৃৎশিল্প বাহ্যিক উপস্থাপনা, আকার, শৈলী, বিষয়বস্তু প্রভৃতি দিক থেকে আদি মধ্যযুগ অপেক্ষা ছিল ভিন্ন। তা ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, একক অবয়ব যা সহজেই বহন করা যেত। সেগুলি ছিল মূলত বানিজ্যিক প্রসার ও মানুষের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার ফলশ্রুতি। সেখানে রাষ্ট্র বা প্রশাসনের কোনও ভূমিকা ছিলনা। কিন্তু আদি মধ্যযুগীয় পর্বে বাংলার মৃৎশিল্প সম্পূর্ণ রূপে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে প্রসার লাভ করেছে এবং তা রাষ্ট্রের প্রভাবান্বিত। এই পর্বে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলস্বরূপ ও বানাজ্যিক সংযোগের ফলে বাংলার মৃৎশিল্প ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আরাকান বা বাগানের মত কেন্দ্রেও প্রসার লাভ করেছে। যা মৃৎশিল্পের এক বৃহত্তর প্রসারের ক্ষেত্র তুলে ধরে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলার মৃৎশিল্পঃ ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচিত প্রত্নকেন্দ্রসমূহ- আলোচ্য প্রেক্ষাপটে পোড়ামাটি শিল্পধারা গড়ে ওঠার পশ্চাতে নিহিত প্রবনতাগুলির সম্ভাব্য বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ের মূল উপজীব্য। ফলত এই অধ্যায়ের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু অনেকাংশে বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, ভূতাত্ত্বিক, নদনদী বা জলপথ সংক্রান্ত পরিকাঠামো, জলবায়ু প্রভৃতি বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কোন ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বা কেন এই শিল্পধারার বিকাশ ঘটেছে? পাশাপাশি আলোকপাত করা হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ওপরেও, তুলে ধরা হয়েছে উক্ত নানান সম্ভাবনা। এছাড়াও আলোচ্য সময়পর্বে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ- দ্বাদশ শতাব্দী) পোড়ামাটি শিল্পের প্রাপ্তিস্থলসমূহ যথা, অধুনা বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতী এবং পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুর এর প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণাদির আলোচনাও উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বঙ্গীয় মৃৎশিল্পঃ বর্ণনা ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ - এই অধ্যায়ে নির্ধারিত সময়পর্বে যে মৃৎশিল্পধারার অনুসন্ধান পাওয়া যায় ভিন্ন বঙ্গীয় প্রত্নস্থলভেদে ও উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর নিরিখে তাদের পৃথক ও নিখুঁত চিত্রায়নের প্রয়াস করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিল্প অবয়বে সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুর বিস্তৃত আলোচনা, উক্ত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ তথা একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। পাশাপাশি আলোচ্য অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য - বাংলার এই শিল্পধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান বা এর মধ্যে আদৌ কতখানি

স্বতন্ত্রতা বা নিজস্বতা নিহিত ছিল তার বিশ্লেষণ। যেমন, আপেক্ষিকভাবে মনে করা যেতে পারে এই পর্বে বঙ্গীয় মৃৎশিল্প রীতিতে এক অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটেছিল যা পূর্ববর্তী বঙ্গীয় শিল্পঐতিহ্য অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা উভয় দিক থেকেই এক পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলত সেই প্রেক্ষিতটি আলোচ্য পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় মৃৎশিল্প ধারার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বিকাশের দিকটি অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এছাড়া বলা যায় আলোচ্য সময়পর্বে আমরা ব্যাপকঅর্থে বঙ্গীয় শিল্প শব্দটি ব্যবহার করলেও বাংলায় আদতে বিভিন্ন উপাঞ্চল বা উপবিভাগের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল, সুতরাং তাদের সূক্ষ্ম আঞ্চলিক ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের উপস্থিতির সম্ভাবনা হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলা যায়না। ফলত ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে বঙ্গীয় মৃৎশিল্পরীতির স্বতন্ত্রতার অনুসন্ধান এবং সার্বিকভাবে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই তৃতীয় অধ্যায়টির রূপ নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মৃৎশিল্প, সমাজ ও ইতিহাসঃ একটি পর্যালোচনা - এই অধ্যায়টি মূলত বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্পধারার সামাজিক ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়েছে। এই শিল্প সমকালীন আর্থসামাজিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে কতখানি ধারণা প্রদানে সক্ষম? একাধারে এর পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র, শিল্পের নির্মাতা বা শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান এবং অবলোকনকারী সমাজ সম্পর্কে কতখানি ধারণা করা যায়? সার্বিক রূপে এই শিল্পের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পাওয়া সম্ভব? এজাতীয় একাধিক প্রশ্ন কিন্তু বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনায় উঠে আসে যা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণে সম্পৃক্ত বৃহত্তর প্রেক্ষাপট অনুধাবনের উদ্দেশ্যে মৃৎশিল্পের পাশাপাশি সমকালীন কিছু সাহিত্য গ্রন্থ ও অভিলেখ এরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

উপসংহারঃ উপসংহার হিসেবে বলা যায় বর্তমান গবেষণা পত্রটি প্রধানত আদি মধ্য যুগীয় বাংলায় গড়ে ওঠা পোড়ামাটি শিল্পধারা বিকাশের পশ্চাতে নিহিত সামাজিক প্রক্রিয়া বা সম্পৃক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণের প্রয়াস। ফলত আলোচ্য এই মৃৎশিল্পের নিরিখে সমকালীন সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে কি ধারণা পাই এবং পাশাপাশি মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস কোথায় তার এক বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে উপসংহার অধ্যায়টিতে। কিন্তু আলোচ্য পরিসরে

নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছনোর মত মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের নিকট উপস্থিত নেই। ফলত এই আলোচনা বহুলাংশে অনুমান নির্ভর এবং ঠিক প্রথাগত উপসংহার এর ন্যায় সিদ্ধান্তপ্রদানকারী নয় বরং একাধিক প্রশ্ন উদ্রেককারী, বাংলার মৃৎশিল্পের পর্যালোচনায় যাদের আলোচনা নিঃসন্দেহে আবশ্যক। পাশাপাশি মৃৎশিল্পের সামাজিক অবস্থান তথা বাংলা কিংবা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে এই শিল্পের অবস্থান কোথায় তার এক আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে বিবিধ শিল্প ইতিহাসচর্চার আলোচনার মধ্য দিয়ে। যেখানে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেসকরা বঙ্গীয় বা ভারতীয় ভাস্কর্যের আলোচনায় প্রস্তর শিল্পকেই মান্যতা দিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃৎশিল্প সেখানে উপেক্ষিত। এই মৃৎশিল্প বা শিল্পীদের কোনও বিস্তৃত আলোচনা উপস্থিত নেই এমনকি মৃৎশিল্পের উল্লেখ থাকলেও তার সামাজিক সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের কোনও প্রয়াস নেই। বিশেষত আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প সম্পর্কে কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। প্রস্তর ভাস্কর্য, ধাতব ভাস্কর্য, চিত্রাবলী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শিল্পইতিহাসে অধিক গ্রহণযোগ্য। এগুলির প্রয়োগ সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় কিংবা শাস্ত্রীয় নিয়মবিধির অনুসারী হওয়ায় কি সেগুলি ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও অধিক সম্মানীয় পদে উন্নীত? আর মৃৎশিল্প নেহাতই সাধারণ মানুষের শিল্প রূপে অবহেলিত? ফলত একদিকে প্রাচীন বিবিধ লিখিত উপাদানে মৃৎশিল্পের শূন্যতা এবং অন্যদিকে আধুনিক ইতিহাসচর্চায় তার সীমিত উপস্থিতি আদতে বাংলার এই মৃৎশিল্পের সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থানের ক্ষেত্রটিকে কোথায় দাঁড় করায় তা নিঃসন্ধেহে ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৬.প্রাথমিক উপাদানের সমীক্ষাঃ

আলোচনা গবেষণা পত্রে প্রধান প্রাথমিক উপাদান রূপে কাজ করেছে মৃৎঅবয়বগুলি স্বয়ং, মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণে তাদের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য বিভিন্ন মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলের উৎখনন রিপোর্টগুলি। কে এন দীক্ষিতের পাহাড়পুর এক্সকাভেশন রিপোর্ট, আবু ইমাম এর ময়নামতী উৎখনন রিপোর্ট, অমল রায়ের জগজ্জীবনপুর রিপোর্ট, বি এস বর্মার অ্যান্টিচক এক্সক্যাভেশন রিপোর্ট কিংবা অশোক দত্তের মোগলমারি উৎখনন রিপোর্ট এর ন্যায় বিবিধ উৎখনন নথীগুলি আলোচ্য পরিসরে অমূল্য উপাদান। এগুলির নিখুঁত উপস্থাপন ও বর্ণনা বাংলার মৃৎশিল্প সম্পর্কিত ধারণার মূল ভিত্তি নির্মাণে বিশেষ

তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া প্রত্যক্ষ রূপে টেরাকোটা সংক্রান্ত অন্য প্রাথমিক উপাদানের উপস্থিতি নেই। তবে আলোচনা প্রসঙ্গে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনে অন্যান্য কিছু প্রাথমিক উপাদানের ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু সাহিত্যগ্রন্থ যথা- আচার্য বিদ্যাকরের সুভাষিত রত্নকোষ[55]', শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'[56], ধোয়ীর 'পবনদূত[57]' প্রভৃতি। পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে আদি মধ্য যুগীয় বাংলার বেশ কিছু অভিলেখসাক্ষ্য, মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষকের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য পরিসরে দান ও দাতার চরিত্র অন্বেষণে এজাতীয় তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসন[58], শ্রী ধারণরাতের কৈলান তাম্রশাসণ[59], দেবখর্গের আশরাফুর তাম্রশাসন[60], জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন[61],ধর্মপালের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম তাম্রশাসন[62] সহ আরও অন্যান্য।

৭. গবেষণা পদ্ধতিঃ

এই গবেষণাটি মূলত সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে, যেখানে যথাযথ গবেষণা প্রক্রিয়া বা মেথোডলজি অনুসরণ করেই তা রূপবিন্যাশের প্রয়াস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিবিধ প্রাথমিক ও সহায়ক উপাদানকে ভিত্তি করে আলোচনাটি গড়ে তোলা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে অধুনা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা যথা কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহালয়, রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালার সংগ্রহালয়, ভারতীয় যাদুঘর, বিহার

---

[55] ড্যানিয়েল এইচ এইচ ইঙ্গলস্, *অ্যান অ্যান্থলজি অফ সংস্কৃত কোর্ট পোয়েট্রি,* হার্ভার্ট ইউনিভার্সিটি প্রেস, (১৯৬৫)

[56] সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, সদুক্তিকর্ণামৃত অফ শ্রীধরদাস, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৬৫

[57] ধোয়ী, *পবন্ দূত, (অনুবাদ- শ্যামাপদ ভট্টাচার্য), সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার, খণ্ড- ১৭ , কলিকাতা, নবপত্র প্রকাশন*

[58] দীনেশ চন্দ্র সরকার, *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* খন্ড -১, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃষ্ঠা- ৩৩১-৩৩৫

[59] ডি সি সরকার, 'দ্য কৈলান কপারপ্লেট ইন্সক্রিপশন অফ কিং শ্রীধারণররাত অফ সমতট', *ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি,* ভলিউম-২৩, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা- ২৩৯

[60] জি এম লস্কর, 'আশরাফুর কপারপ্লেট গ্রান্টস অফ দেবখর্গ', মেময়ার্স অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১(৬), ১৯০৬, পৃষ্ঠা- ৮৫

[61] অমল রায়, *'জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিসেম্বর ২০১২

[62] রিওসুকে ফুরুই, 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ ধর্মপাল, ইয়ার ২৬: টেন্টেটিভ রিডিং অ্যান্ড স্টাডি', *সাউথ এশিয়ান স্টাডিস,* ২৭(২),২০১১, পৃষ্ঠা- ১৫০-১৫১

মিউজিয়াম, বাংলাদেশের ঢাকা ন্যাশনাল মিউজিয়াম, মহাস্থান যাদুঘর, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ময়নামতী যাদুঘর, পাহাড়পুর যাদুঘর প্রভৃতি কেন্দ্রে স্থিত বিবিধ মৃৎঅবয়বের প্রত্যক্ষ পরিদর্শন এবং নথী সংগ্রহ ও পর্যালোচনা দ্বারা গবেষণা ক্ষেত্রটির বিবিধ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উপরিকাঠামোর উর্ধ্বে অন্তর্নিহিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও আনুসাঙ্গিক বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান যথা বিভিন্ন কেন্দ্রের উৎখনন নথী সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রত্নদ্রব্য বা লিপিসাক্ষ্যের বিশ্লেষণ, এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্থিত সাহিত্য গ্রন্থেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে এক বৃহত্তর ধারণা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। কেননা যেকোনো সময়ের সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি তথা উক্ত সমাজে বসবাসরত মানুষের ইতিহাসকে অনুধাবন করতে গেলে মৃৎ-অবয়বের পাশাপাশি এসকল পারিপার্শ্বিক উপাদানও যে বিশেষ বিচার্য বলা বাহুল্য। পাশাপাশি সহায়ক গ্রন্থ রূপে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, গবেষকদের রচনার যথাযথ অনুধাবন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পথপ্রদর্শক হবে সন্দেহ নেই। সেই উদ্দেশ্যে বিবিধ গ্রন্থাগার যথা- ন্যাশনাল লাইব্রেরী, গোলপার্ক রামকৃষ্ণমিশন লাইব্রেরী, রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালার গ্রন্থাগার এ নিয়মিত নথী সংগ্রহ এবং উক্ত নথীর যথাযথ বিশ্লেষণ দ্বারা তা গবেষনা পরিসরে প্রয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি Jstor, Academia.org, Shodhganga প্রভৃতি অনলাইন মাধ্যমগুলি বিবিধ তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অপর একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন আলোচ্য গবেষণা পত্রের গ্রন্থপঞ্জী অংশটি ইংরেজিতে প্রদত্ত, উক্ত নামগুলির যথার্থতা রক্ষার সুবিদার্থে।

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পঃ ঐতিহাসিক প্রসার ও বিবর্তন

ইতিহাস চর্চায় বস্তু-সংস্কৃতির গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথেই প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অনুসন্ধান এবং তাদের যথাযথ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধ হয়। প্রত্নতত্ত্ব যেমন সমকালীন আর্থসামাজিক বা ধর্মীয় আদর্শের অন্যতম দলিল তেমনই শিল্প সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসেও এদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্নউৎখননের সূত্রে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার কিংবা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবিষ্কৃত প্রস্তর যুগের নানাবিধ নিদর্শন এর সূত্রে আজ ভারতীয় ইতিহাস যেমন সামগ্রীকভাবে প্রাগইতিহাসের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, লক্ষ লক্ষ বছরের অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে বাংলাও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ক্রমে বাংলার নানান প্রান্তে প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে শুরু করে আদি ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক এবং আদি মধ্যযুগীয় পর্বের একাধিক প্রত্নস্থল ও প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে বা আজও হয়ে চলেছে বাংলার ইতিহাসে যার গুরুত্ব অসামান্য। যেমন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রস্তর ও তাম্র যুগের নানান আয়ূধ বা উপকরণাদি আবিষ্কৃত হয়েছে যা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের প্রধান নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বর্ধমানে অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরে উৎখননের ফলে বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে পাণ্ডু রাজার ঢিবি ও তার নিকটবর্তী কিছু অংশে যা প্রায় খ্রিষ্ট জন্মের ১৫০০ বছর পূর্ববর্তী সিন্ধু উপত্যকা, মধ্য ভারত বা রাজস্থানের প্রাপ্ত তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির অনুরূপ। এছাড়াও প্রাচীন বাংলা অর্থাৎ অধুনা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের আরও কিছু প্রত্নস্থলের নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি একাধারে যেমন বাংলার বিভিন্ন কালপর্যায়ের ইতিহাসকে তুলে ধরে, তেমনই গবেষণা পত্রটির মূল প্রতিপাদ্য প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসের ধারাতেও এই সকল কেন্দ্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেমন- মঙ্গলকোট, কোটাসূর, পোখন্না, দিহার, তিলদা, পান্না, তমলুক, মোগলমারি, আটঘরা, হরিনারায়নপুর, দেউলপোতা, তিলপি, চন্দ্রকেতুগড়, বানগড়, কর্ণসুবর্ন, জগজ্জীবনপুর, বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি সহ অধুনা বিহার অঞ্চলের অসংখ্য প্রত্নস্থল ক্রমেই আবিষ্কৃত হয়ে

চলেছে দিনদিন এবং সমৃদ্ধ করে চলেছে বাংলার সুপ্ত প্রাচীন ইতিহাসকে।[63] এখানে উল্লিখিত প্রতিটি প্রত্নস্থলই যে তার আকৃতি, অবস্থান, সময়কাল বা চরিত্র বৈশিষ্ট্যে সমগোত্রীয় তা নয়, কিন্তু সমগ্র প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে এই প্রতিটি কেন্দ্র নিজ নিজ ভূমিকায় অসামান্য।

প্রাচীন বাংলার এসকল প্রত্নকেন্দ্র থেকে আবিষ্কৃত বিবিধ প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে রয়েছে অসংখ্য পোড়ামাটি শিল্পসামগ্রী, দীর্ঘকালব্যাপী যার উপস্থিতি প্রাচীন বাংলার সামগ্রিক ইতিহাসের ধারায় এক বিশেষ মাত্রা প্রদান করে। নানান ধাঁচের অজস্র মৃৎ অবয়বের প্রাপ্তি খুব স্পষ্টতই সমকালীন বঙ্গীয় সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই মাধ্যমের গ্রহনযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তাকে দিক নির্দেশ করে। প্রাগৈতিহাসিক পর্বের বেশ কিছু সাক্ষ্য সহ বিশেষ রূপে আনুমানিক তৃতীয়-দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু করে সমগ্র খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দ ব্যাপী তথা একাদশ- দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এবং মধ্যযুগীয় বাংলাতেও পোড়ামাটি ছিল অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। এমনকি আজও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মৃৎপাত্র, খেলনা, স্থানীয় লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের মাটির মূর্তি, পোড়ামাটির অলংকার কিংবা ভাস্কর্য অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রাসঙ্গিক। এই দীর্ঘপর্যায় ব্যাপী সমৃদ্ধ শিল্পের উপস্থিতি ও প্রবানহমানতার দরুন পোড়ামাটি শিল্প সংক্রান্ত চর্চার পরিসরে 'বাংলা' অন্যতম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্র। এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী সাধারণ মানুষ তার শৈল্পিক আকাঙ্খা-নান্দনিকতা, ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, বিশ্বাস, চিন্তন তথা সার্বিক মননশীলতার প্রায় সবকিছুই পোড়ামাটির কাজে ধরে রেখেছে যা গবেষকদের নিকট চর্চার নতুন দিককে উন্মোচন করে। আর শুধু বাংলা নয় ভারত তথা বিশ্ব সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটেও ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে মৃৎশিল্পের প্রকাশ স্পষ্টতই দৃশ্যমান। যেহেতু বর্তমান পরিসরের আলোচনা মূলত বাংলা কেন্দ্রিক সেক্ষেত্রে বলা যায় বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতির সামগ্রিক বিশ্লেষণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একক তার মৃৎশিল্প। তবে বাংলায় মৃৎশিল্প ধারার বিকাশ একমাত্রিক নয় বরং বিবিধ বৈচিত্র্য, সমন্বয়, বিবর্তনের সংমিশ্রণ বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পঐতিহ্য। যদিও বর্তমান গবেষণা পত্রের আলোচ্য ক্ষেত্র হিসেবে মোটামুটিভাবে আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ এবং উক্ত কালপর্বে বিকশিত বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পধারাকে প্রধান বিচার্য রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু উক্ত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই সার্বিকভাবে

[63] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ, আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল*, কলকাতা, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম, ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৬-১৩

বাংলায় তার প্রাথমিক ইতিহাস বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কোন প্রেক্ষাপটে, কিভাবে বাংলায় আদি মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্পের রূপনির্মাণ হয়েছিল তা অনুধাবনের জন্য প্রাচীন বাংলায় মৃৎশিল্পের সূচনাকাল, আলোচ্য সময়কালের পূর্বে তার চরিত্র, সামাজিক অবস্থান, ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি ছিল ইত্যাদি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তা নাহলে সম্ভবত বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের চর্চা আলোচ্য পরিসরে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ফলত বর্তমান অধ্যায়টিতে সার্বিক রূপে সমগ্র প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পের বিকাশ তথা ঐতিহাসিক প্রসার ও বিবর্তনের ধারা তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

১. প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্প: ব্যাপ্তি, সমস্যা ও সম্পৃক্ত নির্মাণ প্রযুক্তি

১.১ প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পের ব্যাপ্তি:

যেকোনো শিল্পের আলোচনায় তার প্রাপ্তিস্থল বা অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের ভৌগোলিক প্রসার সম্পর্কে বলা যায় এক বৃহৎ পরিসরের সাথে যুক্ত ছিল এই শিল্পধারার প্রসার। প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্প বোঝাতে মূলত বিভিন্ন কালপর্বে পশ্চিমবঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশ এবং সন্নিহিত কিছু অঞ্চলের প্রাপ্ত বিপুল মৃৎঅবয়বের আলোচনা ক্ষেত্র নির্বিশেষে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বর্তমান গবেষণা পত্রে যার মধ্যে অধুনা বিহার অন্যতম। সেকারণে যদিও বর্তমান আলোচনা প্রধানত বাংলায় প্রাপ্ত মৃৎশিল্প নির্ভর কিন্তু তবু বিহার অঞ্চলের টেরাকোটা সংক্রান্ত আলোচনা এই পরিসরে আলোচনা সূত্রে ক্ষেত্র নির্বিশেষে উপস্থাপিত হবে। কেননা আমরা জানি প্রাচীন কালে বাংলা বলতে কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ভূখণ্ড ছিলনা, বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বা অধুনা বাংলাদেশ সহ এক বৃহত্তর অংশ তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলত এই বৃহৎ ভূখণ্ডের অন্তর্গত মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ বিবিধ আলোচনা এই গবেষণা পত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক পরিসর জুড়ে আবিষ্কৃত অসংখ্য প্রত্নস্থল ও নানান চরিত্রের পোড়ামাটি অবয়ব সার্বিক শিল্প ইতিহাসের চর্চায় সমগ্র প্রাচীন বাংলাকে বিশেষ স্থান প্রদান করেছে। এই সামগ্রিক শিল্পঐতিহ্যের বিভিন্ন দিকের সংক্ষিপ্ত আভাষ দেওয়ারই প্রয়াস বর্তমান অধ্যায়। ফলত একদিকে যেমন আদি ঐতিহাসিক পর্বে নিম্ন ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার বিস্তীর্ণ অংশে, তেমনই অন্যদিকে গুপ্ত বা তৎপরবর্তী সময়ে প্রধানত উত্তরবঙ্গ (উত্তর পশ্চিম বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ), দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশ অংশে পোড়ামাটি শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ মৃৎশিল্প প্রাপ্তি এবং সমরূপ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

পরিসরের উপস্থিতির সূত্রে বিশেষ রূপে আদি মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্পের আলোচনায় দক্ষিণ বিহার এবং ত্রিপুরার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রকেও আদি মধ্যযুগীয় বাংলার টেরাকোটার ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কেননা উক্ত অন্তর্ভুক্তি ছাড়া বর্তমান আলোচনা হয়তো অসম্পূর্ণই থেকে যায়। নীচে দুটি সারণীর মাধ্যমে বৃহত্তর বাংলার নিরিখে পোড়ামাটি শিল্প সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলগুলিকে তুলে ধরা হল-

সারণী ১: আদি ঐতিহাসিক বাংলার (নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা) মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র সমূহঃ

জেলার নাম	প্রত্নস্থল
দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ)	বাণগড়
বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)	মঙ্গলকোট,পান্ডু রাজার ঢিবি,বানেশ্বরডাঙা,
বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ)	কোটাসূর,নানুর, বাহিরি
মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ)	ফারাক্কা, রাজবাড়িডাঙা
মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ)	তমলুক, বাহিরি, পান্না, তিলদা, নাটশাল, মহিষাদল
বাঁকুড়া (পশ্চিমবঙ্গ)	দিহার, পোখন্না
উত্তর ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)	চন্দ্রকেতুগড়
দক্ষিণ ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)	তিলপি,ধোসা,দেউলপোতা,গোসাবা,হরিনারায়নপুর

সারণী ২: আদি মধ্যযুগীয় বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ত্রিপুরা, অধুনা বাংলাদেশ) মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র সমূহ-

বর্তমান অবস্থান	**মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নকেন্দ্র**
মালদা (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)	জগজ্জীবনপুর
বগুড়া (রাজশাহী, বাংলাদেশ)	মহাস্থানগড় ও নিকটবর্তী কেন্দ্র যথা, বিহার ধাপ, ভাসু বিহার, পলাশবাড়ী(বামনপাড়া), খোদার পাথর ভিটা, মানকালীর কুণ্ড, পরশুরামের প্রাসাদ, গোকুল মেধ, বৈরাগীর ভিটা
নওগাঁ (রাজশাহী,বাংলাদেশ)	পাহাড়পুর (সোমপুর মহাবিহার), জগদ্দল বিহার
কুমিল্লা (বাংলাদেশ)	ময়নামতী- লালমাই অঞ্চলের অন্তর্গত একাধিক প্রত্নকেন্দ্র যথা- রূপবান মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, কুটিলা মুড়া, রানী ময়নামতীর প্রাসাদ
দক্ষিণ ত্রিপুরা	শ্যামসুন্দর টিলা (জোলাইবাড়ি-পিলাক)
ভাগলপুর (বিহার, ভারত)	বিক্রমশীলা মহাবিহার (অ্যান্টিচক)

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে প্রাচীন বাংলায় পোড়ামাটি শিল্পের সুদীর্ঘ প্রসার সম্পর্কে আভাষ পাওয়া যায়। এই শিল্পের সমগ্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিকে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হলেও গবেষণার সমস্ত বিষয়টিকে যেহেতু একটি গবেষণাপত্রে যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়; ফলত বর্তমান গবেষণা পত্রটির মূল নির্বাচিত সময়কালের (আনুমানিক ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতক) নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ পোড়ামাটি শিল্পসমৃদ্ধ প্রত্নস্থল যথা- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুর এবং অধুনা বাংলাদেশের মহাস্থান, পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতির ভৌগোলিক, প্রত্নতাত্ত্বিক তথা সার্বিক পরিচিতি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে

বিস্তীর্ণ আলোকপাত করা হয়েছে এবং গবেষণা পত্রের অন্যান্য অধ্যায়গুলিও মুখ্যত উক্ত পুরাকেন্দ্রগুলি থেকে প্রাপ্ত মৃৎ উপাদানকে নির্ভর করেই রূপদান করা হয়েছে।

১.২ সময়কাল নির্ধারণ জনিত জটিলতা:

সামগ্রিক রূপে প্রাচীন বাংলার টেরাকোটা শিল্পচর্চা করতে হলে একটি অবশ্য উল্লেখ্য দিক হল এর সময়কাল সম্পর্কিত জটিলতা। মোটামুটিভাবে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে বাংলায় প্রাপ্ত অধিকাংশ পোড়ামাটির অবয়বগুলি বিভিন্ন প্রত্নস্থলের অনুসন্ধান পর্বে বিচ্ছিন্নভাবে আবিষ্কৃত, নির্দিষ্ট উৎখনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নয়। ফলে এর নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারন বিশেষ ভাবেই জটিলতাসম্পন্ন ও কষ্টসাধ্য। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে দেখা যায় আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে আজও বর্ষাকালে ইতস্তত পুরাসামগ্রীর সন্ধান পাওয়া যায় এবং স্থানীয় জনবসতির অধিকাংশের ঘরে সংরক্ষিত টেরাকোটা সহ অন্যান্য প্রত্নসামগ্রী তার প্রমাণ। কিন্তু সেগুলির স্তরীয় কাল নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব কাজ। ফলত সামগ্রিকভাবে এই ধরণের শিল্প অবয়বের সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার শৈলীগত বৈশিষ্ট্যাবলীকে বিবেচ্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে নানান দ্বিধা রয়েছে, বহুক্ষেত্রে এরম উপাদান পাওয়া যায় যেখানে সম্পূর্ণ ২টি ভিন্ন পর্যায়ের ভিন্ন শৈলীর অবয়ব একই অধিবসতির স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয় কিংবা কখনো আবার অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের শিল্প উপাদান তার পূর্ববর্তী কোন স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়। সেক্ষেত্রে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সরসী কুমার সরস্বতী[64] মন্তব্য করেন এর পেছনে নানান কারন থাকতে পারে। অনেক সময় মানুষ তার বিশ্বাসের খাতিরে কিছু জিনিস বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণ করে থাকে, যার প্রমাণ আজও হাতে গড়া বিবিধ টেরাকোটা মূর্তির প্রচলন। এছাড়া তিনি বলেন টেরাকোটা উপকরণের ন্যায় ছোট উপাদান সামগ্রীর প্রাকৃতিক নিয়মেই হোক বা মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রভাবে ভূ-অভ্যন্তরের এক স্তর থেকে অন্যত্র গমন হয়তো একদম অসম্ভব ঘটনা নয়। যাইহোক, সাধারণত এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত অজস্র টেরাকোটার উপাদানগুলির সময়সীমা নির্ধারণে গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যান্য অঞ্চল মূলত অহিচ্ছত্র, কৌশাম্বী, চম্পা, মথুরা, পাটলিপুত্র প্রভৃতি প্রত্নস্থলগুলি থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটি এবং পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রস্তর শিল্পের সহিত

---

[64] সরসী কুমার সরস্বতী , *আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল,* কলকাতা,সম্বোধী পাবলিকেশন, ১৯৬২ পৃষ্ঠা- ৯১-৯২

তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এগুলির সময়সীমা নির্ধারণের প্রয়াস করা হয়ে থাকে। তবে এখানেও একই ধরণের জটিলতা জড়িত, অধিকাংশ উপকরণের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট স্তরীয় পরিচিতি বা কালানুক্রমিক পরিচিতি নেই যার ফলে এই তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তি হয়তো আদতেই দুর্বল। যেমন, আলোচ্য পরিসরে সুপরিচিত উড়ন্ত ঘাঘরা ও মেডালিয়ন যুক্ত নারীমূর্তিকে (চিত্র-১,২) সাধারণত মৌর্য পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব বলে মনে করা হয়ে থাকে, বাংলার পাশাপাশি যা ব্যাপক মাত্রায় পাওয়া যায় মূলত বিহার অঞ্চলে কিন্তু সেক্ষেত্রেও তার পর্যায়ক্রমিক অবস্থান নিশ্চিত নয়। কুমরাহার অঞ্চলে তা পাওয়া যায় ১৫০ খ্রীঃপূঃ থেকে ১০০ খ্রীঃ নাগাদ সময়ে, কৌশাম্বীতে ৪০০ খ্রীঃপূঃ, হস্তিনাপুরে তার সময়সীমা ৬ষ্ঠ খ্রীঃপূঃ থেকে ৩য় খ্রীঃপূঃ, ফলে বাংলায় প্রাপ্ত ঐজাতীয় অবয়বের নির্ধারিত সময়সীমাও যে কোনোভাবেই চূড়ান্ত হতে পারেনা তা বলা বাহুল্য।[65]

১

২

[65] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ, আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম,* পৃষ্ঠা- ১৩-১৪

চিত্র-১ মৌর্য শৈলীর ঘাঘরা ও মেডালিয়ন পরিহিতা নারীমূর্তি, বুলন্দীবাগ, পাটনা সৌজন্যে- বিহার সংগ্রহালয়, ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, জানুয়ারি ২০২০

চিত্র-২ মৌর্য শৈলীর ঘাঘরা ও মেডালিয়ন পরিহিতা নারীমূর্তি, তমলুক, সৌজন্যে- এস এস বিশ্বাস, *টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল,* আগম কলা প্রকাশন, (দিল্লী, ১৯৮১), Plate-v(a)

এছাড়া অপর যে ধারা প্রাচীন প্রস্তর শিল্পের সহিত তুলনামূলক আলোচনা সেক্ষেত্রে মূলত সাঁচি, ভারহুত, মথুরা, বোধগয়া এবং পশ্চিম ভারতীয় নাসিক, জুনাড় এর সাথে তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে পোড়ামাটি শিল্প উপকরণাদির সময়সীমা নির্ধারণের প্রয়াস করা হয়ে থাকে। তবে এজাতীয় আলোচনার ক্ষেত্রেও ভ্রান্তি বা জটিলতার উপস্থিতি খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা একই অঞ্চলের খুব নিকটবর্তী প্রত্নস্থলেও যে একযোগে, একইভাবে কোন শিল্পের বিকাশ ঘটবে তেমনটা নয়। আবার ২টি সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্প মাধ্যম, ভিন্ন প্রযুক্তি-পদ্ধতি, উপকরণ, ভিন্ন শিল্পী, ভিন্ন সমস্যা ও তার ভিন্ন সমাধানের পথ সম্পূর্ণটা আলাদা। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রত্নস্থলের অবস্থান, সেক্ষেত্রে তারা পৃথক ভৌগোলিক, আর্থসামাজিক,ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বহনকারী তথা নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।[66] উক্ত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ২টি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের শিল্পধারা শৈলীগত বা বিষয়গত দিক থেকে একইভাবে বিকশিত হবে এবং এর উপর ভিত্তি করে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা নির্দিষ্ট ধারার শিল্পের পর্যায়ক্রম নির্ধারণের প্রয়াসের বিষয়টি নিঃসন্দেহেই মনে হাজারও প্রশ্নের উদ্রেক করে। কেননা কেবলমাত্র শৈলী বা বিষয়গত বৈশিষ্ট্য কোন উপাদানের কালানুক্রমিক অবস্থান নির্ধারণে যথেষ্ট নয়, সেটি আলোচনার একটি মাধ্যম হতে পারে কিন্তু একমাত্র প্রধান ভিত্তি হয়তো নয়।

ফলত প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ টেরাকোটা শিল্পসামগ্রীর নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণের দিকটি আজও অধরাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টেরাকোটা শিল্পের সময়কাল নির্ধারনে প্রযুক্ত শৈলীর ওপর নির্ভরতার ক্ষেত্রটি সম্পর্কে কিছুটা পুনর্বিবেচনার কথা উল্লেখ করেছেন সীমা রায় চৌধুরী,[67] পরিবর্তে

[66] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ,* পৃষ্ঠা- ১৪

[67] সীমা রায় চৌধুরী, 'স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজি : প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল', গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত, *আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া ,*

বিজ্ঞানসম্মত উৎখনন বা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের কথা বলেন এবং যদিও বা শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলোচনা করতে হয় সেক্ষেত্রে সমজাতীয় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে অবস্থিত অঞ্চলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় অধিক আলোকপাত করা উচিৎ কেননা ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে ভিন্ন আর্থ-সামাজিক,রাজনৈতিক উপাদানের ফলে শিল্প বিকাশের প্রেক্ষিতও সম্পূর্ণ ভিন্ন, ফলে সেক্ষেত্রে এইরূপ আলোচনা সংশয়াত্মক ফলপ্রদান করবে এটাই আশানুরূপ। তবে প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়পর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ দ্বাদশ শতকীয় বঙ্গীয় টেরাকোটা উপাদান রূপে যাদের উপস্থিতি পাওয়া যায় তাদের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। এই পর্বে সাধারণত প্রতিটি প্রত্নস্থলেই নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক নির্মাণ স্থাপত্যের যথা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের অলংকরণের অঙ্গ রূপে পোড়ামাটি ফলকগুলির সন্ধান পাওয়া যায় এবং বহু ক্ষেত্রে তা উৎখনন কালে In Situ অবস্থানেই পাওয়া যায় ফলস্বরূপ, এই পর্বে তাদের সময়কাল নির্ধারণ প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী পর্যায় অপেক্ষা বহুলাংশে ভিন্ন এবং প্রত্নফলকের সংশ্লিষ্ট সময়কালের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর। যদিও যেহেতু মৃৎ ফলকে কোনোরূপ সময়কাল নির্ধারণকারী প্রত্যক্ষ সূচক উপস্থিত থাকেনা ফলে যেকোনো পর্বেই পারিপার্শ্বিক সমকালীন অন্যান্য প্রত্নউপাদানের প্রাপ্তি ও পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর আদি মধ্যযুগীয় পর্বে মৃৎপাত্র, মুদ্রা বা অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিবিধ তাম্রশাসন বা অভিলেখগুলি, যা এই পর্বে মৃৎশিল্পের সময়কালে নির্ধারণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনেও সহায়ক হয়। এই শিল্পধারার সমগ্র বিকাশ চিত্রকেই পর্যায়ক্রমে বর্তমান অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে।

১.৩ সম্পৃক্ত নির্মাণ প্রযুক্তি:

প্রাচীন বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্প বিকাশের রূপরেখা বিশ্লেষণের পূর্বে বলা চলে, এই বিপুল শিল্পধারার সাথে সম্পর্কিত অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষিত হল এই শিল্পের নির্মাণ পদ্ধতি বা প্রযুক্তি। বাংলা তথা ভারত ইতিহাসে দীর্ঘকালব্যাপী টেরাকোটা শিল্পোৎপাদনের সাথে জড়িত একাধিক প্রযুক্তি বিকাশের সাক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়। এই শিল্পের ব্যবহার বা উপস্থাপিত বিষয়ের পাশাপাশি যুগের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এর নির্মাণ প্রযুক্তি তথা শৈলীগত উপকরণও যা একাধারে শিল্পইতিহাসের ক্রমান্বয়িক বিকাশ,

---

নিউ পার্সপেক্টিভস, সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা – ২০০২, পৃষ্ঠা- ১৩-২৩

বিবর্তন ও ধারাবাহিকতার দিকটিকে স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত করে।[68] বিস্তারিতভাবে বলা চলে, প্রায় ঐতিহাসিক পর্ব থেকে শুরু করে আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় যে বিস্তীর্ণ পোড়ামাটি শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে একাধিক ধাঁচের, ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্মিত মৃৎ অবয়বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রথমেই বলা চলে, শিল্প বিকাশের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে পোড়ামাটি অবয়বগুলি ছিল প্রধানত হস্ত নির্মিত; যা ছিল কোনোরকম কারুকার্যবিহীন, অতি সাধারণ ও কিছুটা স্থূলাকৃতি ধাঁচের। সাধারণত প্রায় ঐতিহাসিক পর্বীয় পোড়ামাটি উপাদান রূপে এই শ্রেণীর অবয়বগুলিকে নির্ধারিত করা হয়ে থাকে। তবে এই প্রকার অবয়বের বিশেষত্বই হল দীর্ঘকালব্যাপী অপরিবর্তিত রূপে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে তারা সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব বহন করে এসেছে। পরবর্তীকালের বিপুল কারুকার্যময় অবয়ব তথা উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন অবয়বের পাশাপাশি সমভাবে এই হস্ত নির্মিত অবয়বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় অত্যন্ত স্পষ্টরূপে। সাধারণত আদিম মাতৃকা মূর্তি, নানান পশুমূর্তি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[69]

হস্ত নির্মিত উপাদানের পরবর্তী ধাপে প্রযুক্তিগত বিবর্তনের সাক্ষী রূপে পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসে পাওয়া যায় ছাঁচের ব্যবহার। কিছু অবয়ব দেখা যায় হস্ত নির্মিত দেহ এবং ছাঁচ নির্মিত মস্তক সম্পন্ন, যারা সম্পূর্ণ ছাঁচ (চিত্র-৩) নির্মিত অবয়বের পূর্বসূরী ছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। সুতরাং পোড়ামাটি শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল সম্পূর্ণ ছাঁচ নির্মিত অবয়বের প্রাপ্তি। মনে করা হয় এই ছাঁচ নির্মিত অবয়বের বিপুল প্রাপ্তি নিশ্চিত রূপে এই শিল্পের গণ-উৎপাদনকে নির্দেশ করে যা বিবর্তিত সামাজিক পেক্ষাপটকেও প্রকাশিত করে।[70] দেবাঙ্গনা দেশাই[71] এই পর্যায়ের বিকাশকে সামাজিক চাহিদা, বাজারীকরণ ও নগরায়নের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রাথমিক পর্বে টেরাকোটা অবয়বগুলি অতীব সাধারন কেননা, এগুলি নগর সভ্যতার একদম প্রাথমিক পর্বের উপাদান এবং সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রভাব সীমিত। কিন্তু মৌর্য পরবর্তী বিশেষত শুঙ্গ

---

[68] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ*, পৃষ্ঠা- ১৫

[69] সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ*, আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম-২ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩৫৪

[70] সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', পৃষ্ঠা- ৩৫৪

[71] দেবাঙ্গনা দেশাই, 'ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কন্টেক্সট (সি. ৬০০ বিসিই – সি ই ৬০০)', *আর্ট অ্যান্ড আইকনঃ এসেস অন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট*, আরিয়ান বুকস ইন্টারন্যাশনাল , ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫০-৬০

সময়কালে টেরাকোটা অবয়বগুলিতে নাগরিক রুচির প্রভাব সুস্পষ্ট, যাকজমকপূর্ন অলংকার বা অপূর্ব দৈহিক ভঙ্গিমার উপস্থিতি তার নাগরিক চরিত্রের পরিচায়ক।

চিত্র-৩ পোড়ামাটি অবয়ব নির্মাণের ছাঁচ, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

টেরাকোটা অবয়বের নির্মাণ সংক্রান্ত অপর এক প্রক্রিয়া হল যুগ্ম ছাঁচের ব্যবহার, যেখানে কিছুটা গোলাকৃতি ধাঁচের ত্রিমাত্রিক অবয়বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আদি ঐতিহাসিক বাংলার প্রায় সমস্ত পোড়ামাটি সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলেই উপরিল্লিখিত সমস্ত ধাঁচের অবয়বের উপস্থিতি লক্ষণীয়। উপরিউক্ত প্রযুক্তি ছাড়াও কিছু বৃহদাকৃতি অবয়ব অবয়ব লক্ষ করা যায় যা চাকার ব্যবহারে নির্মিত, বাংলায় মোটামুটিভাবে চতুর্থ-ষষ্ঠ সময়কালীন রূপে এই অবয়বগুলিকে চিহ্নিত করা হয়।

এর পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের পোড়ামাটি শিল্পধারার উপস্থিতি যা বর্তমান গবেষণা পত্রে সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক। এসময় পোড়ামাটির ফলকগুলিকে প্রধাণত বৃহৎ আয়তাকার, বর্গাকার রূপে পাওয়া যায় যা সাধারণত নির্দিষ্ট ধর্মীয় নির্মাণ স্থাপত্যের অলংকরণের অঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হত।[72] আদি মধ্যযুগীয় (আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক) সমস্ত প্রত্নস্থলগুলিতেই এই প্রকার পোড়ামাটি শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি উপরিল্লিখিত সমস্ত আদি ঐতিহাসিক (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক) পর্বীয় পোড়ামাটি অবয়ব অপেক্ষা ছিল স্বতন্ত্র। এই পর্বের মৃৎ অবয়বের প্রধান শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যই হল এগুলি বেস-রিলিফ (Base-Relief) পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ। অর্থাৎ যেখানে ভাস্কর্য বা অবয়ব ভূতল থেকে উঁচু রেখে একটি সমতল পৃষ্ঠে নির্মাণ করা হয়।সাধারণ ভাস্কর্যের সাথে রিলিফের পার্থক্য হল, প্রথমটিতে নির্দিষ্ট অবয়বকে তার চতুর্দিক থেকে দেখা যায় কিন্তু রিলিফ ভাস্কর্যে অবয়ব কেবল সম্মুখভাগ থেকে দর্শনীয়। কখনো চাপ দিয়ে মাটির সমান্তরাল তক্তা জাতীয় প্রেক্ষাপট বানিয়ে ভাস্কর্যের নকশা অনুযায়ী মাটি কেটে ত্রিমাত্রিক অবয়ব বানানো হয়, কখনো বা পৃথক ভাবে অবয়ব বানিয়ে মাটির সমতল পৃষ্ঠে তাকে প্রতিস্থাপন করা হয়। আলোচ্য পর্বে বাংলায় প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বগুলি এই রিলিফ ধাঁচেই নির্মিত।[73] বাংলায় ইতিপূর্বে মৃৎশিল্প নির্মাণে কিন্তু এই পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়না, যা এই পর্বে মৃৎশিল্প নির্মাণ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত বিবর্তনের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। মোটামুটিভাবে সমগ্র প্রাচীন বাংলা তথা প্রায় ঐতিহাসিক পর্ব থেকে আনুমানিক টেরাকোটা শিল্প পর্যালোচনায় এই বিবিধ ধরণ বা প্রযুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যা বাংলার পোড়ামাটি শিল্পের চরিত্র অনুধাবনে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মৃৎ অবয়বের বাহ্যিক আকৃতি বা প্রাপ্ত ছাঁচের নিরিখে মৃৎশিল্পের নির্মাণ প্রযুক্তিগত এধরণের আলোচনা করা গেলেও তার নিশ্চিত প্রমাণ কিন্তু নেই কিংবা টেরাকোটা অবয়ব নির্মাণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তথা নির্মিত মাটির মূর্তি পোড়ানোর যথাযথ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্য জানা যায়না। কেননা এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের কোথাও পোড়ানোর ভাঁটি পাওয়া

---

[72] সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', পৃষ্ঠা- ৩৫৫

[73] শোহরব উদ্দীন সৌরভ, 'টেরাকোটা আর্ট ফ্রম আর্লি হিস্টোরিক টু প্রি মিডিএভাল পিরিয়ড', সুফি মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত *আর্কিওলজিক্যাল হেরিটেজ,* ঢাকা, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৪৩৬

যায়না।এই মূর্তি নির্মাণ এবং তা পোড়ানো একই ব্যক্তি করতেন কিনা তাও অন্যতম প্রশ্ন।[74] কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে রূপে আমরা এসকল পোড়ামাটি অবয়ব বা ফলকগুলি পেয়ে থাকি তা তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে, কিন্তু কি পদ্ধতিতে বা কোন কোন ধাপ অতিক্রম করে তা উক্ত রূপ গ্রহণ করেছে তা যথাযথ জানা নেই। আর তার জন্য এথনোআর্কিওলজিক্যাল পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন।[75] আদতে সার্বিক রূপে এই প্রযুক্তির গতানুগতিকতা বা ইতিহাস অনুসন্ধান কেবল মাত্র ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের দ্বারা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন হয় এথনোআর্কিওলজিক্যাল পদ্ধতির প্রয়োগ, যেখানে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট কারিগরি যথা স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা মৃৎপাত্র ইত্যাদির অতীত এবং বর্তমানের তথ্যের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা যেকোনো শিল্প বা সমাজ অন্তর্ভুক্ত কোনও প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়ে থাকে। যদিও এই পদ্ধতির গ্রহনযোগ্যতা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে কিন্তু তা স্বত্তেও বর্তমান পরিসরে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। এর মাধ্যমে প্রাচীন কালের উৎপাদন পদ্ধতি, আর্থসামাজিক পরিসর, শিল্পী বা নির্মাতাদের জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কাজের মধ্যে সায়ন ভট্টাচার্য এবং শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী বাঁকুড়ার দিহার অঞ্চলের বর্তমান মৃৎপাত্র নির্মাণ পদ্ধতির ওপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্ষেত্রসমীক্ষা দ্বারা উক্ত অঞ্চলের প্রাচীন শিল্প এবং শিল্পীদের নিয়ে গবেষণা করেছেন[76]। একই ভাবে অতি সাম্প্রতিক পর্বে জয়দীপ ঘোষাল তার একটি প্রবন্ধে বীরভূম জেলার সর্পলেহনা গ্রামের মৃৎপাত্র নির্মাণ পদ্ধতি এবং কুম্ভকারদের ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করে প্রাচীন পর্বে উক্ত অঞ্চলে মৃৎপাত্রের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস করেছেন।[77] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মৃৎপাত্র সম্পর্কিত এরূপ একাধিক আলোচনা থাকলেও বাংলার টেরাকোটা অবয়ব বা ভাস্কর্য জনিত এরূপ বিস্তৃত আলোচনা

---

[74] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ*, পৃষ্ঠা-১৭

[75] কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, 'টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি', গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত *আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, নিউ পার্সপেক্টিভস*, কলকাতা, সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০২

[76] শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী , সায়ন ভট্টাচার্য – 'এথনোগ্রাফি ফর আর্কিওলজিঃ অ্যামংষ্ট দ্য পটারস অফ বিষ্ণুপুর, ডিসট্রিক্ট বাঁকুড়া', নূপুর দাশগুপ্ত ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত) *মেথোডলজিস অফ ইন্টারপ্রেটিং দ্য এনসিয়েন্ট পাস্ট অফ সাউথ এশিয়াঃ স্টাডিস ইন মেটেরিয়াল কালচার*, দিল্লী, শারদা পাবলিশিং হাউস, ২০১৬

[77] জয়দীপ ঘোষাল, 'প্রাচীনকালের মৃৎপাত্রের নির্মাণশৈলী জানার প্রেক্ষাপটে বীরভূম জেলার সর্পলেহনা গ্রামের আধুনিক কুম্ভকারদের উপর একটি সমীক্ষা', *ইতিহাস অনুসন্ধান*, (অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) খন্ড- ৩৮, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০২৫ , পৃষ্ঠা- ১৮৬-২০০

সীমিত। তবে উল্লেখ করা চলে অন্বিতা দত্তের পিএইচডি গবেষণা পত্রের[78] কথা যেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ৭টি জেলার ১৭ টি গ্রামের মৃৎশিল্পের নির্মাণ প্রযুক্তি, শিল্পীদের ভূমিকা বা জীবনযাত্রার সমীক্ষা দ্বারা আদি ঐতিহাসিক বাংলার মৃৎশিল্পের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস করেছেন। তার আলোচনায় টেরাকোটার নির্মাণ প্রযুক্তি তিনি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন, উক্ত গবেষণার নিরিখে প্রাপ্ত নির্যাস নীচে বৃত্তের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল। (চিত্র- ৪) মূলত প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে দেখা যায় হাতি, ঘোড়ার ন্যায় পশু, মাতৃদেবী, সন্তান সহযোগে নারী, নাগদেবী বা মনসার ন্যায় অবয়ব, এছাড়াও নানা ধাঁচের মৃৎপাত্র ইত্যাদি যেগুলি সাধারণত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, খেলনা বা অলংকরণের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এগুলি সুদূর হরপ্পা সংস্কৃতি বা তৎপরবর্তী আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটার ন্যায় সম্ভাব্য ব্যবহার, বিষয়বস্তু এবং কাঠামোগত দিক থেকে প্রায় অনুরূপ। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত রূপে প্রাচীন ইতিহাস নির্মাণ সর্বদা যে সঠিক হয় তা নয় তবে একটা ধারণা গঠন করা সম্ভব। ফলত সম্ভাব্য বিবর্তন গ্রহণ করেই অনুমান করা যেতে পারে খানিক অনুরূপ পদ্ধতিতেই প্রাচীন বাংলার টেরাকোটা অবয়ব নির্মিত হত। তবে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার টেরাকোটা পদ্ধতি কেন্দ্রিক কোনও আলোচনা এখনো সেভাবে লক্ষণীয় নয়। আরও বিবিধ অঞ্চল ভিত্তিক মৃৎশিল্পের এথনোআর্কিওলজিক্যাল গবেষনা প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে যে নতুন পথ উন্মোচন করবে অনুমান করাই চলে।

[78] অন্বিতা দত্ত, *দ্য কালচারাল সিগনিফিকেন্স অফ আর্লি হিস্টোরিক টেরাকোটা আর্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল: অ্যান এথনোআর্কিওলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ*, ডেকান কলেজ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট এ প্রদত্ত পিএইচ.ডি গবেষণা সন্দর্ভ, পুনে, মে ২০১৩ , পৃষ্ঠা- ১৩৬-১৫৫

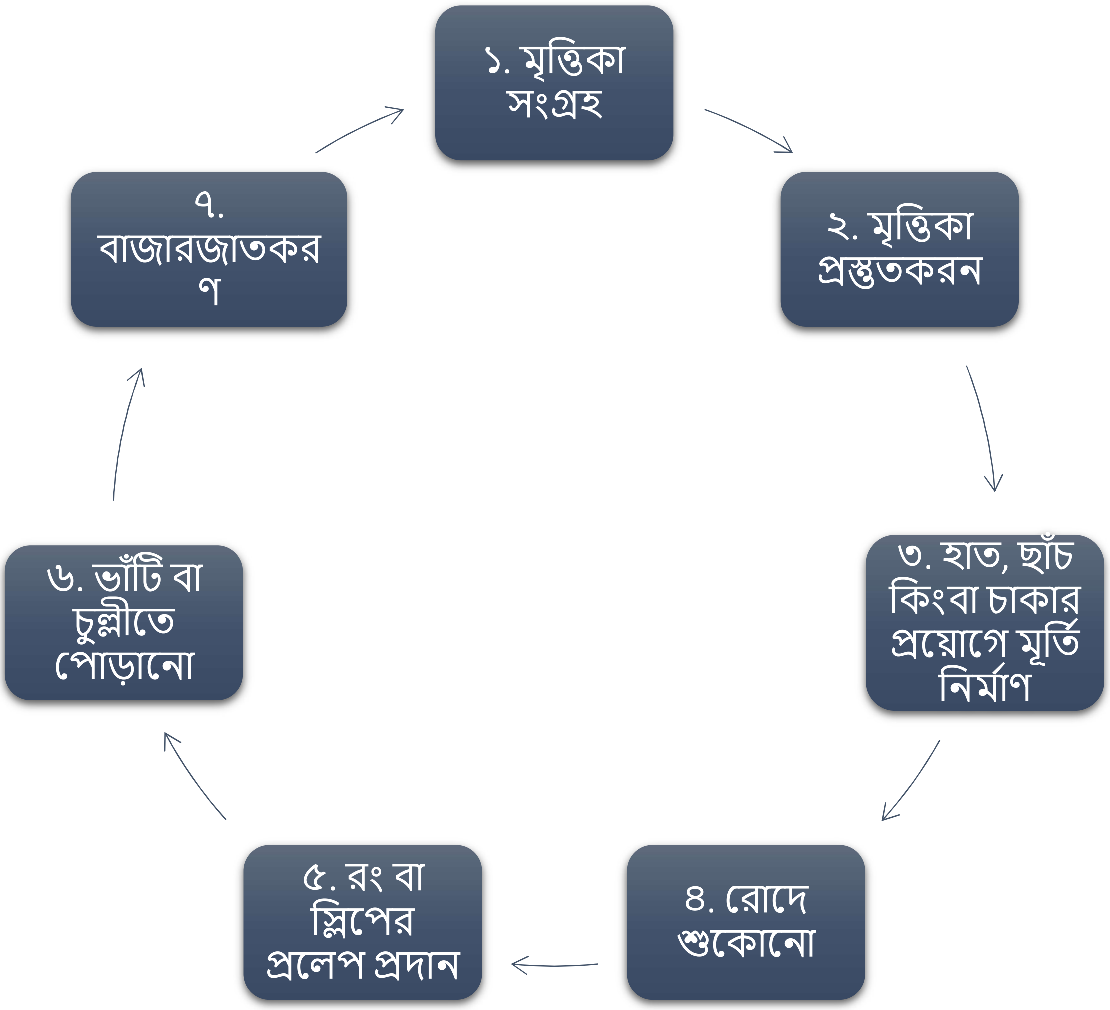

চিত্র -৪ অধুনা কালপর্বে বাংলার মৃৎ অবয়ব নির্মাণ প্রক্রিয়ার চক্রাকার প্রদর্শন

২. প্রাচীন বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্প ও কালানুক্রমিক উপস্থাপন

সুদূর প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকেই বাংলা তার প্রত্নতাত্ত্বিক তথা সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য বহন করছে। ইতিপূর্বেও উল্লিখিত পোড়ামাটি শিল্পের ক্ষেত্রেও বাংলায় দীর্ঘকাল ব্যাপী এই শিল্প ঐতিহ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা বাংলার সার্বিক প্রত্নচর্চার ইতিহাসে এক অমূল্য অধ্যায়। এই দীর্ঘ সময়পর্বে বিকশিত বাংলার টেরাকোটা শিল্পকে কালানুক্রমিক বিভাজনের প্রেক্ষিতে নীচে যথাযথভাবে তুলে ধরার প্রয়াস করা হল।

২.১. প্রায় ঐতিহাসিক কালপর্যায়ঃ

সাধারণত বাংলায় প্রথম টেরাকোটা উৎপাদনের সাক্ষী রূপে প্রায়-ঐতিহাসিক পর্যায়ের কিছু প্রত্নস্থলকে চিহ্নিত করা হয়, যথা- পাণ্ডু রাজার ঢিবি, বানেশ্বরডাঙা এবং মহিষাদল। এই পর্যায়ের টেরাকোটা অবয়ব হিসেবে যেগুলি পাওয়া যায় তা মূলত হস্ত নির্মিত কারুকার্যবিহীন অতি সাধারণ অবয়ব, যাদের অধিকাংশ প্রজনন স্বত্তা বা উর্বরতা জনিত ধারণার সাথে সম্পর্কিত নারী অবয়ব, কিছু পুরুষ অবয়ব এছাড়া হাতি, ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি কিছু পশু অবয়ব ছিল বলে অনুমিত। তবে নির্দিষ্ট কিছু অবয়ব যেমন- পাণ্ডু রাজার ঢিবির পুরুষ স্কন্ধ বা মহিষাদলের লিঙ্গ অবয়ব ছাড়া বাকি উপাদান মূলত আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত এবং উক্ত প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক স্তরবিন্যাসের প্রেক্ষিতে উপাদানগুলির সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।[79]

২.২ আনুমানিক তৃতীয়-দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকঃ

সমগ্র প্রাচীন বঙ্গীয় টেরাকোটার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় আনুমানিক তৃতীয়/দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে তৃতীয়/চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দ, কেননা সার্বিকভাবে বাংলায় এই সময়কাল ছিল মূল সৃজনশীল পর্ব। তাই আদি ঐতিহাসিক পর্বের বাংলার যেকোনো পুরাতাত্ত্বিক আলোচনাকে মোটামুটি উপরিউক্ত সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়।[80] সাধারণত মৌর্যপর্ব (৩২৪ খ্রীঃপূঃ- ১৮৭খ্রীঃপূঃ) থেকেই

[79] সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', পৃষ্ঠা- ৩৫৬

[80] গৌতম সেনগুপ্ত, 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত আদি ঐতিহাসিক যুগের পোড়ামাটির শিল্পঃ অনুসন্ধানের রূপরেখা', আগ্নিক ভট্টাচার্য সম্পাদিত *ইতিবৃত্ত*, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত, খণ্ড- ২, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩

পোড়ামাটি শিল্পের ধারাবাহিক ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল বলে মনে করা হয়, তবে সংখ্যাগত দিক থেকে পরবর্তী পর্যায়ের তুলনায় তা অপেক্ষাকৃত কম। বাংলাদেশের মহাস্থানে মৌর্যলিপির আবিষ্কার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এন বি পি শৈলীর মৃৎপাত্র বা পাঞ্চ মার্কড মুদ্রার প্রাপ্তি উত্তর ভারত তথা মৌর্য শাসনের সহিত বাংলার সংযোগের ইঙ্গিত দেয়, যার প্রভাব পোড়ামাটি শিল্প ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত বলে মনে করা হয়। বাংলায় পোড়ামাটি শিল্পের অন্যতম উর্বর অধ্যায় ছিল শুঙ্গপর্ব (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)। যদিও বাংলায় সরাসরি শুঙ্গ বা কুষান পর্বের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কোনোরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ আজও অনুপস্থিত কিন্তু বাংলায় শুঙ্গ শৈলীর একাধিক প্রত্নদ্রব্য বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উক্ত রাজবংশের আদর্শগত ধারার উপস্থিতির দিকটিকে তুলে ধরে। নানাবিধ বিচিত্র বিষয়াদি, নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা এই শিল্পে উপস্থাপনার অংশ হয়ে ওঠে, শিল্পীরা ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি সামাজিক বিষয়াবলীকেও তাদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিতকরণের প্রয়াস গ্রহণ করে। পরবর্তী কুষান যুগও পোড়ামাটি শিল্পধারার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বলে অনুমান করা হয়। এই সময় মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে, পোড়ামাটির ফলকের পাশাপাশি অধিক আয়তন বা ঘনত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়ে স্বতন্ত্র অবয়ব নির্মাণের প্রবনতা পরিলিক্ষিত হয়। টেরাকোটা শিল্পের ইতিহাসে শুঙ্গ –কুষান ধারার অপর উল্লেখ্য দিক হল এই সময়ে পোড়ামাটি মূর্তি নির্মাণ শৈলী দ্বিমাত্রিক রীতি থেকে ক্রমশ ত্রিমাত্রিক রীতির দিকে যাত্রা করে।[81] এছাড়াও এই সময় থেকেই ভারতীয় শিল্পধারায় বিদেশী ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটে, গ্রেকো-রোমান, ইরানীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট গান্ধার শৈলীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় ভারতীয় শিল্পে। ক্ষেত্র বিশেষে ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্পেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যেমন এই সময়ে মৃৎ ভাস্কর্যে বৃহৎ প্রতিকৃতি নির্মাণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়[82] যা সম্ভবত উক্ত গ্রেকো-রোমান বা গান্ধার ভাস্কর্য রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। সুতরাং সার্বিকভাবে আদি ঐতিহাসিক (আনুমানিক তৃতীয়/দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে তৃতীয়/চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দ) পোড়ামাটি শিল্পের প্রেক্ষিতে বলা যায় মৃৎ অবয়বের উৎপাদন ও প্রসার, উপস্থাপিত বিষয়বস্তু,

---

[81] অশোক কুমার ভট্টাচার্য, 'টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল', শুঙ্গ কুষান পিরিয়ড - প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, *ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড* , মুম্বাই, মার্গ , ২০০২ পৃষ্ঠা –৬১

[82] দেবাঙ্গনা দেশাই, 'সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস' (সিরকা ৬০০ বি.সি – এ.ডি ৬০০), দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) হিস্ট্রি অ্যান্ড সোসাইটিঃ এসেস ইন অনার অফ প্রফেসর নীহার রঞ্জন রায়, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোং, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ১৪৩-১৬৫

ব্যবহৃত প্রযুক্তি সকল দিক থেকে এই পর্বে পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে এক উদ্দীপনা ও অভিনবত্বের স্ফুরণ হয়েছিল। উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন নগরকেন্দ্র যথা পাটলিপুত্র, অ্যান্টিচক, কুমরাহার, কৌশাম্বী, বৈশালী, চম্পা, অহিচ্ছত্র, মথুরা,ভিটা[83] প্রভৃতি সহ বিহার, উত্তরপ্রদেশের একাধিক কেন্দ্রে এই পর্বে সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পঐতিহ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যা সার্বিকভাবে আদি ঐতিহাসিক পর্বীয় বাংলার (দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে তৃতীয়/চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দ) পোড়ামাটি শিল্পইতিহাসকে এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে সংযুক্ত করে। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটি অবয়ব ও তার প্রতিরূপগুলিকে পাশাপাশি স্থাপন করে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কালানুক্রমিক ধারায় সেগুলি মোটামুটি সময়ের ব্যবধানে বহুলাংশে সমগোত্রীয় শিল্পস্বত্তার পরিচয়বাহী। শুধু উপস্থাপিত বিষয়াদি বা প্রতীকী নয় প্রযুক্তিগত আদান প্রদানও এই পর্যায়ের শিল্প ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে অনুমান করা চলে। আর সেক্ষেত্রে বলা চলে উভয় অঞ্চলের সমরূপ উর্বর ও সমৃদ্ধ ভৌগোলিক পরিসর, নাগরিক প্রেক্ষাপটের উপস্থিতি এবং সর্বোপরি বাংলার সাথে উক্ত অঞ্চল সমূহের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সংযোগ ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান আলোচ্য পর্বে সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমির পোড়ামাটি শিল্পঐতিহ্যকে দক্ষতার সাথে প্রতিস্থাপন করে এবং বঙ্গীয় শিল্পধারাকে এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে সংযুক্ত করে বলা বাহুল্য।

আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে তৃতীয়/চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে বিকশিত বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের বিশেষত্বই হল বিষয়বস্তুর ব্যপকতা। এক্ষেত্রে প্রথমেই যে শ্রেণির অবয়বের কথা বলতে হয় তা হল প্রাথমিক পর্যায়ের মূলত কিছু পশু ও মানবীয় মূর্তি; যার মধ্যে অধিকাংশই নারী অবয়ব। ইতিপূর্বেই প্রায় ঐতিহাসিক পর্বের সাক্ষ্যরূপে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সমগ্র আদি ঐতিহাসিক পর্বেও কিন্তু এদের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল। নারী অবয়বগুলির মূল বৈশিষ্ট্য স্বরূপ সাধারণত উন্মুক্ত বক্ষ, প্রসারিত কটিদেশ ও নিতম্ব সহ অবয়ব, মূলত হাতে নির্মিত ও চিমটি দিয়ে চোখ,নাক প্রভৃতি তৈরি করা হয়ে থাকে এবং শিল্প ঐতিহাসিক স্টেলা ক্র্যামরিশ[84] এর বর্ণনা অনুসারে যা মূলত ‘চিরন্তন’ (‘Timeless’) শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ মূলত হাতে তৈরি এবং অপরিবর্তিত রূপে দীর্ঘকাল

---

[83] পি এল গুপ্তা, *গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট*, পৃথিবী প্রকাশনী, বারাণসী-৫(ইন্ডিয়া), ১৯৭২ পৃষ্ঠা- ৯৯-১১৪

[84] স্টেলা ক্র্যামরিশ -‘ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস’, বারবারা স্টোলার মিলার সম্পাদিত, *এক্সপ্লোরিং ইন্ডিয়াস সেক্রেড আর্ট-সিলেক্টেড রাইটিংস অফ স্টেলা ক্র্যামরিশ*, নিউ দিল্লী ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস অ্যান্ড মোতিলাল বানারসী দাস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৬৯-৭১

ধরে বিদ্যমান। অন্যদিকে যেগুলি সময়ের সাথে পরিস্থিতির সাথে নতুন ধাঁচে, নতুন নতুন পদ্ধতি ও বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে নানান প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারন করেছে তাদের তিনি উল্লেখ করেছেন 'সময়াবদ্ধ' রূপে।

এই উপরিল্লিখিত প্রাথমিক পর্যায়ের হস্তনির্মিত নারী অবয়বের সম্পর্কে একটি ব্যাপক ও সর্বজনীন শব্দবন্ধ সাধারণ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা হল মাতৃকাশক্তি। যার মধ্যে কখনো একক উপস্থাপনা, আবার কোনও অবয়বে সন্তান সহযোগে নারী শক্তির উপস্থাপনা (চিত্র-৫ক) কখনো বা নারী দেহে পক্ষী বা পশুর মুখমণ্ডলের উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয় বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রত্নস্থলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সন্তান সহযোগে ছাগলের মুখাবয়ব সম্পন্ন মাতৃকা মূর্তির(চিত্র-৫খ) সন্ধান পাওয়া যায় যাদের নৈগমেষী রূপে অনুমান করা হয় অর্থাৎ শিশুদের রক্ষক ছাগ মুখাবয়ব সম্পন্ন দেবতা নৈগমেষ এর স্ত্রীরূপ[85]। এই ধরণের অবয়ব মোটামুটি বাংলার প্রায় সকল প্রত্নস্থলেই কমবেশি পাওয়া যায় যথা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, হরিনারায়ণপুর, তিলপি, চন্দ্রকেতুগড় সর্বত্রই বিদ্যমান।[86] কেবল বাংলাই নয়, হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োর সময় থেকে শুরু করে আজও বহু ক্ষেত্রে এই আদিম শৈলীতে নির্মিত অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। ইতিপূর্বেও উল্লিখিত অধুনা পশ্চিমবঙ্গের একাধিক গ্রামে প্রায় অনুরূপ ধাঁচের টেরাকোটা অবয়ব অবয়ব প্রস্তুত ও ব্যবহার হয় আজও। নীচে বাঁকুড়ার একটি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত মাটির এই জাতীয় অবয়ব তুলে ধরা হয়েছে যার প্রায় অনুরূপ অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় বাংলা ও বিহারের ভিন্ন অঞ্চল থেকে। (চিত্র- ৫গ,৫ঘ,৫ঙ) আর তা ব্যবহৃতও হয় মুখ্যত বিভিন্ন স্থানীয় বা লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, ব্রত, মানত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কিংবা বিভিন্ন ধর্মীয় থানে এধরণের অবয়ব প্রদান করা হয়ে থাকে মনস্কামনা পূরণে। মনে করা হয় অতীতেও এসকল নারীমূর্তির উপস্থাপনাকে সাধারণত প্রজনন স্বত্তা বা উর্বরতার প্রতীক রূপে গন্য করা হত, তেমনই আবার সন্তান যোগে নারী মূর্তির উপস্থাপনা থেকে তাকে সন্তানের কল্যানের উদ্দেশ্যে রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে তার উপাসনার উদ্দেশ্যে সম্ভবত এজাতীয় অবয়ব গড়ে তোলা হচ্ছে। যা এর গ্রহণযোগ্যতা ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা কে অধিক মাত্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সাধারণত এগুলি এমন অবয়ব যেখানে তার কারুকার্য বিহীন আদিম রূপের সৌন্দর্যায়নের কোনোরূপ প্রচেষ্টা কোন কালেই বিশেষ লক্ষণীয় নয়। যদিও এসকল

[85] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ*, পৃষ্ঠা- ৩৯

[86] অশোক কুমার ভট্টাচার্য, 'টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল', শুঙ্গ কুষান পিরিয়ড, পৃষ্ঠা– ৬০-৬১

অবয়বগুলিকে মাতৃদেবী বা ধর্মীয় অবয়ব রূপে সন্নিহিত করা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু এজাতীয় কোনও বৃহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া কেবলই খেলনা বা সৌখিন অবয়ব রূপে এত বছরের ব্যবধানেও অনুরূপভাবে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব কিনা এও অন্যতম প্রশ্ন।

৫ক

৫খ

চিত্র-৫ক সন্তান সহ মাতৃকা মূর্তি, চন্দ্রকেতুগড়, চিরন্তন শ্রেণীভুক্ত (Ageless) সৌজন্যে- গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ, আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল,* কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম, ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, (২০০৭) পৃষ্ঠা- ৪৩

চিত্র-৫খ সন্তান সহযোগে ছাগলের মুখাবয়ব সম্পন্ন মাতৃকা মূর্তি, ধোসা, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

৫গ

৫ঘ

৫ঙ

চিত্র- ৫গ সাম্প্রতিক হস্ত নির্মিত মাতৃ অবয়ব, দক্ষিণ শ্রীরামপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, সৌজন্যে- অন্বিতা দত্ত, *দ্য কালচারাল সিগনিফিকেন্স অফ আর্লি হিস্টোরিক টেরাকোটা আর্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল: অ্যান এথনোআর্কিওলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ,* ডেকান কলেজ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট এ প্রদত্ত পিএইচ.ডি গবেষণা সন্দর্ভ, পুনে, মে ২০১৩ , পৃষ্ঠা-১৩১

চিত্র- ৫ঘ হস্ত নির্মিত প্রাথমিক পর্যায়ের পোড়ামাটি অবয়ব , মঙ্গলকোট, সৌজন্যে – অমিতা রায়, 'টেরাকোটাস ফ্রম এক্সক্যাভেশনস অ্যাট মঙ্গলকোট (বর্ধমান)', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,* খণ্ড ১, ঢাকা, আই সি এস বি এ, ১৯৯৬ পৃষ্ঠা-২০

চিত্র- ৫ঙ হস্ত নির্মিত প্রাথমিক পর্যায়ের পোড়ামাটি অবয়ব, ভিটা, সৌজন্যে- পি এল গুপ্তা, *গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট,* পৃথিবী প্রকাশনী, বারাণসী-৫(ইন্ডিয়া), ১৯৭২ (Fig.1)

আবার আদি ঐতিহাসিক বাংলার মৃৎ অবয়বের মধ্যে পদ্মে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান রূপে, কিংবা হাতে পদ্মনাল সহ এবং কখনো মুদ্রার ওপর দণ্ডায়মান রূপে একাধিক মাতৃ অবয়ব উল্লেখ্য। পদ্মের সংযোগের দরুণ বহুক্ষেত্রে তাকে 'শ্রীলক্ষ্মী' রূপে অভিহিত করা হয়। নীচে চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত একটি নারী অবয়বের উপস্থাপন করা হল যা লক্ষ্মীর সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য কিছু প্রতীককে পরিস্ফুট করে, যেখানে মাছের আকারের ফলকের ওপর প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর সামনের দিকে মুখ

করে দণ্ডায়মান, যার থেকে কুঁড়ি সহ ছটি পদ্মনাল ও প্রস্ফুটিত পদ্মের উত্থান ঘটেছে এবং দুই হাতে দুটি বড় নাল ধরে রয়েছেন। এর সাথে লক্ষণীয় সুগঠিত স্তন ও গুরু নিতম্ব,মুখ কিছুটা ফোলা, বড় বড় চোখ ও মুখে রহস্যময় হাসি। আবার উন্মুক্ত নাভিদেশ ও অলংকৃত কটিবন্ধ যার কিছু অংশ পায়ের মাঝখান দিয়ে ঝোলানো, মাথায় খোঁপা যার থেকে একাধিক বিনুনি ঝুলছে, সঙ্গে নূপুর, বালা, হাতে বাজুবন্ধ দ্বারা সুসজ্জিতা। ফলকটির সীমারেখা ছোট ছোট পুঁতির মত মাটির ডেলা দিয়ে সজ্জিত। (চিত্র-৬ক) এইরূপ আরও বিবিধ অবতারণা পরিলক্ষিত হয় বাংলা সহ সমকালীন বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য দেবী লক্ষ্মীর সাথে সম্পর্কিত প্রধান প্রতীকী ‘পদ্মে’র সংযোগ লক্ষণীয় আদি ঐতিহাসিক বাংলায় উপস্থাপিত বেশ কিছু নারীমূর্তির সাথে যাদের অন্যান্য বাহ্যিক আঙ্গিকের ভিত্তিতে তাকে উপাস্য নারী অবয়ব হিসেবেই অনুমান করা হয়। কিন্তু ভালো করে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর বাহ্যিক উপস্থাপনা, মৌখিক অভিব্যাক্তি এবং সাজসজ্জায় এক স্বতন্ত্র লৌকিক ছাপ সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পদ্ম সহযোগে দেবীর উপস্থাপনা মানেই যে তা সর্বদা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি বা উক্ত আদর্শপুষ্ট দেবীর উপস্থাপনা এমনটা নিশ্চিত রূপে বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা এই শ্রেণীর পদ্ম সহ নারীমূর্তির উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় হরপ্পা সভ্যতাতেও।[87] উক্ত অলংকারসম্পন্ন, সুসজ্জিতা মাতৃমূর্তি সম্পদ ও সমৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত বলেই অনুমিত হয় অর্থাৎ ‘সম্পদ’, ‘সমৃদ্ধি’ জনিত ধারণা সন্নিহিত উক্ত অবয়বের সাথে। আর তাহলে কি বাংলার মৃৎশিল্পের পরিসরেও এরূপ অনুমান করা যুক্তিযুক্ত যে এই প্রকার অবয়ব বহুলাংশে অনুরূপ ভাবাদর্শগত ছিল? যারা হয়তো পরবর্তীতে ক্রমে সময়ের ব্যবধানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সূত্রে ব্রাহ্মণ্য দেবীস্বত্তা বা রূপ অর্জন করেছে? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ধরণের নারী অবয়বের সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তথা সম্পদ বা সমৃদ্ধি জনিত ধারণা সংযুক্ত হয়ে মাতৃকা শক্তি রূপে তার প্রকাশের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় বাংলা কিংবা গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্য কেন্দ্রেও বেশ কিছু অবয়বে দেখা যায় একাধিক মুদ্রা অঙ্কিত এবং উপর এক মাতৃকা দেবীর উপস্থাপনা। নিম্নেও চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত একটি অবয়বের ভগ্নাংশ (চিত্র-৬খ) উপস্থাপিত হল যেখানে

---

[87] শক্তি কালী বসু, *ডেভেলপমেন্ট অফ আইকনোগ্রাফি ইন প্রি-গুপ্ত বঙ্গ,* কলকাতা, পুঁথি পুস্তক প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৫

ভগবন্ত সহায়, *আইকনোগ্রাফি অফ সাম ইম্পর্টেন্ট মাইনর হিন্দু অ্যান্ড বুদ্ধিষ্ট ডিটিস,* নিউ দিল্লী, অভিনব পাবলিকেশন, ১৯৭৫ পৃষ্ঠা- ১৫৭

ফলকটির নিম্নভাগে মুদ্রার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ এবং একজোড়া পায়ের উপস্থিতি লক্ষণীয় তার উপরিভাগে। তাহলে কি অনুমান করা চলে সম্পদ বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সংরক্ষণ জনিত চেতনা জনপ্রিয় ছিল বা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তৎকালীন সমাজে যার বহিঃপ্রকাশ রূপে এই ধরণের অবয়বের আবির্ভাব ঘটেছিল আদি ঐতিহাসিক মৃৎশিল্পে? নিঃসন্দেহে সেই দিকটি ভেবে দেখা প্রয়োজন।

চিত্র-৬ক পদ্মসহ দেবী(শ্রী লক্ষ্মী?), চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

চিত্র-৬খ উৎকীর্ণ মুদ্রায় উপস্থাপিত মাতৃকা মূর্তি, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

এছাড়া রয়েছে 'ধান্যদেবী', 'মৎস্যদেবী' বা 'যক্ষিণী'র ন্যায় উপস্থাপনা। একাধিক নারী অবয়বের সাথে শস্যদানা সম্পৃক্ত রয়েছে, মূলত বৈচিত্র্যপূর্ণ অলংকার ও বস্ত্রাদি পরিহিত দণ্ডায়মান সুসজ্জিত অবয়ব যার মস্তকের কেশবিন্যাশের অঙ্গ স্বরূপ দুপাশে শস্যদানা উপস্থাপিত এবং স্বচ্ছ পোশাকে তার প্রজনন অঙ্গ সুস্পষ্ট।(চিত্র-৭) এছাড়াও একাধিক ভঙ্গীর নারী অবয়ব মেলে যেখানে শস্যদানা সংযুক্ত। তাহলে প্রশ্ন আসে এই ধরণের অবয়বকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা চলে? তাহলে কি বলা যায় এগুলি সম্ভবত সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ও উৎপাদিত শস্যাদির সংরক্ষণ জনিত চেতনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল? যেখানে মাতৃ শক্তির ধারণার সাথে উক্ত শস্যকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে? অপরদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা কিংবা রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালাতেও এক শ্রেণীর নারীমূর্তি রয়েছে যার ডান হাতে ২টি মাছ, বাম হাতটি কোমরে। রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালাতেও এই রূপ ডান হাতে মৎস্য উৎকীর্ণ নারী মূর্তির ভগ্নাংশ পরিলক্ষিত হয়।(চিত্র-৮) যাদের সাধারণত মৎস্য দেবী[88] বা কোন নদী বা জলজগৎ এর দেবী[89] রূপে অনুমান করা হয়। তবে উক্ত অবয়বকে যে

---

[88] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে*, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা -৪১

[89] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ* ,পৃষ্ঠা-১৩১

নামেই অভিহিত করা হোক সম্পৃক্ত মৎস্য উপস্থাপনাও আদতে মঙ্গলসূচক ধারনার সহিত সম্পৃক্ত থাকায় তা প্রজনন স্বত্ত্বা ও উর্বরতার প্রতীক রূপে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

চিত্র-৭

চিত্র-৮

চিত্র ৭- শস্যদেবী/ধান্যদেবী, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক, সৌজন্যে- গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত, *এলোকোয়েন্ট আর্থ*, পৃষ্ঠা- ১৩৪

চিত্র ৮- মৎস্য উৎকীর্ণ নারী অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতক, সৌজন্যে- গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত, *এলোকোয়েন্ট আর্থ*, পৃষ্ঠা- ১৩১

আদি ঐতিহাসিক পর্বে বাংলার পোড়ামাটি শিল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবয়ব হল যক্ষিণী অবয়ব। বিশেষ রূপে চন্দ্রকেতুগড়ে এর বিপুল প্রাপ্তির পাশাপাশি তিলপি, ধোসা, হরিনারায়নপুর, তমলুক, বাংলাদেশের মহাস্থানগড় এমনকি উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার পোড়ামাটি শিল্প সমৃদ্ধ নগরকেন্দ্রগুলিতেও এই শ্রেণীর অবয়ব ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয় যা সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার পারস্পরিক সংমিশ্রণের ইঙ্গিতবাহী সন্দেহ নেই। সাধারণত একটি যক্ষী সমপদদস্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান থাকে, এক হাত দেহ সংলগ্ন ভাবে ঝোলানো অপরটি কোমরে, স্পষ্ট উন্মুক্ত নাভীদেশ, জাঁকজমক পূর্ণ পরিধান, অলঙ্কারের আধিক্য যথা পুষ্পশোভিত কানের দুল, জাঁকজমকপূর্ণ কোমর বন্ধ, বাজুবন্ধ, মালা প্রভৃতি উল্লেখ্য। এছাড়া বিশেষত উল্লেখ্য অধিকাংশ অবয়বের এর সাথে থাকে কেশ সজ্জার অঙ্গরূপে পাঁচটি শলাকা যার অগ্রভাগে রয়েছে অঙ্কুশ, ত্রিশূল, কুঠার, বজ্র ও ধ্বজা যেকারণে সে

'পঞ্চচূড়া যক্ষী' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। যা প্রাপ্ত এজাতীয় অবয়বের ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী রূপে পরিগণিত বলা যায়। বিশেষ রূপে শুঙ্গ পর্যায় থেকে এর বিপুল আধিক্য লক্ষ কর যায়। তবে কখনো আবার ৬টি আয়ুধও পরিলক্ষিত, যার অগ্রভাগে থাকে বান। চন্দ্রকেতুগড়ে আবার ১০টি চূড়া সম্বলিত কিংবা ১২টি চূড়া সহ যক্ষিণী মূর্তিরও সন্ধান মেলে যা এক স্থানীয় স্বতন্ত্রতার পরিচয় বহন করে।[90] কেশ সজ্জায় এইরূপ আয়ুধের উপস্থিতি প্রমাণ করে এই দেবী কেবল সম্পদ বা সমৃদ্ধির দেবী নন পাশাপাশি তিনি সম্ভবত তার আরাধকের রক্ষাকর্ত্রী ও শক্তি প্রদানকারীও বটে। (চিত্র-৯ক,৯খ) সুতরাং অনুমান করা চলে সমাজে সমৃদ্ধি ও উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে নারীদেহে ভিন্ন ভিন্ন স্বত্তা বা প্রতীকীর কল্পনা করা হয়েছে যা শিল্পীর কর্মদক্ষতা ও চিন্তনশক্তির সমন্বয়ে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। বিভিন্ন সংগ্রহালয়ের রক্ষিত অবয়ব ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থের ক্যাটালগগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে আরও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় যক্ষিণী মূর্তির উপস্থাপনা বাংলার টেরাকোটা শিল্পকে সমৃদ্ধি প্রদান করে এসেছে সর্বদা। কখনো যক্ষীর একক উপস্থাপনা কখনো তার সহকারীদিগের উপস্থিতি লক্ষনীয় তবে মূল কেন্দ্রীয় যক্ষী অবয়ব অন্যান্য উপস্থাপিত অবয়বের তুলনায় সাধারণত বৃহৎ আকৃতি সম্পন্ন থাকে। এছাড়া সঙ্গে পাখা,দর্পন বা উপাসক মণ্ডলী দৃশ্যমান, দেবী কখনো প্রস্ফুটিত পদ্মে কখনো মুদ্রায় কখনো বা জলের উপর দণ্ডায়মান থাকেন ; আবার মাথার পেছনে থাকে প্রভামন্ডল। সুতরাং প্রাচীন সমাজে উপাসনার অঙ্গ স্বরূপ নারীশক্তি বা মাতৃকাশক্তির আরাধনার দিকটি কিন্তু প্রকাশিত হয় উপরিউক্ত বিবিধ অবয়ব সমূহের মধ্য দিয়ে। সমাজে আদতে সমৃদ্ধি ও উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে নারীদেহে ভিন্ন ভিন্ন স্বত্তা বা প্রতীকীর কল্পনা করা হয়েছে যা শিল্পীর কর্মদক্ষতা ও চিন্তনশক্তির সমন্বয়ে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

[90] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ*, পৃষ্ঠা- ৬১-৬৪

চিত্র- ৯ক

চিত্র-৯খ

চিত্র ৯ক- পঞ্চচূড়া যক্ষী, হরিনারায়নপুর, ছাঁচ নির্মিত অবয়ব, সৌজন্যে - গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত, *এলোকোয়েন্ট আর্থ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৯
চিত্র ৯খ- পঞ্চচূড়া যক্ষী, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

তবে শুধু যক্ষিণী নয়, যক্ষ উপস্থাপনাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যিনি মূলত সম্পদের সহিত সম্পর্কিত। জাঁকজমকপূর্ণ, ঐশ্বর্যপূর্ণ আবার কিছুটা খর্বকায় অবয়ব আদি ঐতিহাসিক বাংলার মৃৎশিল্পে উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা। এই ধরণের মূর্তির মধ্যে অন্যতম যক্ষরাজ কুবের; মেদবহুল স্থূলকায় উদর, উঁচু পাগড়ি, বড় কানের দুল, বালা, মালা, উন্মুক্ত কাঁধ, হাতে গোলাকার বাতাপিলেবু জাতীয় উপাদান আবার কখনো পদ্ম কখনো বা পক্ষী, সঙ্গে টাকার থলি ও পানপাত্র এবং কখনো ঊর্ধ্বলিঙ্গ(Ithiphalic) উপস্থানায় ভূষিত তিনি। তাদের মেদবহুল পেট শক্তি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। (চিত্র- ১০ক,১০খ) আবার কোনও মূর্তিতে তিনি স্থূল উদর, অর্থের ঝুলি ও পানপাত্র সহ হাতে সাপ বা বেজীর লেজ ধরে আছেন। বৌদ্ধ সম্পদের দেবতা জম্ভল এইরূপ স্থূল উদর, লেবু জাতীয় উপাদান ও বেজী সম্বলিত প্রতীকী বহন করেন, চন্দ্রকেতুগড়ে একটি এজাতীয় অবয়বের সহিত ত্রিরত্ন লকেটের সন্ধান মেলে যা থেকে তাকে বৌদ্ধ দেবতা জম্ভলর উপস্থাপন বলে অনুমান করা হয়ে

থাকে।[91] চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থান সহ বাংলার বহু ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সম্পর্কিত একাধিক প্রত্নদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, ফলত আলোচ্য অবয়বটিও যে বৌদ্ধ দেবীর প্রতিরূপ হওয়া সম্ভব অস্বীকার করা চলেনা।

১০ক

১০খ

চিত্র-১০ক কুবের, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

চিত্র-১০খ কুবের(?), চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

এরপর বলা চলে, চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত একপ্রকার উপস্থাপনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে যেখানে সন্তান প্রসব ভঙ্গিতে উপস্থাপিত একটি নারী অবয়ব পরিলক্ষিত হয় যাকে সাধারণভাবে ‘লজ্জাগৌরী’ বা ‘অদিতি উত্থনপদ’ বলে অভিহিত করা হয়। (চিত্র-১১) কমবেশি সূক্ষ্ম পার্থক্যে এজাতীয় অবয়ব

---

[91] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ,*পৃষ্ঠা- ৮৫-৮৬

ভারতের প্রায় অধিকাংশ প্রত্নস্থলেই পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণত অন্যত্র এই অবয়বের মুখমণ্ডল পদ্ম বা অন্য পুষ্প মোটিফ সম্বলিত থাকে একমাত্র চন্দ্রকেতুগড়ে তা মানব মুখাবয়বের অধিকারী যা ঐতিহাসিকদের নিকট এর আকর্ষণ বহু গুনে বৃদ্ধি করে। তবে আবার চন্দ্রকেতুগড়েই প্রাপ্ত সমগোত্রীয় অপর এক অবয়বে মুখমণ্ডলের অংশে উদ্ভিজ্জের ন্যায় উপস্থাপনা রয়েছে, এছাড়া বাকি দৈহিক উপস্থাপনা পূর্বের ন্যায় সন্তান প্রসব ভঙ্গী। এখানে সম্ভবত প্রজনন শক্তির প্রতীক স্বরূপ বা সন্তান জন্মের সহিত সম্পর্কিত নানান আচার বিধির অঙ্গ হিসেবে এইরূপ অবয়বকে গ্রহণ করা হয়েছিল।[92]

চিত্র-১১ সন্তান প্রসব ভঙ্গিতে উপস্থাপিত নারী অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে-এলোকোয়েন্ট আর্থ,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৪৭

আলোচ্য পর্বের অন্যতম জনপ্রিয় অবয়ব মিথুন রীতির উপস্থাপনা, বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাপ্ত এজাতীয় অবয়ব বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসকে বিশেষ পরিচিতি প্রদান করে। সামগ্রীকভাবে এই ধরণের ফলকের চরিত্র সম্পর্কে দু ধরণের অভিমত মেলে- কেউ বলেন এগুলি সমাজ চিত্রের উপস্থাপনা, অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশবিশেষ আবার কারও মতে এগুলি প্রজনন স্বত্তা ও উর্বরতার প্রতীক তাই এর সঙ্গে অবশ্যই কিছু প্রতীকী তাৎপর্য জড়িত।[93] সাধারণত দুই পৃথক ধরণ লক্ষ করা যায়, এক শ্রেণীর অবয়বে প্রভূত পরিমানে নারী পুরুষের প্রেমময় মুহূর্ত বা আলিঙ্গনরত দৃশ্য শিল্পীর কর্মক্ষেত্রে উঠে এসেছে।(চিত্র-১২ক) অপর শ্রেণীতে আবার অতি সূক্ষ্ম ভাবে

[92] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ*,পৃষ্ঠা- ৪৭-৪৮

[93] এস এস বিশ্বাস- *টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল*, দিল্লী, আগম কলা প্রকাশনী, ১৯৮১ ,পৃষ্ঠা-১৩৭

রতিক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ বা ভঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে, (চিত্র-১২খ) বিশেষ রূপে এই শ্রেণির অবয়বের উপস্থাপনা পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে। এমনকি সেখানে বেশ কিছু ফলকে বিস্তীর্ণ ভঙ্গির মধ্যে মৈথুনকালে দেহের পশ্চাৎভাগে গুরুত্ব আরোপের দৃষ্টান্ত বা স্বমেহনের ন্যায় দৃশ্য সম্বলিত কিছু ফলকও পরিলক্ষিত হয় যা হয়তো মিথুন শৈলীর পার্থিব দিকটিকে ইঙ্গিতবাহী করে। তা স্বত্তেও এর সাথে প্রজনন স্বত্তা জনিত চেতনাকে কখনোই সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলেনা, হতেই পারে নিহিত মূল চিন্তন একই রেখে কেবল তাকে ভিন্ন ভঙ্গীতে উপস্থাপন করা হয়েছিল, নিজেদের জীবনযাত্রার সাথে সংযোগ সাধনের জন্য কিংবা নতুনত্ব আনয়নের জন্য।

চিত্র-১২ক মিথুন দৃশ্য, সৌজন্যে, গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’,পৃষ্ঠা- ১৪২

চিত্র-১২খ মিথুন দৃশ্য, সৌজন্যে- চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় সংগ্রহালয়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০১৯

এসকল অবয়বের পাশাপাশি আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় পরিসরে আরও একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলিও সাধারণত মানুষের বিশ্বাস, ধর্মচিন্তার সাথে সম্পর্কিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। যার মধ্যে দেখা যায়-

(ক) অর্ধ মানবী – অর্ধ নাগিনী অবয়ব, (চিত্র-১৩) যার পরিচয় পাওয়া যায় সমগ্র আদি ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে বাংলা সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে। একে প্রাচীন সমাজের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ অনুমান করা চলে, সম্ভবত স্বর্পসংকুল অঞ্চলে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সর্পিণীর প্রতিরূপকে মাতৃশক্তি রূপে উপাসনার ইঙ্গিত দেয় এই অবয়ব।[94] বর্তমানেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সর্পদেবতা বা মনসা পূজার প্রচলন এরূপ সমজাতীয় ধর্মীয় চেতনার ইঙ্গিত দেয়। (খ) সুসজ্জিত অলংকারসম্পন্ন পক্ষযুক্ত নারী ও পুরুষ অবয়ব যাদের ব্রাহ্মণ্য দেবস্বত্তা সূর্যের প্রাথমিক রূপ, কামদেব, যক্ষ-যক্ষী ইত্যাদি নানারূপে অনুমান করা হয়।[95] আবার অপর কিছু অবয়বে ঘোড়াবাহিত রথে পরিণত রূপে অলংকৃত সূর্যের উপস্থিতিও কল্পিত।[96] (গ) হস্তীমুখ সম্পন্ন অবয়ব (চিত্র-১৪), যদিও তাদের প্রকৃত চরিত্র বিশেষ নির্ধারিত নয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য গনেশের ন্যায় হস্তীমুখাবয়ব হলেও প্রকৃত অর্থে তা গনেশের আদর্শের সাথে জড়িত ছিল কিনা বলা মুশকিল। কেননা মোটামুটি গুপ্ত

---

94 ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে*, পৃষ্ঠা- ২০-৩৩

95 গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', পৃষ্ঠা- ৮৫-৮৬

96 ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে*, পৃষ্ঠা-৪০

যুগের পূর্বে গনেশের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়না।[97] ফলে বাংলার প্রাচীন শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত এরূপ অবয়ব যা আদতে সাধারণ হস্তী অবয়ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এদের কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায় সেটি একটি প্রশ্ন। উপরিউক্ত হস্তীমুখ সম্পন্ন অবয়ব সমূহের বিশেষ উপস্থিতি কি তাহলে ঐশ্বরিক শক্তি রূপে ক্রমে গনেশ দেবতার সহিত সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণার বিকাশ ঘটায়? এজাতীয় সম্ভাবনা কিন্তু থাকতেই পারে। (ঘ) হস্তী, (চিত্র-১৫) ভেড়া প্রভৃতির পিঠে উপবিষ্ট রূপে একাধিক সুসজ্জিত অবয়ব যাদের ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য অবয়বের উপস্থাপনা রূপে কল্পনা হয়। তবে বহুক্ষেত্রে সংশয় থাকতেই পারে, সকল অবয়বই যে একই চিন্তাধারাভুক্ত ছিল নিঃসন্দেহেই তা নয় ফলত পশুর পিঠে উপবিষ্ট অবয়বগুলি যে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রতিফলন তাও অস্বীকার্য নয় কিন্তু সেক্ষেত্রে বাহ্যিক উপস্থাপনার দিকটিও ভেবে দেখা দরকার। সকল অবয়ব কখনোই সমগোত্রীয় নয়। ফলস্বরূপ ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রম থাকলেও, এসকল অবয়বগুলিকে সাধারণত মানুষের বিশ্বাসের অঙ্গ রূপে বা তৎসম্পর্কিত ধর্মীয় চিন্তনের প্রতিচ্ছবি রূপে গন্য করা হয়ে থাকে। ইন্দ্র বা অগ্নির নিশ্চিত পরিচিতি নিয়ে সংশয় থাকলেও বা হস্তীমুখ সম্পন্ন অবয়বের চরিত্র নিয়ে দ্বন্দ থাকলেও তাদের বাহ্যিক উপস্থাপনা ও বহুল প্রাপ্তি থেকে এদের সহিত সম্পৃক্ত কাল্ট সংযোগকে স্পষ্ট রূপেই অনুমান করা যায়।

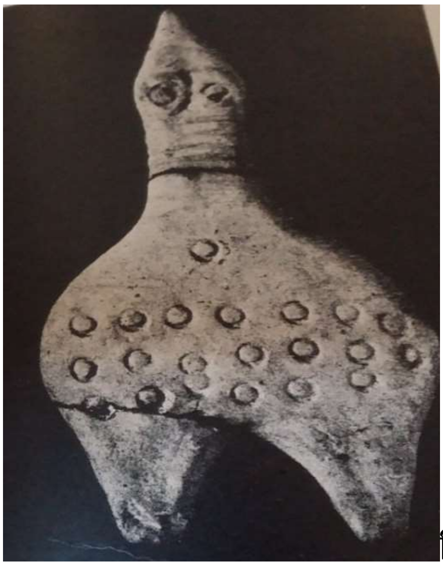
চিত্র-১৩

চিত্র-১৪

চিত্র ১৩- হাতে গড়া অর্ধ মানবী- অর্ধ নাগিনী অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে এস এস বিশ্বাস, প্রাগুক্ত (Plate-vii)

[97] এস এস বিশ্বাস, *টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল*, পৃষ্ঠা– ৮২

চিত্র ১৪- হস্তীমুখ সম্পন্ন অবয়ব, সৌজন্যে, চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় সংগ্রহালয়, ব্যাক্তিগত চিত্র সংগ্রহ, সায়নী রায়, ডিসেম্বর, ২০১৯

চিত্র-১৫ আরোহী সহ হস্তী, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

অপরদিকে আলোচ্য পর্বের পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিভিন্ন পশু অবয়বগুলি। কিছু অলংকৃত পশুপক্ষী যেমন রয়েছে তেমনই সম্পূর্ণ অলংকরণ বর্জিত প্রাথমিক পর্বের অসংখ্য হাতে গড়া একক বৃষ, হাতি (চিত্র-১৬), ঘোড়া প্রভৃতি পশু মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়, হরিনারায়নপুর, তিলপি প্রভৃতি সহ বিভিন্ন বঙ্গীয় কেন্দ্রে। এই বিপুল পরিমাণ পশু পাখির উপস্থাপনা সমকালীন প্রাকৃতিক জগতের প্রতিফলন তো বটেই, কিন্তু এর সাথে নিশ্চিত রূপেই অপর একটি প্রেক্ষিত জড়িত থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রাথমিক পর্বের আদিম শৈলীতে তৈরি বিভিন্ন পশুর একক উপস্থাপনা, আদিম মাতৃকা মূর্তির ন্যায় এই অবয়বগুলিও একইভাবে বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে আজও বিদ্যমান রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে, (চিত্র-১৭) যেখানে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে এগুলির গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। উক্ত প্রাথমিক মাতৃকামূর্তির ন্যায় এসমস্ত অবয়বগুলিও একই ধর্মচিন্তা প্রসূত বলে অনুমান করা যেতে পারে যেখানে নির্দিষ্ট কোন দেবী বা ধর্ম উপাসনা নয়, সামগ্রীক রূপে শুভ চেতনা বা মঙ্গলের প্রতীক স্বরূপ পালিত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গ রূপে তাদের অবস্থানকে আমরা

অনুমান করতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইতিপূর্বেও এই সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে হস্ত নির্মিত মাতৃ মূর্তি আলোচনা প্রসঙ্গে, এজাতীয় পশু অবয়বগুলিও ষ্টেলা ক্র্যাম্ররিশ এর Timeless শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আদি ঐতিহাসিক বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারায় কিছু কাহিনী সম্বলিত ফলকের উপস্থাপনাও পরিলক্ষিত হয়, যেখানে দৈনন্দিন জীবনের নানান কাহিনীর পাশাপাশি কিছু মাইথোলজিকাল কাহিনী যথা জাতক, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ বা বিভিন্ন স্থানীয় লোককাহিনীর নানান দৃশ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। যদিও আদি ঐতিহাসিক পর্বে এজাতীয় ফলকের সংখ্যাগত প্রাপ্তি বিশেষ নয় এবং কিছু কিছু ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়নপুর, তমলুক অঞ্চলে। যেমন চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি গোলাকার ফলকে উপস্থাপিত এক মানব একটি কচ্ছপ ধরে আছেন, যা সম্ভবত *কচ্ছপ জাতক* এর দৃশ্য বলে মনে করা হয়। আবার অন্য একটি ফলকে দেখা যায় এক দৈত্য এক নারী মূর্তিকে তার হাতে করে বহন করছে, (চিত্র-১৮) কেউ কেউ একে রাবন কর্তৃক সীতার অপহরণের দৃশ্যের উপস্থাপনা কিনা সেই উল্লেখ করেছেন। যার উপস্থাপনা মেলে কৌশাম্বীতেও।[98] এইরূপ কিছু কিছু কাহিনী উঠে এসেছে পোড়ামাটি শিল্পীদের হাত ধরে, জায়গা করে নিয়েছে সাধারন মানুষের ঘরে ঘরে শিল্প ইতিহাসচর্চায় যাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

[98] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ*, পৃষ্ঠা- ২১৫

চিত্র ১৬- হস্ত নির্মিত হস্তী অবয়ব, হরিনারায়নপুর, সৌজন্যে- গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত, *এলোকোয়েন্ট আর্থ,* পৃষ্ঠা-২৪৮

চিত্র-১৭ সাম্প্রতিক পর্বে মনসা থানে প্রদত্ত পশু অবয়ব, পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া, সৌজন্যে- অন্বিতা দত্ত, *দ্য কালচারাল সিগনিফিকেন্স অফ আর্লি হিস্টোরিক টেরাকোটা আর্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল: অ্যান এথনোআর্কিওলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ*, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা-১৩১

চিত্র ১৮- দানব কর্তৃক নারী অপহরন দৃশ্য, চন্দ্রকেতুগড়, খ্রিষ্টীয় ১ম-৩য় শতক, সৌজন্যে- গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত, *এলোকোয়েন্ট আর্থ,* পৃষ্ঠা- ২১৫

উপরি বর্নিত অবয়বগুলি ছাড়াও আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় পরিসরে বেশ কিছু সামাজিক প্রেক্ষিত সম্পন্ন অবয়ব পাওয়া যায় আলোচ্য ক্ষেত্রে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, বাংলায় বিশেষরূপে চন্দ্রকেতুগড় সহ উত্তর ভারতীয় কেন্দ্র রাজঘাট, কৌশাম্বী প্রভৃতির ন্যায় সমৃদ্ধ অঞ্চলেও শিকারের প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন একাধিক টেরাকোটা উপস্থাপনা লক্ষণীয়। যদিও সমৃদ্ধ নগর অঞ্চলে শিকার নির্ভর জীবনযাপন কিছুটা অনভিপ্রেত, কিন্তু যেকোনো নগরাঞ্চলে আর্থিক প্রতিপত্তি সম্পন্ন নাগরিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার অন্যতম অঙ্গ রূপে বিভিন্ন ধারার বিলাশ বা বিনোদনের উপস্থিতির বিষয়টি অত্যন্ত প্রত্যাশিত, যার মধ্যে শিকার অন্যতম। তেমনই আবার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটি ফলকে তিনজন ব্যক্তি কর্তৃক কাস্তে দিয়ে ফসল কাটার দৃশ্য পরিলক্ষিত যা কৃষিকাজ সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারনার ইঙ্গিত দেয়।(চিত্র নং-১৯) এছাড়াও ইতিপূর্বেই ‘ধান্যদেবী’র কথা উল্লিখিত, যেখানে উপস্থাপিত দেবী মূর্তির সাথে ধান বা শস্যদানার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে; যা সমকালীন সমাজে উক্ত শস্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং এই ফলকগুলি আদতে সমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতাকে

প্রকাশিত করে। পাশাপাশি নৃত্যগীত- বাদ্যরত (চিত্র-২০) কিছু দৃশ্য বা সামাজিক লোকানুষ্ঠানের দৃশ্য সম্বলিত কিছু ফলকও পাওয়া যায় বঙ্গীয় পরিসরে যা সমকালীন সমাজ জীবন সম্পর্কে আভাষ দেয় অনুমান করা চলে। এছাড়াও বহু অবয়বের ভগ্নাংশ পাওয়া যায় বাংলার বিবিধ প্রত্নস্থলে, যাদের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়না কিংবা একত্রে তুলে ধরাও সম্ভব নয়। আলোচ্য পরিসরে মোটামুটিভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অবয়বগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল যারা বাংলার পোড়ামাটি শিল্পের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। সুতরাং বাংলার পোড়ামাটি শিল্পের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এই আদি ঐতিহাসিক পর্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, এবং অবশ্যই শুধু বাংলা নয় ভারতীয় মৃৎশিল্প চর্চার প্রেক্ষাপটেও এই পর্বে পোড়ামাটি শিল্প সার্বিক সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত আসন অর্জন করেছিল বলা বাহুল্য।

চিত্র-১৯ লাঙল ও কাস্তে সহযোগে ফসল কাটা তথা কৃষিকাজ দৃশ্য, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

চিত্র-২০ মহিলা ড্রামবাদক, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

২.৩ আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকঃ

আনুমানিক তৃতীয়-চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গীয় পরিসরে বিকশিত পোড়ামাটি শিল্পধারা সম্পর্কে অদ্যাবধি আলোচনা করা হল। এর পরবর্তী সময়পর্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ববর্তী শিল্পধারায় কিছু পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করব, চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে বাংলায় পোড়ামাটি শিল্পের অবস্থান সম্পর্কে যাকে পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে গুপ্তঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে। মনে করা হয় এই পর্বে টেরাকোটার বিকাশ কিছুটা মন্থর এবং পূর্ববর্তী অধ্যায় অপেক্ষা এই পর্বে সংখ্যাগত প্রাপ্তি যেমন কম তেমনই বিষয়বস্তু বা শিল্প উপস্থাপনাও কিছুটা পরিবর্তিত। তবে এটাও মনে করা হয় এই পর্বে বাংলার মৃৎ ভাস্কর্য শৈল্পিক দক্ষতার এক বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, যা কিছুটা সমকালীন গুপ্ত প্রস্তর বা ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের ধাঁচ অনুসরণকারী বলে

অনুমিত।[99] আদি ঐতিহাসিক পর্বের তুলনায় এই পর্বে অবয়বের বাহ্যিক আতিশয্য অর্থাৎ ভারী বস্ত্রাদি, কারুকার্যখচিত অলংকরণ প্রভৃতি বহুলাংশে সংকুচিত হয় এবং পরিবর্তে পোশাক রূপে স্বচ্ছ বস্ত্রখণ্ড উপস্থাপনের প্রবণতা প্রচলিত হয় যা দৈহিক কমনীয়তাকে পরিস্ফুট করে তুলতে সক্ষম। সাধারণত গুপ্ত যুগের ভাস্কর্য সে পাথর নির্মিত হোক কিংবা পোড়ামাটি তাতে মূর্তির বাহ্যিকভাব এবং অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি প্রশান্ত ভাব প্রস্ফুটিত হয়। গুপ্তযুগের বিভিন্ন অবয়বগুলি খেয়াল করলে এই ধারা সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

আদি ঐতিহাসিক পর্বে পোড়ামাটি অবয়ব রূপে মানুষের প্রাথমিক ধর্মচিন্তা বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত যে ধরণের অবয়বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এই পর্ব তা থেকে ভিন্ন এবং তা বহুলাংশে প্রথাগত কিছু প্রতিষ্ঠিত ধর্মব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই পর্বের প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবয়বগুলির মধ্যে রয়েছে- পান্না ও ধোসা থেকে আবিষ্কৃত বৃহদাকৃতি মনুষ্য মস্তক, পান্না থেকে আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম কারুকার্যসম্পন্ন বরাহী মূর্তি (চিত্র-২১) যা হাত ও চাকার দ্বারা নির্মিত। আবার এই পর্বে অন্যতম উল্লেখ্য নাগ উপস্থাপনা, ফণাযুক্ত অবয়ব এবং নেকলেস এর অলংকরণেও নাগ প্রতীকের উপস্থাপনা লক্ষণীয়। যেমন- পান্না এবং মহাস্থানের মঙ্গলকোট ঢিবি থেকে আবিষ্কৃত নাগ অবয়ব (চিত্র-২২) এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।[100] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাস্থানের মূল দুর্গাঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত মঙ্গলকোট এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাম। এখানে উৎখননের ফলে প্রায় এক হাজার পোড়ামাটি অবয়ব আবিষ্কৃত হয়েছে যার অধিকাংশই সুসজ্জিত উষ্ণীষ সহ আবক্ষ নারী মূর্তি যাদের পুরু ওষ্ঠ, টিকালো নাসিকা, সুডৌল বক্ষ, সরু কটিদেশ লক্ষণীয়। বিশেষ উল্লেখ্য, এখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে অধিকাংশ অবয়বের মস্তকেই সর্পফনা বিদ্যমান যা সম্ভবত সমকালীন সমাজে উক্ত কাল্ট সম্পর্কিত আরাধ্য ধর্মীয় অবয়বের জনপ্রিয়তাকে নির্দেশ করে।[101] এছাড়াও মহাস্থানের গোবিন্দ ভিটায় প্রাপ্ত গুপ্তযুগীয় গোলাকার মৃৎফলকে দম্পতি যুগলের উপস্থাপনা, হরিনারায়নপুর থেকে আবিষ্কৃত বৃহৎ নারী দেহাবয়ব, মহাস্থানের ভাসু বিহার থেকে আবিষ্কৃত প্রানবন্ত অভিব্যক্তি সম্পন্ন অবয়ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি কাল্টের

---

[99] সৈফুদ্দিন চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাপিডিয়া,* ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ভলিউম- ১০, পৃষ্ঠা- ৯৮

[100] সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', পৃষ্ঠা- ৩৬১-৬৩

[101] সৈফুদ্দিন চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', পৃষ্ঠা-৯৯

সাথে সম্পর্কিত অবয়বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এই পর্বে যা সমকালীন বিবর্তিত সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতবাহী বলা চলে। উপরিল্লিখিত অবয়ব ছাড়াও কখনো সন্তান সহযোগে বা সন্তান ছাড়া কিংবা কখনো পশুপক্ষীর ন্যায় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মাতৃকা অবয়বও উপস্থিত ছিল বাংলা তথা উত্তর ও মধ্য ভারতীয় অঞ্চল জুড়ে। এই পর্বের অবয়বগুলির প্রধান শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য হল তার বৃহদায়তন আকৃতি এবং স্বতঃস্ফূর্ত মৌখিক অভিব্যক্তি যা পূর্ববর্তী পর্ব অপেক্ষা এগুলিকে এক ভিন্ন পরিচিতি প্রদান করে। তবে কেবল পোড়ামাটি নয় প্রস্তর ভাস্কর্য নির্মাণ ক্ষেত্রেও এই ধরণের বৃহদায়তন অবয়বের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল বলে মনে করা হয়, অর্থাৎ বলা চলে সার্বিকভাবে ভাস্কর্য নির্মাণ ক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট ধাঁচ অনুসৃত হয়েছিল এই পর্বে।[102]

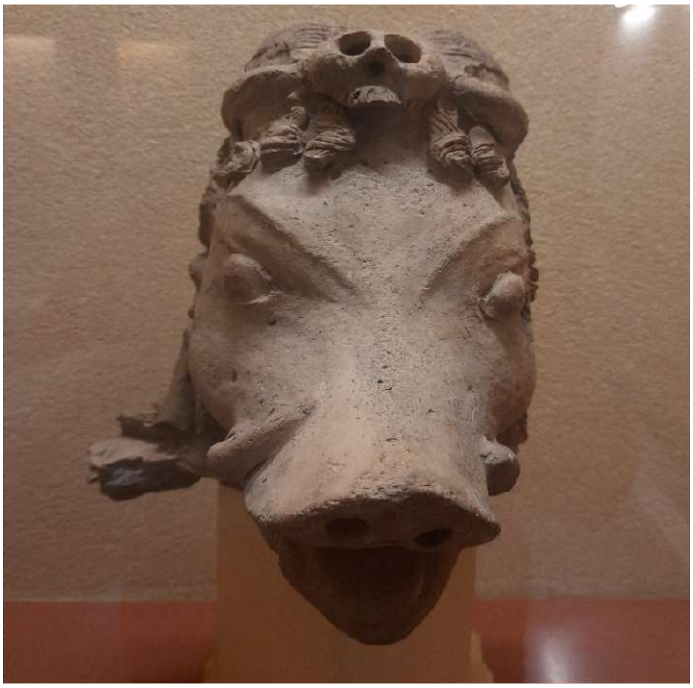

চিত্র-২১ বরাহী মূর্তি, পান্না, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

[102] সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', পৃষ্ঠা- ৩৬১-৬৩

চিত্র-২২ সর্পফণা যুক্ত অবয়ব, মঙ্গলকোট, মহাস্থান সৌজন্যে- মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, মহাস্থান,বগুড়া, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর, ২০২২

২.৪ আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম থেকে খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকঃ

এরপর উল্লেখ্য আনুমানিক অষ্টম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পধারার কথা যা আলোচ্য গবেষণা পত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় রাজনৈতিক তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে বৃহত্তর বাংলার প্রেক্ষাপটে মূলত পাল ও সেন রাজবংশীয় প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় যথাক্রমে খর্গ, রাত, দেব প্রমুখ রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। তবে এই পর্বে দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ব্যাতিত বাংলার পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে মূলত সেক্ষেত্রে পাল ঐতিহ্যের ভূমিকাই সার্বিকভাবে লক্ষণীয়। পোড়ামাটি শিল্পের ক্ষেত্রে এই পর্যায় কিন্তু পূর্ববর্তী সকল ঐতিহ্যের থেকে স্বতন্ত্র, যা তার উপস্থাপন বা বিষয়বস্তু সর্বত্র প্রকাশমান। এই পর্বের আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তার প্রাপ্তিস্থল তথা প্রত্নকেন্দ্রগুলি, যারা মূলত উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল ও উত্তর পশ্চিম বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল। এই পর্যায়ের প্রধান প্রত্নকেন্দ্রগুলি যথাক্রমে, পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার অন্তর্গত জগজ্জীবনপুর, বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর, বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় এবং কুমিল্লা জেলার ময়নামতী[103] অর্থাৎ পূর্ববর্তী দক্ষিণ বঙ্গীয় পোড়ামাটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলির এই পর্যায়ে আর সেভাবে নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছেনা। তবে এই কেন্দ্রগুলি মুখ্যত

[103] সীমা রায় চৌধুরী, ‘টেরাকোটা আর্ট’, পৃষ্ঠা- ৩৬৪

বর্তমান গবেষণা পত্রে আলোচিত হলেও অনুরূপ পর্বেই প্রায় সমরূপ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অনুরূপ মৃৎশিল্পের প্রসার ঘটিয়েছিল অপর দুই বাংলা সংলগ্ন কেন্দ্র, বিহারের অ্যান্টিচক এবং ত্রিপুরার পিলাক। ফলত এই আলোচনায় তাদের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। পাহাড়পুর এবং জগজ্জীবনপুরের বৌদ্ধ স্থাপত্য নির্মাণের সঙ্গে যথাক্রমে পাল রাজা ধর্মপাল ও মহেন্দ্রপালের নাম পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত বর্তমান বিহারের ভাগলপুরে অবস্থিত বিক্রমশীলা মহাবিহার। যার সাথে বিশেষ রূপে উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের নির্মাণ কাঠামোগত বিপুল সামঞ্জস্য বিদ্যমান এবং পাশাপাশি বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্প ঐতিহ্যের অনুরূপ পোড়ামাটি শিল্পের উপস্থিতি লক্ষণীয়।[104] এর সাথেই পোড়ামাটি শিল্পপরিসরে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্রের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় তা হল, বর্তমান দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত পিলাক। এখানে শ্যামসুন্দর টিলায় বঙ্গীয় ধাঁচে বৌদ্ধ স্তূপ এবং তার দেওয়াল গাত্রে নবম-দশম শতকীয় পোড়ামাটি ফলকের উপস্থিতির সন্ধান পাওয়া যায়।[105] বিশেষ রূপে এখানকার অবয়বের মৌখিক অভিব্যাক্তি থেকে বাংলার ময়নামতী অঞ্চলের অবয়বের সামঞ্জস্য রয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে।[106] একদিকে উপরিল্লখিত শ্যামসুন্দর টিলায় পাহাড়পুরের সমরূপ ক্রুশিফর্ম স্থাপত্য কাঠামো থেকে তা সম্ভবত পাল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল বলে মনে করা হয়। অপরদিকে ত্রিপুরা রাজ্যটি উত্তর, দক্ষিন ও পশ্চিমে অধুনা বাংলাদেশের বর্ডার[107] দ্বারা পরিবৃত এবং অনুমান করা হয় ত্রিপুরার অন্যতম বৌদ্ধ কেন্দ্র বক্সানগর অঞ্চলটি সম্ভবত বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত সমতট-হরিকেল(কুমিল্লা) অঞ্চলের খর্গ রাজবংশীয়দের অধীন ছিল, যারা ৭ম-৮ম শতকে কুমিল্লার নিকটবর্তী রাজধানী কেন্দ্র থেকে রাজশাসন করেছিল।[108] সুতরাং বাংলার ইতিহাস থেকে কিন্তু এই অঞ্চলকে কখনোই বাদ দেওয়া

---

[104] রজত স্যান্যাল, 'অ্যান্টিচক', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, ভলিউম-১, পৃষ্ঠা ১৩৮

[105] এস.জামাল হাসান, 'বুদ্ধিস্ট রিমেন্স ইন ত্রিপুরা', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,* ভলিউম- ৭, ঢাকা, আই সি এস বি এ, ২০০২, পৃষ্ঠা- ২২৯

[106] সুচন্দ্রা ঘোষ, 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ সাইটঃ কেস স্টাডি অফ ময়নামতী ইন সাউথ ইস্টার্ন বাংলাদেশ', মোকাম্মল হোসেন ভূঁইয়া সম্পাদিত, *স্টাডিস ইন সাউথ এশিয়ান হেরিটেজ,* পৃষ্ঠা- ৩১৩

[107] এস.জামাল হাসান, 'বুদ্ধিস্ট রিমেন্স ইন ত্রিপুরা', পৃষ্ঠা- ২২৩

[108] এস.জামাল হাসান, 'বুদ্ধিস্ট রিমেন্স ইন ত্রিপুরা', পৃষ্ঠা- ২৩৪

চলেনা, বরং প্রাচীন বাংলার সাথে এক গভীর সংযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যা খুব স্বাভাবিক নিয়মেই তার শিল্পঐতিহ্যেকে প্রভাবিত করেছিল বলা বাহুল্য। যেহেতু পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মূলত এই পর্বের পোড়ামাটি শিল্পঐতিহ্যের বিভিন্ন পরিসরকে কেন্দ্র করে বিস্তীর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে এবং স্বল্প পরিসরে একত্রে সব কিছু তুলে ধরাও সম্ভবপর নয় ফলত এই অধ্যায়ে আপাতত কেবলমাত্র বাংলায় এই সময়কালীন বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পের পরিচিতি সংক্রান্ত অতি সংক্ষিপ্ত আভাষ দেওয়া হবে।

এই পর্যায়ে পোড়ামাটি শিল্পধারা বলতে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তা হল দেওয়াল গাত্রে সারি সারি প্রাণবন্ত পোড়ামাটি ফলকের উপস্থিতি। হ্যাঁ, আলোচ্য পর্যায়ে বাংলায় পোড়ামাটি শিল্পের প্রসার ঘটেছিল মূখ্যত বিবিধ বৌদ্ধ বিহারের দেওয়াল গাত্রে স্থাপত্যিক অলংকরণের অঙ্গ রূপে।(চিত্র-২৩ক,২৩খ) ক্ষেত্র বিশেষে ব্রাহ্মণ্য মন্দির গাত্রেও তা লক্ষণীয়। বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আদি ঐতিহাসিক পর্বের টেরাকোটা অবয়বের সময়কাল নির্ধারন যে সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছিল, এই পর্ব তা থেকে ভিন্ন। কেননা যেহেতু নির্দিষ্ট স্থাপত্যিক নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই শিল্পধারার উপস্থাপন হয়েছিল, ফলে উৎখননে মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক স্তর বা অবস্থানেই ফলকগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে যা খানিকটা তাদের সঠিক সময়সীমা নির্ধারণের সহায়ক।

চিত্র ২৩ক- পাহাড়পুর (সোমপুর) বৌদ্ধবিহার গাত্রে পোড়ামাটির ফলকচিত্র, সৌজন্যে- পাহাড়পুর, বাংলাদেশ, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর, ২০২২

চিত্র-২৩খ বৌদ্ধবিহার গাত্রে উৎকীর্ণ পোড়ামাটি ফলক, বিক্রমশীলা মহাবিহার, অ্যান্টিচক,বিহার, সৌজন্যে- সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত, জানুয়ারি ২০২০

এই পর্বে প্রায় সমস্ত কেন্দ্রেই পোড়ামাটি ফলকে উপস্থাপিত অন্যতম বিষয়বস্তু হল ধর্মীয় অবয়ব যার মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ্য (শিব, গনেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য, কৃষ্ণের জীবনকাহিনীর দৃশ্য) ও বৌদ্ধ (বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তারা, মঞ্জুশ্রী) উভয় ধর্মের সাথে সম্পর্কিত দেবদেবী অবয়বের উপস্থিতি। পাশাপাশি লক্ষ করা যায় গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, কীর্তিমুখ, নাগ প্রভৃতি অর্ধ-ঐশ্বরিক অবয়বের উপস্থাপনা। উপরিল্লিখিত চারটি প্রত্নকেন্দ্রেই কম বেশি এই শ্রেণীর অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও কিছু বৌদ্ধ প্রতীক সম্পন্ন অবয়ব যথা- ধর্মচক্র, পদ্ম প্রভৃতি যেমন রয়েছে সর্বত্র তেমনই জগজ্জীবনপুরের প্রস্ফুটিত পদ্মে বস্ত্র জড়ানো গ্রন্থ তথা বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রজ্ঞা-পারমিতার[109] (চিত্র-২৪) উপস্থিতির অনুমান করা হয়ে থাকে যা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

[109] অমল রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশন রিপোর্ট,* ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা- ৯৪

আবার সর্বত্রই বিচিত্র ও দক্ষ শৈল্পিক ভঙ্গীতে প্রতিফলিত রয়েছে বিবিধ পশু পাখি যেমন- হরিণ, হাতি, মোষ, সিংহ, বাঁদর, বেজী, কচ্ছপ, হাঁস, ময়ূর প্রভৃতি। সাধারণ পশু পক্ষী অবয়বের পাশাপাশি কিছু গতিময় অবয়ব এবং কিছু সংযুক্ত বা কাল্পনিক পশু উপস্থাপনও লক্ষণীয় প্রায় সকল প্রত্নস্থলেই। যেমন উদাহরণ স্বরূপ ময়নামতীতে প্রাপ্ত এক মস্তক বিশিষ্ট যুগল সিংহ বা পশ্চাৎ অভিমুখে তাকানো মোষ,(চিত্র-২৫) হরিণের প্রাণবন্ত উপস্থাপন[110] আবার পাহাড়পুরের মনুষ্য মস্তকে পশুদেহের উপস্থাপনা কিংবা ছাগলের মস্তকে বাঘের দেহ উপস্থাপনা প্রভৃতি[111] বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৪

২৫

চিত্র ২৪ - প্রস্ফুটিত পদ্মে উপস্থাপিত পুঁথি (প্রজ্ঞা-পারমিতা?), জগজ্জীবনপুর, সৌজন্যে-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, ডিসেম্বর, ২০২৪
চিত্র- ২৫ পশ্চাৎ অভিমুখে তাকানো মহিষ, ময়নামতী, সৌজন্যে সায়নী রায়, ময়নামতী জাদুঘর, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর, ২০২২

[110] শরমীন আখতার, 'ময়নামতি-লালমাই প্রত্নস্থলের পোড়ামাটির ফলকচিত্রে সমতট অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা', *প্রত্নতত্ত্ব*, জার্নাল অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ভলিউম-১৭,জুন ২০১১, পৃষ্ঠা-৮২

[111] রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর, বেঙ্গল, মেমোয়ার্স অফ দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া,* নং- ৫৫ , দ্য ডিরেক্টর জেনারেল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, জনপথ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৬৩

এই পর্বে প্রায় সকল প্রত্নকেন্দ্রে অন্যতম লক্ষণীয় উপস্থাপন হল অস্ত্রশস্ত্র সহ যোদ্ধা বা সৈনিক এর উপস্থাপন। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জগজ্জীবনপুরের কথা, এই কেন্দ্রে প্রায় ৩৮৭ টি প্রাপ্ত ফলকের মধ্যে ১৫০ টি তেই এই যোদ্ধা বা সৈনিকের অবয়ব লক্ষণীয়; এবং সকল ফলকে হাতে ঢাল, তরোয়াল, তীর-ধনুক, গদা প্রভৃতি লক্ষণীয়।[112] তবে শুধু জগজ্জীবনপুর নয় পাহাড়পুর, বিক্রমশীলা, ময়নামতী সর্বত্রই বিভিন্ন ভঙ্গীতে অস্ত্রশস্ত্র সহ যুদ্ধরত অবস্থায় যোদ্ধার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

পাশাপাশি রয়েছে বর্ণনামূলক বা কাহিনী সম্বলিত পোড়ামাটি ফলকের উপস্থাপনা, ইতিপূর্বে আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে যার উপস্থিতি নিতান্তই সীমিত। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা চলে মহাস্থানের পলাশবাড়ি নামক কেন্দ্রের কথা, যেখানে রামায়নের আদিকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের কাহিনী উপস্থাপন লক্ষ করা যায়।[113] পরবর্তী অন্যান্য অধ্যায়ে এই কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আবার পাহাড়পুরে দুই তপস্বী ব্যাক্তি হাতে তীর ধনুক সহকারে উপস্থাপন থেকে তাকে রাম ও লক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয়[114] রূপে অনুমান করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রেই পঞ্চতন্ত্র, জাতক প্রভৃতি সাহিত্য রচনার নানা অংশ পোড়ামাটি শিল্পীরা তাঁদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনমানসে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি সাধারন মানুষের দৈনন্দিন জনজীবনের নানা দৃশ্য, বিনোদন,(চিত্র-২৬) ক্রীড়া প্রভৃতি ও অত্যন্ত নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন সমকালীন শিল্পীরা যা আলোচ্য পর্বে বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারার অন্যতম বিশেষত্ব। বাংলায় পোড়ামাটি শিল্পধারায় মোটামুটিভাবে যে ধরণের অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় আলোচ্য কালপর্বে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা প্রদানের প্রয়াস করা হল যারা স্ব-মহিমায় সমৃদ্ধ করে বাংলার পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসকে।

---

[112] অমল রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশন রিপোর্ট*, পৃষ্ঠা- ৯১-৯৩

[113] আফরোজ আকমাম – *মহাস্থান*, ঢাকা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৮৪

[114] রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর*, পৃষ্ঠা- ৬০

চিত্র-২৬ ঢোল বাদক, পিলাক- ত্রিপুরা, সৌজন্যে- সুব্রত দে, ‘টেরাকোটা প্লাকস অফ পিলাক’ ইন *ত্রিপুরাঃ এ হিডেন কালচারাল হেরিটেজ,* জার্নাল অফ মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্টাডিস ইন আর্কিওলজি ৭, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৯৪৯

তবে আলোচ্য পরিসরে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল আদি মধ্য যুগীয় পর্বে বাংলার এই মৃৎশিল্প যে কেবলই উপরিল্লিখিত আলোচ্য পরিসরের মধ্যে সীমিত ছিল তা নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাংলার এই পোড়ামাটি শিল্পধারার ন্যায় অনুরূপ পোড়ামাটি শিল্পশৈলীর প্রসার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মূলত পাগানে (মধ্য মায়ানমার) প্রসার লাভ করেছিল। বর্তমানে পাগানে প্যাগোডা, মন্দির, বিহার, ভূগর্ভস্থ গুহা, একক অবয়ব/কাঠামো, ধর্মীয় গ্রন্থাবলী সংরক্ষণ ভবন প্রভৃতি সবকিছু মিলিয়ে প্রায় ২২৩০ বা ততোধিক স্থাপত্য রয়েছে। যেখানে প্যাগোডা এবং মন্দিরগুলির বহির্ভাগ বাংলার বৌদ্ধবিহারের অনুকরণে পোড়ামাটি অবয়ব দ্বারা অলংকৃত, শুধু তাই নয় অন্যান্য নানান স্থাপত্যগুলিতেও নানা ভঙ্গীতে পোড়ামাটি শিল্পের বিপুল উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। যেখানে বঙ্গীয় কেন্দ্রের মতই বিষয়বস্তু হিসেবে সমকালীন মায়ানমারের সাধারণ মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক, অলংকার, শিকার দৃশ্য, জাতকের নানা কাহিনী (চিত্র-২৭) প্রভৃতির উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়।[115] যা থেকে উভয় অঞ্চলের পারস্পরিক সংযোগ বা সমন্বয় ক্ষেত্রের আভাষ পাওয়া যায়।

---

[115] বিনয় কুমার রাও, 'দ্য টেরাকোটা প্লাকস অফ পাগানঃ ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড বার্মিস ইনোভেশনস্', *এনসিয়েন্ট এশিয়া* ৪, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬-৯, DOI://dx.doi.org/10.5334/aa.12310

Fig. 8: Lakkhana Jātaka, Shwezigon Pagoda, Pagan, Myanmar.

চিত্র-২৭ লক্ষন জাতক, পাগান, মায়ানমার, সৌজন্যে- বিনয় কুমার রাও, 'দ্য টেরাকোটা প্লাকস অফ পাগানঃ ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড বার্মিস ইনোভেশনস্', *এনসিয়েন্ট এশিয়া* ৪, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৭

আপাতভাবে বলা যায় এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বাংলা ও মায়ানমারের ভৌগোলিক পরিসর, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, বাণিজ্যিক সংযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি। এই মৃৎশিল্প ধারা মূলত বাংলা বা পূর্ব ভারতীয় অংশ থেকে উক্ত অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাগান এর সাথে বোধগয়ার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল বৌদ্ধধর্মের সূত্রে এবং উক্ত অঞ্চল থেকে বোধগয়া যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের বাংলা ভূখণ্ড অতিক্রম করতে হত।[116] ফলত এক শিল্প সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের পরিসর তৈরি হয়েছিল অনুমান করাই যায়। আবার সুদূর আদি ঐতিহাসিক পর্ব থেকেই বাংলার সাথে একাধিক স্থলপথ ও জলপথের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগ বিদ্যমান ছিল যার মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। উক্ত পথে বণিক ও বাণিজ্যিক পণ্যের সাথে শিল্প সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও যে আদানপ্রদান ঘটেছিল তার অনুমান করা

[116] বিজয় কুমার রাও, 'দ্য টেরাকোটা প্লাকস অফ পাগানঃ ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড বার্মিস ইনোভেশনস্', *এনসিয়েন্ট এশিয়া,* ৪: ৭, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬

চলে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন বাংলার সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কের অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল ঘোড়ার ব্যবসা। মধ্য এশিয়ার ফরগনা ছিল ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত, ভারতের উত্তর-পশ্চিমের কুষান বণিকরা উক্ত অঞ্চল থেকে ভারতে ঘোড়া আমদানি করে তা আবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে যেত এবং যেসকল বন্দরের মধ্য দিয়ে সমুদ্রপথে ঘোড়া বিদেশে নিয়ে যাওয়া হত তার মধ্যে সম্ভবত তমলুক বা গাঙ্গে বন্দর ছিল অন্যতম।[117] অর্থাৎ উক্ত পর্ব থেকেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে বাংলার ঘনিষ্ট সংযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বর্তমান আলোচনা যেহেতু প্রধানত আদি মধ্য যুগ কেন্দ্রিক সেক্ষেত্রে দেখা যায়, মোটামুটি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের পর বাংলা বিশেষত দক্ষিণ পূর্ব বাংলা অর্থাৎ সমতট হরিকেল অঞ্চলের সাথে দঃ পূঃ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সংযোগ ছিল।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও বানিজ্যিক প্রসার এক্ষেত্রে প্রায় সম্পর্কিত, যেহেতু তা বানিজ্যিক কর্মকান্ডের সমর্থক ছিল। ফলত বানিজ্যিক পথগুলির মাধ্যমে খুব সহজেই আদি মধ্য যুগীয় বাংলা ও বিহার অঞ্চলের মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং তৎসম্পর্কিত বিবিধ নিদর্শন ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে তথা শ্রীলঙ্কা, চীন, তিব্বত প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রসার লাভ করেছিল এবং সেক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া।[118] বঙ্গীয় পরিসরে একাধিক নদনদী সংযোগ মাধ্যমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের উপস্থিতি বাংলার সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বিবিধ সাংস্কৃতিক সংযোগের সুযোগ করে দিয়েছিল। একাধিক স্থলপথ ও জলপথের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, অনুমান করা সম্ভব উক্ত বিভিন্ন পথেই অন্যান্য বিভিন্ন আদর্শ বা বস্তুগত উপাদানের পাশাপাশি মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যও বাংলা থেকে উক্ত অঞ্চলে গমন করেছিল। চাংক-কিয়েন (১২৬ খ্রি.পূ), শাং-চি(৪২০-৪৭৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং কিয়া-তান (৭৮৫-৮০৫ খ্রিস্টাব্দ) টনকিন (Tonkin) থেকে কামরূপ পর্যন্ত একটি স্থলপথের নির্দেশ দেন, যা করতোয়া নদী অতিক্রম করে উত্তর বঙ্গের পাশ দিয়ে দক্ষিণ বিহারের গঙ্গার দিকে প্রবেশ করেছে। আবার অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশ বা সমতট অঞ্চল থেকে সুরমা ও কাছার উপত্যকা, লুসাই পর্বত, মনিপুর এবং

---

[117] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ বাংলা ও ভারত*, কলকাতা, প্রগ্রেশিভ পাবলিশার্স, ২০০০,প্রথম প্রকাশ পৃষ্ঠা- ২০-২১

[118] সুচন্দ্রা ঘোষ, 'বুদ্ধিস্ট কালচারাল লিংকেজেস বিটুইন বেঙ্গল অ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ২ (বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮) পৃষ্ঠা- ৬৪৮-৬৪৯

উত্তর মায়ানমার হয়ে মধ্য মায়ানমারের পাগান পর্যন্ত অপর এক স্থলপথের কথা জানা যায়।[119] ফলত আদি মধ্য যুগীয় পর্বে বাংলা ও বিহারের বাংলার মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলির সাথে পাগান এর সংযোগের সূত্র সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেবল টেরাকোটাই নয়, অন্যান্য স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের নিরিখেও এই সংযোগের আভাষ মেলে যথা বাংলার প্রস্তর ভাস্কর্যের অনুরূপ প্রতীকী সম্বলিত ম্যুরাল এবং প্রস্তর ভাস্কর্য পরিলক্ষিত হয় বাগান এ।[120] আবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রাপ্ত ধাতব অবয়বের সাথে নালন্দা বা অনুরূপ পাল ভাস্কর্যের সাদৃশ্য মেলে আবার ময়নামতি চিটাগাং অঞ্চলের ঝিওয়ারি ব্রোঞ্জ অবয়ব জাভা, মায়ানমার বা দক্ষিণ থাইল্যান্ডের ধাতব মূর্তি নির্মাণ কে প্রভাবিত করেছিল বলে অনুমিত হয়। পাশাপাশি আলোচ্য পর্বে বাংলার ক্রুশাকৃতি বৌদ্ধ বিহারের অনুরূপ কাঠামো পরিলক্ষিত হয় জাভার বিভিন্ন অংশে। আবার আদি মধ্য যুগীয় বাংলার স্থাপত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে পাওয়া যায় ষ্টাকো, পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে এই সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে, বাংলার মোগলমারির প্রায় অনুরূপ ষ্টাকো ভাস্কর্যের সন্ধান মেলে জাভার বতুজায়া থেকে।[121] আবার অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা ঘোষ আচার অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্যের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রাপ্ত একাধিক মৃৎ ট্যাবলেট এর নিরিখে। থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়া থেকে প্রাপ্ত উক্ত ট্যাবলেট এ অষ্ট বুদ্ধের উপাসনার ইঙ্গিত রয়েছে যার অনুরূপ ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায় বাংলা-বিহার অঞ্চলে।[122] এরূপ আরও অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। ফলত বিভিন্ন পরিসর থেকেই আদি মধ্যযুগীয় বাংলার সাথে সমকালীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ঘনিষ্ট সংযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং খুব স্বাভাবিক রূপেই টেরাকোটা ছিল তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধু ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক নয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নানান প্রেক্ষিত থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগের সন্ধান কিন্তু মেলে।[123]

---

[119] আকসাদুল আলম, বেঙ্গল অ্যান্ড সাউথ ইষ্ট এশিয়াঃ কমার্শিয়াল অ্যান্ড কালচারাল লিঙ্কেজেস, পৃষ্ঠা- ৬২৪-৬২৬

[120] ক্লদিন বটজ পিক্রন, ‘ইমেজেস অফ ডিভোশন অ্যান্ড পাওয়ার ইন সাউথ অ্যান্ড সাউথইস্ট বেঙ্গল’, *ইসোটেরিক বুদ্ধিসম ইন মিডিএভাল মেরিটাইম এশিয়া*, সিঙ্গাপুর, আই এস ই এ এস প্রেস, পৃষ্ঠা- ১৬৬

[121] সুচন্দ্রা ঘোষ, ‘বুদ্ধিস্ট কালচারাল লিংকেজেস বিটুইন বেঙ্গল অ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া’, পৃষ্ঠা- ৬৫২

[122] সুচন্দ্রা ঘোষ, ‘বুদ্ধিস্ট কালচারাল লিংকেজেস বিটুইন বেঙ্গল অ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া’, পৃষ্ঠা- ৬৫৫

[123] রিওসোকে ফুরুই, *ল্যান্ড অ্যান্ড সোসাইটি ইন আর্লি সাউথ এশিয়া, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ৪০০-১২৫০ এ ডি*, (নিউ ইয়র্ক, রুতলেজ পাবলিকেশন, ২০২০) পৃষ্ঠা- ৩৩-৩৫

⇨ আলোচনা শেষে বলা যায় অদ্যাবধি সমগ্র প্রাচীন বাংলা ও সন্নিহিত অঞ্চলের দীর্ঘকালীন পোড়ামাটি শিল্পের ক্রমান্বয়িক বিকাশ সম্পর্কে আভাষ দেওয়ার প্রয়াস করা হল উপরিল্লিখিত অংশে। যদিও বর্তমান গবেষণা পত্রটির প্রধান উপজীব্য বিষয়বস্তু আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতকীয় কালপর্বে বিকশিত বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলায় পোড়ামাটি শিল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যথাযথ অনুধাবন না করলে উক্ত নির্ধারিত পর্বের শিল্পধারা এবং তার সাথে সম্পৃক্ত ইতিহাসের যথার্থ বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় প্রায়-ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে শুরু করে আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতক অর্থাৎ সমগ্র প্রথম সহস্রাব্দ ব্যাপী বঙ্গীয় পরিসরে পোড়ামাটি শিল্প ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। যা বাংলার সাধারণ মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। দীর্ঘকাল ধরে স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন আঙ্গিকে মানুষের বিশ্বাস, মঙ্গলচেতনা তথা ধর্মীয় চেতনা জনিত অবয়বের যেমন বিকাশ ঘটেছে তেমনই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ, পেশা, বিনোদন,দাম্পত্য বা মিথুন দৃশ্য, প্রচলিত লোককাহিনী বা পৌরাণিক কাহিনীর দৃশ্য তথা দৈনন্দিন জনজীবনের নানান দৃশ্য প্রস্ফুটিত হয়েছে বাংলার পোড়ামাটি শিল্পীদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। উপরিউক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে এও স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় যে প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটি শিল্প বলতে কিন্তু তা কোনও এক নির্দিষ্ট শিল্প ঐতিহ্যকে নির্দেশ করেনা, এক্ষেত্রে একাদিক ধারার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। আদি ঐতিহাসিক পর্বের ছোট বা মাঝারি আকৃতির পোড়ামাটির একক ফলক ক্রমে গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর যুগে ত্রিমাত্রিক বড় অবয়বে রূপান্তরকরণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে ক্রমে পাল-দেব যুগের বৃহৎ মৃৎ-ফলকের প্যানেল রূপে ধর্মীয় স্থাপত্যিক অলংকরণে উপস্থাপিত হয়েছে; অর্থাৎ এক সুস্পষ্ট শৈল্পিক বিবর্তনের সাক্ষ্য পাওয়া যায় বাংলার মৃৎশিল্প চর্চার ইতিহাসে যার পশ্চাতে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসর নিহিত রয়েছে যার অনুসন্ধান করা হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। বিচিত্র শৈলী, কারিগরী, অঙ্গসৌষ্ঠব, বিচিত্র বিষয়াদির উপস্থাপনা ও যুগের ব্যবধানে তার ক্রমবিকাশ এই শিল্পকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। পাশাপাশি বলা যায়, বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর সারল্য। আদি ঐতিহাসিক পর্বের চন্দ্রকেতুগড়-তমলুক হোক কিংবা আদি মধ্যযুগীয় পাহাড়পুর-জগজ্জীবনপুরের পোড়ামাটি অবয়ব, উপস্থাপিত বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক লক্ষ করলে

খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় তা বঙ্গীয় পরিসরে বিকশিত অন্যান্য শিল্পধারা যথা প্রস্তর শিল্প বা ধাতব অবয়বের ন্যায় প্রথাগত কঠোর প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রের অনুসারী নয়। শিল্পশাস্ত্রের প্রতিমাবিদ্যাচর্চা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রতিমার নির্দিষ্ট আসন, আয়ূধ, আভরণ, মুদ্রা প্রভৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু এই বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্প কিন্তু উক্ত প্রবণতার অনুসরণকারী নয়। এক্ষেত্রে কোন পৃথক অবয়বের নির্দিষ্ট রূপ, আঙ্গিক যে সর্বত্র একইভাবে পরিলক্ষিত এমনটা নয়, মূল আদর্শ বা বিষয়বস্তু আরোপিত থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে তার উপস্থাপনা লক্ষণীয়। এই বক্তব্যের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আদি ঐতিহাসিক পর্বের পোড়ামাটি অবয়বের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে মানুষের সহজ সরল প্রাথমিক বিশ্বাস বা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ। অনুমান করা চলে নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্প্রদায়ের বাইরে মূলত উর্বরতা বা প্রজনন স্বত্তা তথা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা যার মূলে রয়েছে আদতে সমৃদ্ধি বা মঙ্গলময়তার আকাঙ্ক্ষা উক্ত প্রেক্ষিত থেকে সম্পদের দেবী (শ্রীলক্ষ্মী), ধান্যদেবী, লজ্জাগৌরীর ন্যায় অবয়বের বিকাশ ঘটেছে। যদিও গুপ্ত পর্বে এই শিল্প কিছুটা সমকালীন ধ্রুপদী শিল্প তথা প্রস্তর শিল্পধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল এবং পাশাপাশি উপস্থাপিত বিষয়বস্তুও বহুলাংশে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে এস এস বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন, সম্ভবত পরিবর্তিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জনগণের চাহিদা পূরণে এ ধরণের অবয়বের উপস্থাপনা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শিল্পীরও সৃজনশীলতা সীমিত হয়ে পড়েছিল ফলস্বরূপ পোড়ামাটি শিল্পে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষিতের খানিক অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় এই পর্বে।[124] কিন্তু টেরাকোটা শিল্প পুনরায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে গুপ্তোত্তর অধ্যায়েই মহাস্থান, পাহাড়পুর, জগজ্জীবনপুর, ময়নামতী, পিলাক, অ্যান্টিচক প্রভৃতি কেন্দ্রের পোড়ামাটি শিল্পের মধ্য দিয়ে যার বিশেষত্বই হল সহজ সরল ভঙ্গীতে স্থানীয় সামাজিক উপাদানের উপস্থিতি। সুতরাং সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বলা চলে সার্বিকভাবে কালের ব্যবধানে সকল বিধি নিষেধের ঊর্ধ্বে সমাজের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ও সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্মিত ছিল বাংলার এই পোড়ামাটি শিল্প যেখানে তাদের চিন্তন, প্রয়োজনীয়তা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে এবং ফলস্বরূপ তা এই শিল্প অবয়বগুলিকে অনেক বেশী গতিময় ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। পাশাপাশি এক বৃহত্তর ভৌগলিক পরিসরে প্রায় অনুরূপ মৃৎ ভাস্কর্যের উপস্থিতি সমকালীন কালপর্যায়ে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এক নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বলয়ের আভাষ দেয়। তাহলে অনুমান করা চলে উক্ত পর্বে

[124] এস এস বিশ্বাস, *টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল*, পৃষ্ঠা– ১৮

বাংলার মৃৎশিল্পে এক নির্দিষ্ট শিল্পও বা ভাস্কর্য ঘরানার উদ্ভব ঘটেছিল? এজাতীয় প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সংশয়াত্মক হলেও আদি মধ্যযুগীয় বাংলার টেরাকোটা শিল্পক্ষেত্রে যে এক সাধারণ শিল্পশৈলী অনুসৃত হয়েছিল যা স্থানীয় বৈচিত্র্যকে এক বৃহৎ শিল্প ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত করে এক নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প: ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচিত প্রত্নকেন্দ্রসমূহ

প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার নিরিখে দেখা গেছে, বঙ্গীয় পরিসরে এক দীর্ঘকালীন (আনুমানিক তৃতীয়-দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ) শিল্পঐতিহ্য রূপে সমৃদ্ধ মৃৎশিল্প বিদ্যমান ছিল। তবে খুব স্বভাবতই এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী বিকশিত শিল্পধারাকে একত্রে বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়, ফলত আলোচ্য গবেষণা পত্রটির মূল বিষয়বস্তু হিসেবে মূলত আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ- দ্বাদশ শতকীয় বাংলার মৃৎশিল্প ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে। কিন্তু এই ধরণের আলোচনার শুরুতেই বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসে, যথা- বাংলায় এই শিল্পের ক্রমবিকাশ ও ধারাবাহিক প্রবহমানতার পশ্চাতে নিহিত শর্ত বা সম্ভাবনাগুলি কি কি? অর্থাৎ আলোচ্য পর্বে বাংলায় কোন প্রেক্ষাপটে বা কেন নির্দিষ্ট ধাঁচে মৃৎশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটছে তার বিশ্লেষণ আলোচ্য পরিসরে তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিসর কতখানি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে? পাশাপাশি বাংলায় এই শিল্পের প্রাপ্তিস্থল গুলির চরিত্র কিরূপ? এসকল প্রশ্নের অনুসন্ধান প্রয়োজন, তবেই একাধারে সমকালীন সমাজব্যবস্থায় মৃৎশিল্পের অবস্থান এবং অন্যদিকে মৃৎশিল্পের মধ্য দিয়ে সন্নিহিত সমাজ ইতিহাসের অনুধাবন সম্ভব। আর সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান অধ্যায়টিতে একাধারে বাংলার ভৌগোলিক বা ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ, মৃত্তিকা, নদনদী সংক্রান্ত পরিকাঠামো প্রভৃতি সহ সংক্ষেপে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক-সামাজিক পরিসরের উপস্থাপন এর পাশাপাশি বাংলার পোড়ামাটি শিল্প সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচিতি প্রদানের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে যে সময়পর্ব কেন্দ্রিক এই আলোচনা, বাংলার ইতিহাসে তার অন্যতম বিশেষত্বই হল বিপুল প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের উপস্থিতি। এই পর্বেই বাংলায় অসংখ্য তাম্রফলক, শিলালিপি, মৃৎপাত্র, প্রস্তর ভাস্কর্য প্রভৃতি আরও একাধিক উপাদানের উপস্থিতি পাই, বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে যার অবদান সর্বাধিক। সর্বোপরি বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্র থেকে অসংখ্য মৃৎ-উপকরণ পাওয়া যায়, যা বর্তমান গবেষণা পত্রটির মূল বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে এই মৃৎশিল্প সম্পর্কে বিস্তীর্ণ আলোচনা করা হবে।

এই অধ্যায়টিকে প্রধানত দুটি পর্বে রূপবিন্যাশ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে বাংলার সার্বিক ভৌগোলিক পরিসর উল্লেখ সহ বাংলায় এই মৃৎশিল্প বিকাশের পশ্চাতে নিহিত ভৌগোলিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বা সম্ভাব্য অনুঘটকগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রধানত আলোচ্য সময়পর্বে টেরাকোটা শিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলির ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে।

১. বাংলার মৃৎশিল্প বিকাশে সন্নিহিত ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটঃ

যেকোনো অঞ্চল, মানুষ, ধর্ম, শিল্প, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সবকিছুর প্রকৃত ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হলে তার যথার্থ ভৌগোলিক অবস্থান বা পরিসর সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। ফলত আলোচ্য মৃৎশিল্প ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত সামাজিক ইতিহাসের সূক্ষ্ম ধারাগুলিকে বিশ্লেষণের পূর্বে যে সার্বিক ভৌগোলিক পরিসর বা প্রেক্ষাপটে তা গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় প্রদান আবশ্যক কেননা যে কোনও শিল্প ঐতিহ্য বিকাশের পরিবেশই তার চরিত্র নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট ইতিহাস বিশ্লেষণে অন্যতম প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করে থাকে। সার্বিকভাবে বলা যায়, মানুষের যেকোনো পার্থিব কর্মকাণ্ড যেহেতু নির্দিষ্ট ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সংঘটিত হয়, ফলত খুব স্বাভাবিক নিয়মেই উক্ত প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের পরিকাঠামো নির্মাণ করে।[125] মানবসভ্যতা বিকাশের যেকোনও পর্বেই মানুষ সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক পরিকাঠামো বা শর্ত অনুসারে মানিয়ে চলার চেষ্টা করে এবং সেই অনুযায়ীই সংশ্লিষ্ট সমাজ সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে একদা মানুষের জীবনযাত্রা ছিল শিকার ও সংগ্রহকেন্দ্রিক অর্থাৎ তারা বিবিধ ফলমূল সংগ্রহ ও জীবজন্তু শিকার দ্বারা তাদের ক্ষুদা নিবৃত্তি করত। ফলত দেখা যায় প্রস্তর যুগীয় বিবিধ পুরাকেন্দ্রগুলিও এমন জায়গাতেই গড়ে উঠেছিল যেখানে পানীয় জল ও খাদ্য উপাদান এর যথার্থ উৎস ছিল।[126] উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় মধ্যপ্রদেশের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ গুহাকেন্দ্র ভীমভেটকার কথা, যেখানে দেখা যায় পানীয় জল এর একাধিক প্রাকৃতিক উৎস সহ নানান মাছ, বিবিধ পশু এবং প্রায় ত্রিশ প্রকার

---

[125] আব্দুল মোমিন চৌধুরী, আকসাদুল আলম- ‘হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি’, ইন *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা- ১

[126] রোমিলা থাপার, *দ্য পেঙ্গুইন হিস্ট্রি অফ আর্লি ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য অরিজিন টু এ ডি ১৩০০,* নিউ দিল্লী, পেঙ্গুইন বুকস, ২০০২, পৃষ্ঠা- ৭১-৭২

খাদ্যযোগ্য শাকসবজি, ফলমূলের গাছের অস্তিত্ব ছিল যা তাদের খাবারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করত।[127] এই উদাহরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যেকোনো নির্দিষ্ট সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক পরিকাঠামো ও শর্তের উপর। সেকারণে প্রথমেই বাংলার স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিকাঠামো অনুধাবন প্রয়োজন কেননা উক্ত প্রেক্ষাপটেই নির্দিষ্ট শিল্প বা তার সাথে সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক ইতিহাস সংঘটিত হয়েছে।

নীহার রঞ্জন রায় যথার্থই বলেছেন, যেকোনো স্থান বা দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা এবং ভৌগোলিক বিস্তৃতি সর্বদা এক নাও হতে পারে, তা পরিবর্তনশীল। শাসনকার্যের সুবিদার্থে বা অন্য নানাবিধ কারনে রাষ্ট্রীয় সীমানা পরিবর্তিত হয়। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়, ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক অঞ্চল হিসেবে এর সীমানার পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্বে।[128] তবে বিভিন্ন সময়ে সীমা হ্রাসবৃদ্ধি হওয়ার দরুন এই সমগ্র দেশের সীমানা যথার্থ ভাবে নির্ধারণ করা যায়না। মুসলিম যুগেই প্রথম এই সকল অঞ্চল একত্রে 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয় যা থেকে ব্রিটিশরা 'বেঙ্গলা' (Bengala) বা 'বেঙ্গল' (Bengal) নামের উৎপত্তি ঘটান। অর্থাৎ বর্তমানের 'বেঙ্গল' নামটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন ব্রিটিশরা,[129] ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সূত্রে আজ বাঙালি ২টি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিসরে অধিষ্ঠিত; ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অপর দিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে তথা অধুনা বাংলাদেশে। যদিও ইতিপূর্বে কিছু প্রাচীন সাহিত্যাবলী যথা 'ঐতরেয় আরণ্যক'[130], 'বৌধায়ন ধর্মসূত্র'[131], কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'[132] নানাভাবে বাংলা বা বঙ্গ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বৈদেশিক উপাদান যথা- গ্রীক বর্ণনায় বাংলায় রাজতন্ত্রের পরিচয় মেলে 'গঙ্গারাষ্ট্রের' বিবরণীর মধ্য দিয়ে; খ্রিষ্টীয় ৩য় শতকের চীনা গ্রন্থ 'উই-ল্যু' – এ ইঙ্গিত রয়েছে যে এই

---

[127] উপিন্দর সিং, *এ হিস্ট্রি অফ এনসিয়েন্ট অ্যান্ড আর্লি মিডিএভাল ইন্ডিয়া: ফ্রম দ্য স্টোন এজ টু টুয়েলভথ সেঞ্চুরি,* দিল্লীঃ পিয়ারসন লংম্যান , ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৭১

[128] নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* ২য় সংস্করণ, কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী, ১৪০২, পৃষ্ঠা- ৬৭-৬৮

[129] রমেশচন্দ্র মজুমদার – *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* ,ভলিউম ১, দ্য ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা পাবলিশার্স, মে,১৯৪৩, পৃষ্ঠা- ৮-৯

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত,* কলকাতা, প্রগ্রেশিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা- ৪

[130] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তদেব

[131] মজুমদার – *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল,* পৃষ্ঠা-৮

[132] মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত,* পৃষ্ঠা- ৪

বঙ্গের অন্য নাম ছিল ‘গঙ্গা রাষ্ট্র’ আবার গ্রীক বর্ণনা অনুসারে গঙ্গা দেশের সর্বত্র গঙ্গানদী ও তার শাখাপ্রশাখা দ্বারা পরিবৃত, এজাতীয় নানান তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকগন অনুমান করেছেন এই ’গঙ্গা‘ রাষ্ট্রই হল প্রাচীন বঙ্গ।[133]

তবে সার্বিকভাবেই প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনাতে অন্যতম জটিল বিষয় হল, স্বয়ং ‘প্রাচীন বাংলা’ শব্দবন্ধটির ব্যবহার। কেননা, সমগ্র প্রাচীন বাংলা অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র কালপর্বে ‘বাংলা’ বলতে কোনও সংগঠিত ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিলনা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অংশ যা সার্বিক রূপে ‘প্রাচীন বাংলা’ হিসেবে অভিহিত তা মূলত স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক পৃথক কিছু আঞ্চলিক ভূখণ্ড বা উপঅঞ্চলে বিভক্ত ছিল[134], যথা-

পুণ্ড্র- পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত।[135] বর্তমান আলোচনার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল তথা আলোচ্য সময়পর্বে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ- দ্বাদশ শতাব্দী) বাংলার পোড়ামাটি শিল্প সমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র যথা- পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার ‘জগজ্জীবনপুর’, অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার ‘মহাস্থানগড়’ ও নওগাঁ জেলার ‘পাহাড়পুর’ ভৌগোলিকভাবে এই আঞ্চলিক ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলত বলা বাহুল্য এটি আলোচ্য পরিসরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাঞ্চল।

রাঢ়- প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের ছোটনাগপুর মালভূমি ও রাজমহল পর্বতের পূর্বাংশ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুরের কিয়দংশ, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ এবং বিহার-ওড়িশার সমন্বয়ে এই জনপদ গঠিত বলে মনে করা হয়।[136] আলোচনা প্রসঙ্গে

---

[133] তদেব

[134] সুস্মিতা বসু মজুমদার, ‘মিডিয়া অফ এক্সচেঞ্জঃ রিফ্লেকশনস অন দ্য মানিটারি সিস্টেম’, ইন *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ২ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা- ২৩৩

[135] আব্দুল মোমিন চৌধুরী, আকসাদুল আলম- ‘হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি’, পৃষ্ঠা- ১৮-২৬

[136] অমিতাভ ভট্টাচার্য, *হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি অফ এনসিয়েন্ট অ্যান্ড আর্লি মিডিয়েভাল বেঙ্গল* , কলকাতা,সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, পৃষ্ঠা- ৫৭

গবেষণা পত্রে উল্লিখিত বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র মেদিনীপুর জেলার 'মোগলমারি' এই ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল। এর সাথেই উল্লেখ্য 'গৌড়ে'র কথা, বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ ছিল এটি। এর উত্তর ও উত্তর-পূর্বে পুণ্ড্র এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ ছিল রাঢ় অঞ্চল, মূলত বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা ও মালদার দক্ষিণতম অংশ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত ছিল এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র 'কর্ণসুবর্ন' ছিল কেন্দ্রস্থল।[137]

বঙ্গ- বিভিন্ন সময়ে এর সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে, ফলত এই বিভাগের নির্দিষ্ট অবস্থান নিয়ে বিবিধ মতামত রয়েছে। মূলত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে এর বিস্তৃতি থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা-ফরিদপুর-মুন্সীগঞ্জ এবং বরিশাল এলাকাও এর অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা হয়। ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনা নদী দ্বারা এই অঞ্চল পরিবেষ্টিত ছিল ।[138]

সমতট- মেঘনা পূর্ববর্তী এলাকায় কুমিল্লা- নোয়াখালী- চিটাগাং ও সন্নিহিত সমতল অঞ্চলে ছিল এর অবস্থান। এছাড়াও বর্তমান ত্রিপুরার কিছু অংশ এবং উত্তর ও দক্ষিণার্ধে যথাক্রমে শ্রীহট্ট ও হরিকেল উপবিভাগ আবর্তিত ছিল।[139] বর্তমান আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার 'ময়নামতী' ভৌগোলিকভাবে এই আঞ্চলিক ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হরিকেল- মূলত চিটাগাং ও তার সন্নিহিত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল, তবে ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সাথে সাথে কুমিল্লা- নোয়াখালী- ত্রিপুরা- সিলেট অঞ্চলে এর বিস্তৃতি ঘটে। আদতে সমতট ও হরিকেলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ মুশকিল, মূলত মনে করা হয় কুমিল্লা, নোয়াখালী এলাকা সমতট অঞ্চলের মূলকেন্দ্র নির্মাণ করে, অপরদিকে চিটাগাং এর উপত্যকীয় এলাকাকে ভিত্তি করে হরিকেল এর প্রধান কেন্দ্র বিস্তৃত।[140]

তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ নয়, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বর্তমান দক্ষিণ বিহারের বিক্রমশীলা মহাবিহার বা অধুনা অ্যান্টিচক বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের আলোচনায় অন্যতম। ধর্মস্বামীন এবং

রায়, *বাঙালীর ইতিহাস,* পৃষ্ঠা- ১১৬-১১৯

[137] আব্দুল মোমিন চৌধুরী, আকসাদুল আলম- 'হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি', পৃষ্ঠা- ২১-২২

[138] তদেব পৃষ্ঠা- ২২-২৪

[139] তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪-২৫

[140] তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫-২৬

তারানাথের মতো তিব্বতি সন্ন্যাসীদের বিবরণে এটি প্রদর্শিত হয়েছে। পরবর্তীকালের লিপি থেকে জানতে পারি যে মঠটি মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরে একটি পাহাড়ের চূড়ায় পাল রাজা ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[141] পাশাপাশি প্রাচীন বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে, এই সকল উপঅঞ্চল একত্রে 'প্রাচীন বাংলা' রূপে অভিহিত হলেও শিল্প বিকাশের ধারা সর্বত্র যে সমরৈখিক ছিল তা নয়। কেবল শিল্প নয় আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসরও অঞ্চলভেদে ছিল ভিন্ন। ফলত পরবর্তী অধ্যায়ে বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতা ও বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানে বিশেষ আলোকপাত করা হবে।

বাংলার ভূ প্রাকৃতিক -বৈচিত্র্য একে সর্বদা এক বিশেষত্ব প্রদান করে, এর তিন দিকে (উত্তর,পূর্ব ও পশ্চিমে) অবস্থিত বিস্তীর্ণ পর্বতমালা, অসংখ্য নদনদী, মালভূমি- সমভূমি অঞ্চল, এবং দক্ষিণের সমুদ্র ও বিস্তৃত উপত্যকীয় অঞ্চলের উপস্থিতি একে ভৌগোলিক গুরুত্বের নিরিখে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে।[142] তবে বিস্তীর্ণ পুরাতন পাললিক ভূমি, অপেক্ষাকৃত নবসৃষ্ট পাললিক ভূমি (Comparatively new alluvial land), মৌসুমি বায়ুর প্রাধান্য বা ভারী বর্ষা বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম। বর্ষা বা বৃষ্টিপাত সম্পর্কে অধ্যাপক রনবীর চক্রবর্তীর[143] আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, একাদশ শতকীয় চোল লিপিতে উল্লিখিত রয়েছে 'বঙ্গালদেশ' এমন এক দেশ যেখানে অনবরত বৃষ্টি হয়। পাশাপাশি একাধিক নদনদীর উপস্থিতি এই অঞ্চলের মৃত্তিকাকে অত্যন্ত উর্বর করে। বাংলা মূলত নদীমাতৃক অঞ্চল। ফলত বাংলার ভৌগোলিক পরিকাঠামো গঠন কিংবা ইতিহাসের চরিত্র নির্মাণে নদীর ভূমিকা সর্বাধিক। নদীপ্রবাহের মধ্যে গঙ্গা ও তার প্রবাহ পদ্মা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যার মধ্যে গঙ্গা মূলত রাজমহল পাহাড়ের উত্তর পশ্চিমে সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে বাংলার সমভূমিতে প্রবেশ করে এবং মূলত এরপর দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা – একটি পূর্ব দক্ষিণ বাহিনী পদ্মা এবং অপরটি দক্ষিণ বাহিনী ভাগীরথী নামে খ্যাত।[144] এছাড়া ব্রহ্মপুত্র

[141] রজত স্যান্যাল, 'অ্যান্টিচক' , *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম-১, ঢাকা,বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৩১

[142] রায়, *বাঙালীর ইতিহাস,* পৃষ্ঠা- - ৬৭-৬৮

[143] রনবীর চক্রবর্তী, 'ইকোনমিক লাইফ', ইন *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ২, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা-১১১

[144] রায়, *বাঙালীর ইতিহাস,* পৃষ্ঠা- ৭৪-৭৯

পৃথিবীর দীর্ঘতম নদনদীগুলির একটি, যার অববাহিকা ভারত ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।[145]

আলোচ্য প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর বঙ্গের নদীগুলির উল্লেখ, কেননা বর্তমান এককে আলোচ্য বঙ্গীয় মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলি ভৌগোলিকভাবে অধিকাংশই বাংলার উক্ত অংশে বিস্তৃত। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে উত্তরবঙ্গ পললভূমিতে অবস্থিত যা একাধিক নদীপ্রবাহ দ্বারা প্লাবিত ও সমৃদ্ধ। এখানকার তিস্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রবাহ। এই প্রবাহের তিনটি ধারার কথা জানা যায়- ১) দক্ষিণবাহী পূর্বতম স্রোতের নাম করতোয়া ২) দক্ষিণবাহী মধ্যবর্তী স্রোতধারা আত্রাই ৩) দক্ষিণবাহী পশ্চিমতম স্রোতের নাম পুনর্ভবা।[146] এগুলির মধ্যে করতোয়া নদীটি বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মধ্য দিয়ে বাহিত, এর তীরেই অবস্থিত বর্তমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল 'মহাস্থানগড়'।[147] অপরদিকে এই আলোচনারই অন্যতম প্রত্নকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার 'জগজ্জীবনপুর' বিস্তৃত পুনর্ভবা নদীটিকে কেন্দ্র করে।[148] এছাড়াও পূর্ব বাংলার অন্যতম সমৃদ্ধ নদী মেঘনা। বর্তমান পরিসরে 'ময়নামতী' প্রত্নস্থলের আলোচনায় উঠে আসে মেঘনার কথা, কেননা ভৌগোলিকভাবে এই কেন্দ্র বর্তমান কুমিল্লা জেলার (তৎকালীন সমতট, দেবপর্বত) অন্তর্গত যা মেঘনার পূর্বতীরে অবস্থিত।[149] এই নদী উপত্যকা ময়নামতী অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু পাশাপাশি বিশেষ উল্লেখ্য অপর এক নদী ক্ষীরোদার কথা। ময়নামতী বা সমতট সংক্রান্ত একাধিক লিপিমালায় বারংবার এই নদীর উল্লেখ মেলে। যেমন শ্রীধারনরাতের

---

[145] বাংলাপিডিয়া

[146] রায়, *বাঙালীর ইতিহাস,* পৃষ্ঠা- ৮৮-৯০

[147] Jean-francois Salles, 'মহাস্থান', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২২৪

[148] শীনা পাঁজা, 'জগজ্জীবনপুর অ্যান্ড বাণগড়ঃ নর্দান ওয়েস্ট বেঙ্গল', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* ভলিউম ১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৬

[149] শ্রাবণী চক্রবর্তী, 'ওয়াটার বডিস, রিভারাইন পোর্টস অ্যান্ড কমিউনিকেশনসঃ মেকিং অফ দ্য ট্রান্স-মেঘনা সাব-রিজিওনাল পার্সোনালিটি ইন আর্লি মেডিএভাল বেঙ্গল', ইন *প্রসেডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস,* ভলিউম-৭৬, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস,২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৬৬

কৈলান তাম্রশাসন[150] (৬৬৫-৬৭৫ খ্রিস্টাব্দ) অনুসারে সমতটের রাজধানী 'দেবপর্বত' ক্ষীরোদা বা বর্তমান ক্ষীরনাই নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল যার উভয় তীরে নৌকা বা উক্ত জলযান দ্বারা সজ্জিত থাকত এবং নৌঘাঁটিও ছিল। যা থেকে অনুমান করা হয় দেবপর্বত ছিল নদী বন্দর। সুতরাং এই অঞ্চলে ক্ষীরোদা নদীর গুরুত্ব সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আবার ভবদেবের এশিয়াটিক সোসাইটি তাম্রফলক[151] (৭৬৫-৮০ খ্রিস্টাব্দ), শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রফলক (৯২৫-৭৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্যে উক্ত অঞ্চলে বারংবার ক্ষীরোদার উপস্থিতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।[152] এছাড়াও একাধিক বিল বা অন্যান্য জলাশয়ের উপস্থিতি বাংলার ভৌগোলিক পরিসরে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন এপ্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা চলে আলোচ্য গবেষণা পত্রের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নস্থল পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুর থেকে আবিষ্কৃত পালরাজা মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসনটির কথা[153], এই তাম্রশাসন সূত্রেই জানা যায় আবিষ্কৃত নন্দদীর্ঘি বৌদ্ধবিহারের নামকরণ হয়েছে নিকটবর্তী জলাশয় নন্দদীঘির নামানুসারে। সুতরাং একটি জলাশয় আঞ্চলিক পরিসরে বা মানব জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হলে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সাথে তা সংযুক্ত হতে পারে তা হয়তো সহজেই অনুমান করা চলে। পাশাপাশি অবশ্যই উল্লেখ করা চলে ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনের কথা[154], যেখানে দেখা যায় উল্লিখিত গ্রামের সীমানা বোঝাতে 'জোলক' শব্দের ব্যবহার রয়েছে যার অর্থ ছোট নদী বা খাল জাতীয় জলাশয়। শুধু খালিমপুর তাম্রশাসন ই নয়, লক্ষ করলে দেখা যাবে

---

[150] ডি.সি.সরকার, 'দ্য কৈলান কপারপ্লেট ইন্সক্রিপশন অফ শ্রীধরন রাত অফ সমতট', *আই এইচ ক্যু,* ভলিউম ২৩, ১৯৪৭ পৃষ্ঠা- ২২১-৪১

[151] ডি.সি.সরকার, 'কপারপ্লেট ইন্সক্রিপশন অফ কিং ভবদেব', *জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি, লেটার্স,* ভলিউম- ১৭, ১৯৫১, পৃষ্ঠা- ৮৩-৯৪

[152] সুচন্দ্রা ঘোষ, 'সিচুয়েটিং ওয়াটার বডিস ইন দ্য ল্যান্ডস্কেপ অফ আর্লি মেডিএভাল বেঙ্গল অ্যান্ড আসামঃ গ্লিনিংস ফ্রম এপিগ্রাফি অ্যান্ড লিটেরেচার', *প্রসেডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস,* ভলিউম-৬৯, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস,২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৬৪

[153] অমল রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিসেম্বর ২০১২ পৃষ্ঠা- ১৮-২৩

[154] এফ কিয়েলহর্ন, 'খালিমপুর প্লেট অফ ধর্মপালদেব', ইন *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা,* ভলিউম-৪, কলকাতা,১৮৯৬-৯৭, পৃষ্ঠা- ২৪৩-২৫৪

আলোচ্য পর্বে বাংলার অসংখ্য ভূমিদানপত্র বা তাম্রশাসন গুলিতে প্রায়ই জমির সীমানা বোঝাতে বা অন্য নানাভাবে বারংবার একাধিক পুষ্করিণী, বিল প্রভৃতির উপস্থিতি রয়েছে।

ফলত এসকল তথ্য থেকে আমরা খুব সহজেই তৎকালীন বাংলার নদনদী তথা বিবিধ জলাশয়ের উপস্থিতির সন্ধান পাই যারা বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করে এসেছে বাংলাকে, উর্বর করেছে বাংলার মৃত্তিকাকে যা বাংলার পরিবেশ ও জনজীবনে তথা সার্বিক ইতিহাস নির্মাণে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করবে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এসকল নদনদী দ্বারা বাহিত পলির সমন্বয়ে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল গঠিত যা বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। এই বৃহৎ গাঙ্গেয় বদ্বীপ কৃষিকাজের বিকাশের জন্য উপযুক্ত যা কৃষিনির্ভর গোষ্ঠীকে সমৃদ্ধ করে, পাশাপাশি অন্তর্দেশীয় অঞ্চলের সাথে উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রের সংযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এই নদীগুলি[155]; যা নিশ্চিত রূপে সমকালীন বাণিজ্যিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই, পাশাপাশি শিল্প সংস্কৃতির দিকগুলিও যে সমৃদ্ধ হয় বলা চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা ভৌগোলিকভাবে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আর ভারতীয় মানচিত্র লক্ষ করলেই দেখা যায় গাঙ্গেয় উপত্যকার বৃহত্তর অংশ মূলত স্থলবন্দী। মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার ক্ষেত্রে সমুদ্রের সাথে সংযোগের একমাত্র নির্গমনপথ ছিল বাংলার বদ্বীপ অঞ্চল অর্থাৎ যেকোনো উদ্দেশ্যে সমুদ্রের সহিত যোগাযোগ বা যাত্রার ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলের মানুষকে আবশ্যকভাবে বাংলার ওপর দিয়ে যেতে হত। ফলস্বরূপ উত্তরভারতীয় অঞ্চলগুলিকে তাদের সমুদ্রবাণিজ্যের জন্য বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযোগের জন্য বাংলার নদীপথ ও বন্দরগুলির ওপর নির্ভর করতে হত।[156] আবার অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাথে গাঙ্গেয় উপত্যকার যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বাংলা নির্গমন পথ হিসেবে কাজ করত।[157]

---

[155] চক্রবর্তী, 'ইকোনমিক লাইফ', পৃষ্ঠা-১১১

[156] শাহনাজ হুসেন জাহান, 'বেঙ্গল অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান ওসিয়ান মেরিটাইম ট্রেড নেটওয়ার্ক ডিউরিং দ্য আর্লি হিস্টোরিক পিরিয়ড', ইন *আর্কিওলজি অফ আর্লি হিস্টোরিক সাউথ এশিয়া,* গৌতম সেনগুপ্ত ও শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত, নিউ দিল্লী,প্রগতি পাবলিকেশানস্ এবং সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিস অ্যান্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৫৬৩

[157] চক্রবর্তী, 'ইকোনমিক লাইফ', পৃষ্ঠা-১১২

অদ্যাবধি আলোচনা থেকে সার্বিক ভাবে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিসর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং উক্ত প্রেক্ষাপটেই মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থগুলির বিকাশ তথা এক দীর্ঘকালীন সমৃদ্ধ মৃৎশিল্প ধারার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন হল, বাংলায় সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্প গড়ে ওঠা তথা দীর্ঘকালীন ক্রমবিকাশের কারণ কি তথা এর পশ্চাতে কিরূপ শর্ত কাজ করেছিল? পাশাপাশি, আলোচ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু প্রত্নস্থলকেই নির্বাচন করা হল কেন? সাধারণভাবে বলা যায়, বাংলায় পোড়ামাটির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে আলোচ্য পর্বে (আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে) প্রধানত নির্বাচিত কেন্দ্রগুলিতেই (মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, জগজ্জীবনপুর, ময়নামতি) পোড়ামাটি শিল্পধারা সম্প্রসারিত, যেকারনে বর্তমান গবেষণা পরিসরে এই কেন্দ্রগুলির গুরুত্বই সর্বাধিক। কিন্তু এর পশ্চাতে নিঃসন্দেহে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং কি কারণে বাংলায় এইরূপ শিল্পধারার প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছিল সেই দিকটি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় ভৌগোলিক উপাদান তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মৃৎ শিল্পের প্রাপ্তিস্থলগুলির মধ্যে বাংলাদেশের মহাস্থানগড় ও তার নিকটবর্তী পুরাকেন্দ্রসমূহ (বগুড়া, রাজশাহী), পাহাড়পুর (নওগাঁ, রাজশাহী), এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুরকে (মালদা, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ) মানচিত্রে এক রেখায় যুক্ত করলে দেখা যাবে এই কেন্দ্র ৩টি নিকটতম ও সম ভৌগোলিক পরিকাঠামোর মধ্যে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের উপরের অংশে[158] অবস্থিত, সাধারণত যে অঞ্চলকে 'উত্তরবঙ্গ' (উত্তর পশ্চিম বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ) রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সুতরাং অঞ্চলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের দিকটি অনুমেয়, যা তাদের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সকল পরিসরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র ময়নামতীর অন্তর্গত প্রত্নস্থলগুলি কিছুটা বিচ্ছিন্ন রূপে অধুনা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে উপত্যকীয় এলাকায় অবস্থিত হলেও, উক্ত অবস্থানই তার স্বতন্ত্র চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্র প্রশস্ত করে বলা চলে।

ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে সমগ্র বাংলা মূলত পাললিক সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল নিয়ে গঠিত, যা প্রভূত পাললিক মৃত্তিকায় সমৃদ্ধ ও উর্বর এবং গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি একাধিক জলপ্রবাহ দ্বারা গভীরভাবে প্লাবিত। যেহেতু আমাদের আলোচনাস্থল বহুলাংশে উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক, দেখা যায় উক্ত ক্ষেত্রে এই উর্বর অঞ্চল প্রধানত তিস্তা, আত্রাই, মহানন্দা,

---

[158] পাঁজা, 'জগজ্জীবনপুর অ্যান্ড বাণগড়ঃ নর্দান ওয়েস্ট বেঙ্গল', পৃষ্ঠা- ২১১

করতোয়ার জলধারা ও পাললিক ভূমি দ্বারা সংগঠিত। অর্থাৎ সমতট ছাড়া বাকি ৩টি প্রত্নস্থল এই ভূ-ভাগের অন্তর্গত অপরদিকে সমতটের কথা যদি বলতে হয়, আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও আকসাদুল আলম ভূ-তাত্ত্বিকভাবে এটিকে পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতীর পলি বাহিত নবসৃষ্ট উর্বর ভূমির অধীন ধরা হয় বলে উল্লেখ করেছেন।[159] এছাড়া প্রত্নস্থলগুলির আলোচনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলপ্রবাহের উল্লেখ করা হবে যা থেকে সহজেই আলোচ্য পরিসরে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুমান করা যায়। আবার বাংলার ভৌগোলিক পরিসরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক তার জলবায়ু। বাংলা মূলত ক্রান্তীয় মৌসুমী বায়ুর অঞ্চল যা পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতে সহায়ক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান। ফলত একাধারে বিপুল নদীপ্রবাহ এবং এই বৃষ্টিপাত বাংলার মৃত্তিকাকে যথেষ্ট উর্বর করে তোলে সন্দেহ নেই।[160] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা ঘোষ[161] প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সংক্রান্ত তাঁর একটি প্রবন্ধে সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’ এর বর্ণনা থেকে বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন বর্তমান এই আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র তথা উত্তর বঙ্গ প্রাকৃতিক পরিসরের দিক থেকে কতখানি সমৃদ্ধ ছিল। এই অঞ্চল ছিল একাধারে ছিল বৃষ্টিস্নাত, নদীমাতৃক, কৃষি সমৃদ্ধ তথা ধান চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অপরদিকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলা বা সমতট অঞ্চলের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশের কথাও ইতিপূর্বেই উল্লিখিত। অর্থাৎ সার্বিকভাবে এই সমগ্র অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ সাধারণ মানুষের নিকট বসবাস উপযোগী, সমৃদ্ধ আর্থসামাজিক পরিসর প্রদান করেছিল।

সুতরাং বলা চলে, সার্বিকভাবে নদীকেন্দ্রিক অবস্থান এবং বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের ন্যায় আলোচ্য পরিসরে নির্বাচিত অঞ্চলেও বিপুল উর্বর পাললিক মৃত্তিকার উপস্থিতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যা মৃৎশিল্পের নির্মান তথা বিকাশে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান যেকোনও শিল্পের বিকাশে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর যেহেতু টেরাকোটা শিল্পের প্রধান উপকরণ মৃত্তিকা এবং আলোচ্য পরিসরে তা অতি সহজলভ্য ছিল ফলত সেটা সার্বিকভাবে বাংলায়

---

[159] আব্দুল মোমিন চৌধুরী, আকসাদুল আলম- ‘হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি’, পৃষ্ঠা-২-৫

[160] তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫-১৬

[161] সুচন্দ্রা ঘোষ, ‘সিচুয়েটিং ওয়াটার বডিস ইন দ্য ল্যান্ডস্কেপ অফ আর্লি মেডিএভাল বেঙ্গল অ্যান্ড আসামঃ গ্লিনিংস ফ্রম এপিগ্রাফি অ্যান্ড লিটেরেচার’, *প্রসেডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস*, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ২০০৮, খণ্ড-৬৯ পৃষ্ঠা- ১৫৯- ১৬৬

এই শিল্পের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নেই। আর বাংলার পলি মৃত্তিকা কিছুটা আলগা ধাঁচের মাটি যাকে সহজেই জলের সংমিশ্রণে বিভিন্ন আকার দেওয়া সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে তা ভিজে অবস্থায় যথাযথ জলের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি অবয়বের যথার্থ আর্দ্রতা বজায় রাখে।[162] ফলত এই চরিত্র খুব সহজেই শিল্পীদের তাদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যম হিসেবে এই মৃত্তিকাকে বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করে। তবে পাললিক মৃত্তিকার যে অফুরন্ত সরবরাহ আলোচ্য ভূখণ্ডে ছিল পাথর ততটা নয়। হয়তো বিপুল মৃৎশিল্প প্রসারে এটি অন্যতম কারণ। যদিও আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় প্রাপ্ত বিপুল প্রস্তর ভাস্কর্য এই তত্ত্বকে বহুলাংশেই নস্বাৎ করতে পারে। তবে পাশাপাশি এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন প্রস্তর বা ধাতব শিল্পও বলতে এই পর্বে কেবল ঐশ্বরিক অবয়বই পাওয়া যায় যা সমকালীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত ছিল মনে করা হয়। কিন্তু মৃৎশিল্প কিন্তু উক্ত স্তরে উন্নীত ছিলনা। অর্থাৎ তার প্রয়োগ ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক দেওয়ালে, অভ্যন্তরে নয়। উচ্চ মার্গের ধ্রুপদী শিল্পে কিন্তু তার স্থান ছিলনা। ফলত প্রস্তর বা ধাতু অপেক্ষা মৃত্তিকার সহজলভ্যতা বা স্বল্পদামই কি তার সামাজিক মর্যাদা বা গ্রহণযোগ্যতার পরিসর থেকে তাঁকে পিছিয়ে দিয়েছে? অন্যান্য ভাস্কর্য অপেক্ষা তাকে পৃথক করছে? এজাতীয় প্রেক্ষিত ও ভেবে দেখা প্রয়োজন। উপরন্তু প্রস্তর বা ধাতব শিল্পে যথেষ্ট অর্থব্যায়, পরিশ্রম এবং যথাযথ দক্ষতা বা শিল্পজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তুলনামূলকভাবে মৃৎভাস্কর্য নির্মাণ কিছুটা নমনীয়, কারিগরিগত দিক থেকে শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বাংলার ন্যায় নদীকেন্দ্রিক ও পলল মৃত্তিকাসমৃদ্ধ অঞ্চলে মৃৎভাস্কর্য নির্মাণ বহুলাংশে স্বল্পব্যায়ে ও সহজে বিকাশ সম্ভব ছিল যা একাধারে নির্মাতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই। আর বাংলায় দীর্ঘদিন ব্যাপী মৃৎশিল্পের উপস্থিতি থাকায় তার নির্মাণ শৈলী বা কারিগরি সম্পর্কে স্থানীয় শিল্পীরা যথেষ্টই ওয়াকিবহল ছিলেন সন্দেহ নেই, ফলত তারা সময়ের সাথে প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে নিজ শৈলী নিয়ে বিবিধ অনুসন্ধান বা বিবর্তন ঘটিয়েছেন অতি সহজেই।

অপর একটি কথা বলা দরকার, বাংলার নদনদীর গতিপ্রবাহ কিন্তু সর্বদাই পরিবর্তনশীল থাকে যা বাংলার সার্বিক ইতিহাসকেও প্রভাবিত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের

---

[162] বিনয় কুমার রাও, 'দ্য টেরাকোটা প্লাকস অফ পাগানঃ ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড বার্মিস ইনোভেশনস্', ইন *এনসিয়েন্ট এশিয়া ৪,* (২০১৩), পৃষ্ঠা-২-৩

কথা, মোটামুটি সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। কিন্তু ক্রমে সরস্বতী – ভাগীরথীর গতি পরিবর্তন ও শুকিয়ে যাওয়ার ফলে এর গুরুত্ব হ্রাস পায়[163] এবং পরিবর্তে ক্রমে এসময় থেকে অন্য কিছু বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায় বাংলার ইতিহাসে। যেমন, রিওসোকে ফুরুই ২জন চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা থেকে দেখিয়েছেন তারা হরিকেল বন্দরে নেমেছিলেন, যদিও তা কোন বন্দর তা নিশ্চিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন। আবার ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে আরব বণিকদের নথীর প্রেক্ষিতে হরিকেল অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক গুরুত্বের আভাষ পাওয়া যায়, তেমনি মেঘনা মোহনায় 'সমুন্দর' বাণিজ্য কেন্দ্রের উল্লেখ কিংবা পরবর্তীতে ইবন বতুতা কর্তৃক চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও এর উল্লেখ[164] থেকে ক্রমে বাংলার অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দুর স্থানপরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যায়। সুতরাং এই প্রেক্ষিত থেকে অনুমান করাই যায় আলোচ্য পর্বে যেহেতু বাংলায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল পরিবর্তিত হচ্ছে ফলত অন্যান্য রাজনৈতিক-সামাজিক- শিল্প সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও তার দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। আর আর্থসামাজিক সমৃদ্ধির দিক থেকে সম্ভাবনাময় অঞ্চলই সর্বদা মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে। ফলস্বরূপ আলোচ্য সময়পর্বে বাংলার এই অঞ্চল সার্বিকভাবে মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, যার দরুন শিল্প- সাংস্কৃতিক ইতিহাসও এই ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বিস্তার লাভ করেছিল অনুমান করা যেতে পারে। সুতরাং বলা চলে বাংলার শৈল্পিক ঐতিহ্যের চরিত্র বহুলাংশে তার ভৌগোলিক পরিসরের শর্ত ও সীমাবদ্ধতা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

২.বাংলার মৃৎশিল্পের বিকাশে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটঃ

উপরিল্লিখিত আলোচনার নিরিখে বলা যায় বাংলায় মৃৎশিল্প বিকাশে বা তার নির্দিষ্ট চরিত্র গঠনে ভৌগোলিক পরিকাঠামো বৃহত্তর ভূমিকা পালন করলেও যেকোনো শিল্প বিকাশের পশ্চাতে নিহিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। সাধারণত যেকোনো পর্বের সাংস্কৃতিক চিত্র সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষিত বা পরিস্থিতি দ্বারা নির্ধারিত হয়, ফলত আলোচ্য পর্বে বাংলায়

---

[163] আব্দুল মোমিন চৌধুরী, আকসাদুল আলম- 'হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি', পৃষ্ঠা- ১৪

[164] রিওসোকে ফুরুই, *ল্যান্ড অ্যান্ড সোসাইটি ইন আর্লি সাউথ এশিয়া' ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ৪০০-১২৫০,* নিউ ইয়র্ক ,এ ডি, রুতলেজ পাবলিকেশন ২০২০, পৃষ্ঠা- ৩৪-৩৫

শিল্পশৈলীর যে উপস্থাপনা আমরা পাই তা নিঃসন্দেহে তৎকালীন সামাজিক শর্তের দ্বারাই পরিচালিত। সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে আলোচ্য পর্ব ছিল আঞ্চলিকতার যুগ, নতুন ভূমিনির্ভর গোষ্ঠীর উপস্থিতি, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো, স্তরায়ন, সাংস্কৃতিক তথা ধর্মীয় জটিলতা ও বৈচিত্র্যের যুগ। সমকালীন শিল্পধারার বিকাশ যে এই সংজ্ঞার বাইরে নয় তা খুব স্বাভাবিক।

আলোচ্য পর্ব থেকে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সর্বত্র এক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে আঞ্চলিকতার উত্থানকে ধরা হয়ে থাকে। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও বৃহত্তর রূপে এই আঞ্চলিক ভূখণ্ডের উত্থানকে রাষ্ট্রগঠন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত করে এক স্তরায়ন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি বলেন আদি মধ্যযুগের ভারতের সামাজিক কাঠামো, গুপ্ত যুগের পূর্ববর্তী সময় থেকেই বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতির মধ্য দিয়ে এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় চলে এসেছিল। ফলে আদি মধ্যযুগের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা উচিত নয়। বরং এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রক্রিয়ার সাথে একত্রে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।[165] আলোচ্য পর্বে বাংলায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ রূপে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে ধর্মীয় কেন্দ্রে (বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য উভয়ই) বিপুল পরিমাণ পৃষ্ঠপোষকতা, সেই সূত্রে শিল্প স্থাপত্যের প্রসার, বিভিন্ন পরিসরে বিপুল ভূমিদান, ফলস্বরূপ কৃষি নির্ভর অর্থনীতির প্রসার, অঞ্চল ভেদে বিবিধ প্রশাসনিক স্তর, পদাধিকারী ও অধিনস্ত স্থানীয় শাসকের আবির্ভাব, সেই সূত্রে মুখ্যত ভূমি কেন্দ্রিক বিবিধ পেশাজীবী গোষ্ঠীর আবির্ভাব যারা আবার প্রশাসনেও ভূমিকা পালন করত, পাশাপাশি অন্যান্য প্রান্তীয় গোষ্ঠীকে রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের জাতি বর্ণ কাঠামোর অন্তর্ভুক্তিকরণ এই সমস্ত প্রক্রিয়াকে একত্রে নিয়ে আসলে দেখা যায় আদতেই রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি পরস্পরের সাথে একই সূত্রে বাঁধা। কেবল ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় নন, আমরা জানি রামশরণ শর্মা, নীহাররঞ্জন রায় সহ একাধিক ঐতিহাসিক আদি-মধ্যযুগীয় আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা করেছেন। তবে বর্তমানে স্বল্প পরিসরে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবনা।

[165] ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *দ্য মেকিং অফ আর্লি মেডিএভাল ইন্ডিয়া,* নিউ দিল্লী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭

প্রসঙ্গত বলা চলে, গুপ্ত শাসনের পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতিতে একাধিক স্বাধীন আঞ্চলিক রাজবংশের উত্থান ঘটে যার মধ্যে কনৌজে মৌখরি, গুজরাট–সৌরাষ্ট্রে মৈত্রক প্রমুখের ন্যায় বাংলাতেও ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে দুটি স্বাধীন রাজবংশের উত্থান ঘটে। একদিকে বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সমতট- বঙ্গ অঞ্চলের রাজবংশ এবং অন্যদিকে পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ এবং উত্তরবঙ্গে শশাঙ্ক কর্তৃক গৌড় অঞ্চলে স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান ঘটে। শুধু গৌড় নয় মগধেও শশাঙ্ক তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যদিও অভ্যন্তরীণ সমস্যা, বহিরাগত আক্রমন ও রাজনৈতিক অরাজকতার দরুন বঙ্গীয় রাজনীতির এই অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[166] মোটামুটি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বঙ্গীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে পাল রাজবংশের উত্থান ঘটে।

এখন প্রশ্ন হল সমকালীন রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এই শিল্পের ক্রমবিকাশের কিরূপ সম্পর্ক ছিল? লক্ষ করলে দেখা যাবে আলোচ্য পর্বে টেরাকোটা শিল্পকে স্বতন্ত্র একক শিল্প রূপে নির্ধারণ করা যায়না, তা মূলত সম্পৃক্ত ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় স্থাপত্যের সঙ্গে; ফলত তার সাথে শাসকের রুচি বা আনুগত্যের প্রশ্নটি বহুলাংশে জড়িত। আলোচ্য পর্বে ময়নামতী ছাড়া বাকি সকল প্রত্নক্ষেত্রেই পালপ্রভাবের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় । জগজ্জীবনপুরে আবিষ্কৃত বিহার মূলত নবম শতকীয় ও পাল রাজা মহেন্দ্রপালদেবের সময়কালীন বা তার তত্ত্বাবধানে নির্মিত এবং এই কেন্দ্রে কেবলমাত্র একক সংস্কৃতি তথা পাল রাজবংশীয় প্রভাবেরই আভাষ পাওয়া যায়। অপরদিকে বিশেষরূপে বাংলায় আদি মধ্যযুগীয় টেরাকোটা শিল্পধারার আলোচনায় বিশেষ নাম পাহাড়পুর তথা সোমপুর মহাবিহার, যা পালরাজা ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত। আর আমরা জানি বাংলায় পালরাজাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ তথা বরেন্দ্রভূমি অঞ্চলেই। ফলত অনুমান করা যায় সেকারণেই সেসময় মূলত উত্তরবঙ্গ বা তার নিকটবর্তী কেন্দ্রেই বৌদ্ধ বিহারগুলি গড়ে উঠেছিল বা উক্ত পরিসরে স্থিত কেন্দ্রগুলিই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। ফলস্বরূপ বৌদ্ধবিহারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পাশাপাশি পোড়ামাটির শিল্প ইতিহাসের বিস্তৃতিও উক্ত অঞ্চল কেন্দ্রিক-ই লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মৃৎশিল্প বিকাশ কেন্দ্ররূপে অপর একটি কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা চলে।

[166] আব্দুল মোমিন চৌধুরী, 'থ্রেসহোল্ড অফ রিজিওনাল পলিটিক্যাল এনটিটি', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা-৫২৯-৫৩০

আমরা জানি বাংলার পাশাপাশি বিহার অঞ্চল ছিল পাল শাসনকেন্দ্র এবং বাংলার উপরিল্লিখিত এসকল কেন্দ্রে মৃৎশিল্প বিকাশের পাশাপাশি অনুরূপ ধাঁচের মৃৎ ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায় বিহারের ভাগলপুরের অন্তর্গত বিক্রমশীলা মহাবিহার এর ক্রুশাকৃতি কেন্দ্রীয় মন্দিরের দেওয়াল গাত্রেও। আর পাহাড়পুর এর ন্যায় বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন পালরাজা ধর্মপাল। ফলত একই পৃষ্ঠপোষকতায় সমরূপ সাংস্কৃতিক পরিসরের বিকাশ ঘটে উভয় অঞ্চলে।

অপরদিকে ময়নামতীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, এখানে বাংলার অন্যান্য ভূখন্ড অপেক্ষা এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে সমতট ভূখণ্ডে অবস্থিত, এবং দক্ষিণ পূর্ব বাংলা তথা সমতট হরিকেল অঞ্চলের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে এটি সর্বদাই বাংলার অন্য ভূখণ্ড অপেক্ষা এক নিজস্ব স্থানীয় স্বাধীন রাজনৈতিক স্বত্তা বহন করেছে। গুপ্ত শাসনের পরবর্তীতে যে স্থানীয় শাসকদের আবির্ভাব ঘটে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে তার প্রথমেই পাওয়া যায় মহারাজা বৈন্যগুপ্তের নাম। তাঁর গুনাইঘর তাম্রশাসনটির (৫০৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রাপ্তিস্থল ময়নামতী থেকে মাত্র ২৫ কিমি দূরে।[167] এছাড়াও একইভাবে ক্রমে স্থানীয় শাসক হিসেবে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের উল্লেখ মেলে যারা বাংলার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ অংশে শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়।[168] পরবর্তীতে মোটামুটি অষ্টম শতক থেকে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল সাধারণত পাল প্রভাবাধীনে থাকলেও এই দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ছিল তার বাইরে। এখানে সমসাময়িক পর্বে রাত, খর্গ, দেব, চন্দ্র, বর্মন রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং যার অধিকাংশ শাসকগণই ছিলেন বৌদ্ধধর্মানুরাগী। শুধু তাই নয় প্রাচীন বিভিন্ন লিপি বা সাহিত্য থেকে সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় ফলত তা খুব সহজেই ময়নামতী অঞ্চলে একাধিক বৌদ্ধ বিহারের প্রাপ্তির দিকটিকে যৌক্তকতা প্রদান করে। বৌদ্ধঐতিহ্য সংক্রান্ত ইতিহাসের পাশাপাশি পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসেও এইসকল অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে বলা চলে।

---

[167] মোকাম্মল হুসেন ভুঁইয়া, 'ময়নামতী', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২৬৫

[168] রমেশচন্দ্র মজুমদার – *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (ভলিউম ১), দ্য ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা পাবলিশার্স, মে,১৯৪৩, পৃষ্ঠা- ৫০

বাংলাপিডিয়া

যদিও আদি মধ্যযুগীয় পর্বে বাংলার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তা একমাত্রিক ছিলনা। বিভিন্ন স্তরে তা বিভক্ত ছিল, বিভিন্ন পৃথক শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কুটুম্বিন, মহত্তর এর ন্যায় ভূমিকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর পাশাপাশি সমাজে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক একাধিক জাতিগোষ্ঠীর ('কুলিক' বা কারিগর, 'কায়স্থ' বা লিপিকার প্রভৃতি) উপস্থিতি ছিল, যারা আবার ক্ষেত্র বিশেষে ভূমি অর্থনীতি বা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথেও যুক্ত থাকত।[169] ফলে প্রশ্ন উঠে আসতেই পারে, বৌদ্ধবিহারে পৃষ্ঠপোষকতা বা তাঁর সাথে সংলগ্ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গে এসকল শ্রেণীর সংযোগের দিকটি কোনভাবে নির্ধারন করা সম্ভব কিনা। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলার মৃৎশিল্পের সাথে সম্পর্কিত পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হবে, ফলত এই অধ্যায়ে তার আর পুনরাবৃত্তি করা হলনা। এই আলোচনা প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা চলে, পালদের বৌদ্ধপৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস একপাক্ষিক নয়, সংযুক্তা দত্ত তার সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, অষ্টম-নবম শতকে বৌদ্ধমঠগুলি পাল পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করলেও মোটামুটি দশম শতক থেকে এই ধারা পরিবর্তিত হয় এবং পালশাসকগণ মূলত ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান শুরু করেন। কিন্তু যেহেতু তারা বৌদ্ধধর্মের বিকাশে কোনোরকম বিপত্তি সৃষ্টি করেননি, ফলস্বরূপ বহুক্ষেত্রে বৌদ্ধসন্ন্যাসী, বণিক, সাধারণ মানুষদের সেসময় বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রূপে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।[170] কিন্তু তা স্বত্তেও প্রথম দুশতকে তাদের বৌদ্ধকেন্দ্রে অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত যা বৌদ্ধবিহারগুলি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং বলে চলে এসকল বিবিধ সম্ভাবনা স্বত্তেও কোন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে, কি পরিস্থিতিতে উক্ত ধর্মীয় স্থাপত্য ও সম্পর্কিত শিল্প গড়ে উঠেছে সেক্ষেত্রে রাজকীয় প্রভাবকে কখনোই অস্বীকার করা চলেনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলির মধ্যে মহাস্থানগড়ে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বসতি বা দুর্গাঞ্চলের উপস্থিতি এবং তাকে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ও কিছু অবৌদ্ধ স্থাপত্যিক কাঠামোর উপস্থিতি। আবার জগজ্জীবনপুরের ক্ষেত্রে এটি মূলত বৌদ্ধবিহার কেন্দ্র, এখানে মহাস্থানের ন্যায়

---

169 রিওসুকে ফুরুই, 'সোশ্যাল লাইফঃ ইস্যুস অফ বর্ণ-জাতি সিস্টেম' *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা- ৪৩- ৭০

170 সংযুক্তা দত্ত, 'বিল্ডিং ফর দ্য বুদ্ধাঃ প্যাট্রনস্ ইন দ্য পালা কিংডম',*স্টাডিস ইন হিস্ট্রি,* জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৬২-১৭৭

পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় বসতি বা কাঠামোর অস্তিত্ব নেই। পাহাড়পুর, বিক্রমশীলা মহাবিহার বা পিলাকের ক্ষেত্রেও আমরা বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব পাই, আবার ময়নামতীও মূলত একাধিক বৌদ্ধবিহারের সহাবস্থান। আলোচ্য পর্বে বঙ্গীয় পরিসরে মৃৎশিল্পের বিকাশের অন্যতম সূত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে বৌদ্ধধর্মের বিকাশকে। কেননা আদি মধ্যযুগীয় পর্বে মূলত বাংলা বিহার তথা পূর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছিল এবং তার ফলস্বরূপ একাধিক বৌদ্ধ মঠ বা বিহারের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে। বিবিধ সাহিত্য গ্রন্থ রচিত হয় তথা অজস্র ভাস্কর্য ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে আলোচ্য পর্বে। আর আলোচ্য পর্বের টেরাকোটা ছিল উক্ত প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণের পশ্চাতে সম্ভবত অন্যতম মূল চিন্তাধারা ছিল বাংলায় বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এক নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক রূপনির্মাণ। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাসকগণ বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হওয়ায় এই প্রবণতা আরও প্রবলতর হয়েছিল। যদিও আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় মৃৎ-ভাস্কর্যের উপস্থাপন বা বিকাশ বৃহত্তর রূপে বৌদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্য কাঠামো বিকাশের সাথে জড়িত থাকলেও তা একমাত্র পন্থা নয়। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখা যাবে মহাস্থানগড়ের অন্তর্গত একাধিক স্থাপত্য কাঠামো কিন্তু অবৌদ্ধ পরিচিতি সম্পন্ন যা আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের সাথে বৌদ্ধ বিহার বা বৌদ্ধ ধর্মের একপাক্ষিক সম্পর্কের সমীকরণে পরিবর্তন আনে। অনুরূপ সময়পর্বেই মহাস্থানে ভিন্ন চরিত্রের স্থাপত্যিক কাঠামোয় অনুরূপ ঐতিহ্যের মৃৎশিল্প উপস্থিত রয়েছে, যা হয়তো বাংলার মৃৎশিল্পের প্রেক্ষাপট জনিত বৈচিত্র্যময়তার ইঙ্গিত দেয়।

তবে বৈচিত্র্যময়তা স্বত্তেও আলোচ্য শিল্পধারার সাথে বৌদ্ধ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকে কখনোই এড়িয়ে চলা সম্ভবপর নয়। ফলত এক্ষেত্রে অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা চলে, এসকল বৌদ্ধবিহারের নির্মাণ বা পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র বা উদ্দেশ্য কতখানি কেবলমাত্র ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতপূর্ণ ছিল, আর কতটা এর সাথে শাসক বা পৃষ্ঠপোষকের অধিকার প্রদর্শনের মাধ্যম তথা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ বা পরিকল্পনা নিহিত ছিল তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত। নিশ্চিত রূপে এর উত্তর দেওয়া না গেলেও আপেক্ষিকভাবে বলা যায়, বৌদ্ধবিহার মাত্রই তা কেবল উপাসনা বা বিদ্যাচর্চার সাথে সম্পর্কিত ছিল এমন নয়। প্রায় সকল প্রত্নকেন্দ্রেই দেখা যায় পুরাদ্রব্য স্বরূপ বিপুল পরিমাণ মুদ্রা,পুঁতি, বৃহৎ মৃৎপাত্র, তাম্রশাসন,সীলমোহর প্রভৃতির উপস্থিতি লক্ষণীয় যা থেকে

এসকল বৌদ্ধমঠগুলির সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা করা যায়। অধ্যাপক স্বাধীন সেন ও মহম্মদ শফিকুল আলম 'পাহাড়পুর' সংক্রান্ত তাদের একটি রচনায় সোমপুর মহাবিহারের প্রাঙ্গনে একটি নির্মাণ কাঠামোর উল্লেখ করেছেন যা সম্ভবত শস্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করেছেন, যা থেকে কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বিহারের ভূমিকা সম্পর্কে লেখক উল্লেখ করেছেন।[171] আর যেহেতু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক নিবিড়, ফলস্বরূপ বৌদ্ধবিহারের বাণিজ্যিক ভূমিকার ক্ষেত্রটি কখনোই অপ্রাসঙ্গিক বলা চলেনা। দেখা যায় সমতটের রাজধানী দেবপর্বত ছিল নদীবন্দর, যা স্বাভাবিক রূপেই উক্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং পাশাপাশি ময়নামতীর বিভিন্ন বিহারগুলির পারস্পরিক সংযোগের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত বলাবাহুল্য। সমৃদ্ধ মেঘনা উপত্যকা এই অঞ্চলের কৃষির সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল যা অবস্থিত বৌদ্ধবিহারগুলিকে সমর্থন প্রদান বা বৌদ্ধভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের পাশাপাশি সার্বিকভাবে উক্ত অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।[172]

উপরিল্লিখিত আলোচনার দ্বারা মোটামুটিভাবে বাংলায় কোন ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৃৎশিল্পধারার বিকাশ ঘটেছিল কিংবা এর ক্রমবিকাশের পশ্চাতে কিরূপ শর্ত বা উপাদান এর সক্রিয় ভূমিকা থাকতে পারে তার একটি সম্ভাব্য আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস করা হল। এরপর অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলির পৃথক ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে কেননা তাদের আলোচনা ছাড়া নিঃসন্দেহেই বাংলার পোড়ামাটি শিল্পের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৩.পোড়ামাটি শিল্পসমৃদ্ধ প্রত্নকেন্দ্রসমূহঃ

[171] স্বাধীন সেন,মহম্মদ শফিকুল আলম- 'পাহাড়পুর', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা- ৩৭১-৩৭২

[172] ভুঁইয়া, 'ময়নামতী', পৃষ্ঠা- ২৭৪- ২৭৫

আলোচ্য সময়কালে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) বাংলায় মৃৎশিল্প ধারার চরিত্র এবং তার সাথে সম্পৃক্ত সমাজ, সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করতে হলে হলে এই শিল্পের ভৌগোলিক প্রসার তথা প্রাপ্তিস্থলগুলির ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পরিসর আলোচনা করা প্রয়োজন। উভয় বাংলাতেই এরূপ একাধিক প্রত্নস্থল ও প্রত্নসম্পদ ক্রমেই আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে এবং সমৃদ্ধ করে চলেছে বাংলার সুপ্ত প্রাচীন ইতিহাসকে। আমরা জানি, যেকোনও সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বুঝতে হলে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রত্নউপাদান নয়, বরং সমসাময়িক অন্যান্য পারিপার্শ্বিক নথী বা বস্তুসংস্কৃতির অধ্যয়নও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণে উক্ত পর্বের টেরাকোটা সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলির ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে এই অধ্যায়ে ধারণা দেওয়ার প্রয়াস করা হবে। দুটি পৃথক মানচিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থগুলিকে এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হল, প্রথমে পুণ্ড্র বরেন্দ্র অঞ্চলের মানচিত্র রেখে প্রত্নস্থল গুলি আলোচনা করা হল এবং একই ভাবে এরপর সমতট অঞ্চলে মানচিত্র উপস্থাপন করে উক্ত কেন্দ্রগুলি আলোচিত হল।

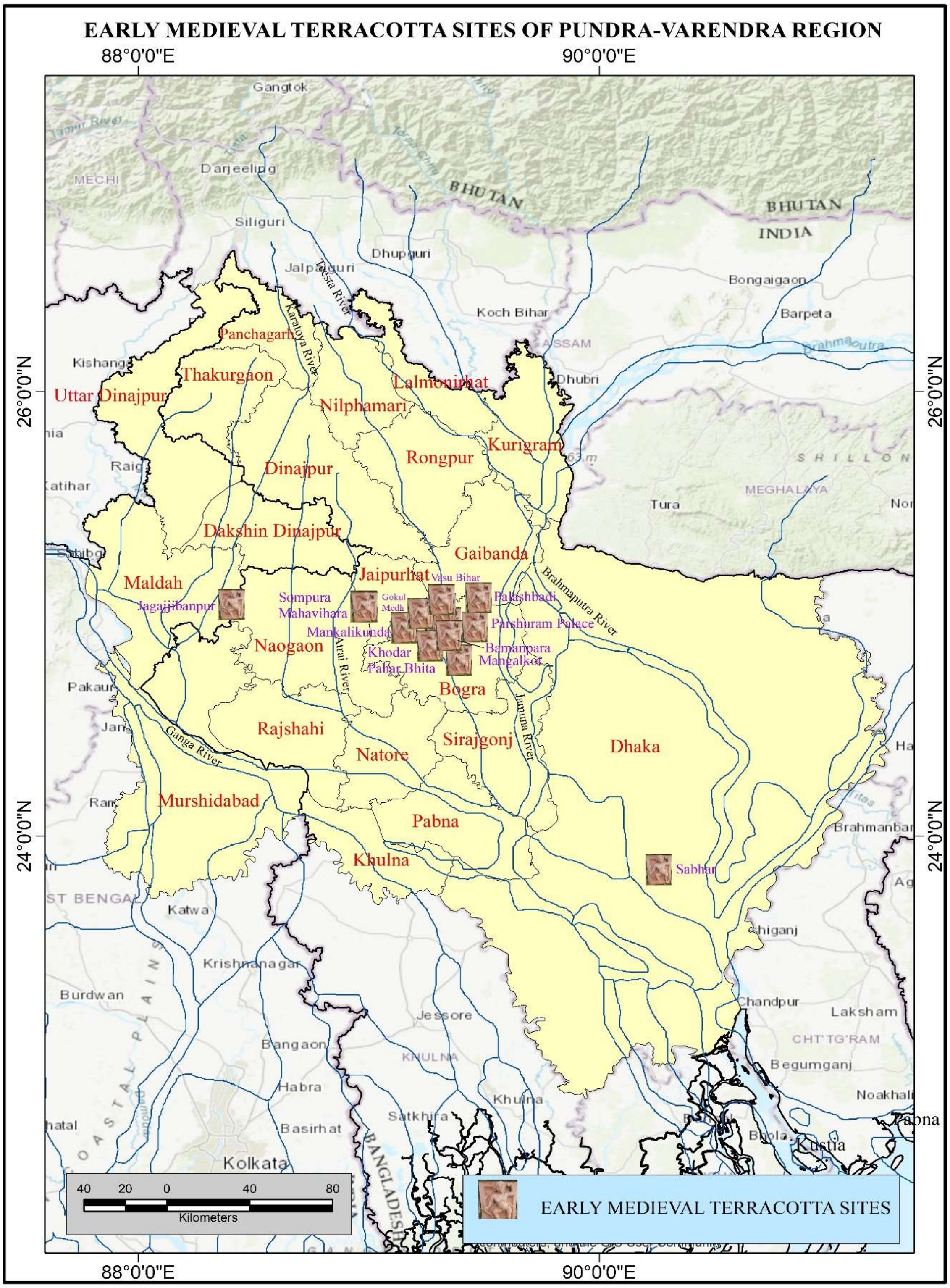

মানচিত্র-১ পুন্ড্র বরেন্দ্র অঞ্চল ভুক্ত আদি মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নকেন্দ্র সমূহ, গবেষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত।

৩.১ জগজ্জীবনপুর:

পোড়ামাটি শিল্পসমৃদ্ধ প্রত্নকেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করব জগজ্জীবনপুরের কথা, উৎখনন রিপোর্ট অনুসারে এই কেন্দ্রে আবিষ্কৃত একটি বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে বিচিত্র বিষয়াদি সম্পন্ন প্রায় ৪৭৯ টি পোড়ামাটি ফলক পাওয়া গেছে।[173] একটি অধ্যায়ে সমস্ত প্রেক্ষিত তুলে ধরা সম্ভবপর নয় ফলত এই পোড়ামাটি শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে তুলে ধরা হবে। বর্তমানে প্রত্নকেন্দ্ররূপে জগজ্জীবনপুরের সার্বিক পরিচিতি প্রদানের প্রয়াস করব, এটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মালদা জেলার পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল এবং ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর পশ্চিমাংশের নদীসমৃদ্ধ অঞ্চলে অবস্থিত যা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ অববাহিকার উপরিভাগের অন্তর্গত। গঙ্গা, মহানন্দা, কালিন্দি, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, করতোয়া, আত্রাই প্রভৃতি নদী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের এই অংশ গঙ্গা-মহানন্দা এবং তিস্তা – মহানন্দা প্লাবনভূমিকে বেষ্টন করে অবতীর্ণ।[174] এর মধ্যে এখানকার প্রধান জলাশয়গুলি যথাক্রমে-মহানন্দা, পুনর্ভবা, ও টাঙ্গন। এছাড়াও একাধিক বিল এবং নন্দদীঘির উপস্থিতি রয়েছে।[175] জগজ্জীবনপুরের ভৌগোলিক প্রেক্ষিতের আলোচনায় অন্যতম উল্লেখ্য দিক হল একাধিক স্তূপ বা ঢিবির উপস্থিতি যা স্থানীয়ভাবে ‘ভিটা’ নামে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও বড় ঢিবি তুলাভিটা, একে কেন্দ্র করেই মূলত উৎখননকার্য সম্পাদিত হয়েছিল।[176]

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসামগ্রী সহ মূলত একটি বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ (নন্দদির্ঘী বিহার) এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পাল রাজা মহেন্দ্রপালদেবের সময়কালীন বা তার তত্ত্বাবধানে নির্মিত বলে মনে করা হয়। এই মতের যথার্থতা প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত রয়েছে এই অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত পাল রাজবংশীয় শ্রী মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসন (চিত্র ১)। এই তাম্রশাসনটির সূত্রেই জানা যায় এই বৌদ্ধবিহারটি মহেন্দ্রপালদেবের সেনাপতি শ্রী বজ্রদেব কর্তৃক নির্মিত যার নামকরণে এসেছে

---

173 রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, পৃষ্ঠা- ৮৮-৯৮

174 পাঁজা, ‘জগজ্জীবনপুর অ্যান্ড বাণগড়ঃ নর্দান ওয়েস্ট বেঙ্গল’, পৃষ্ঠা- ২১১

175 রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, পৃষ্ঠা- ১৫

176 পাঁজা, ‘জগজ্জীবনপুর অ্যান্ড বাণগড়ঃ নর্দান ওয়েস্ট বেঙ্গল’, পৃষ্ঠা- ২১৭

জলাশয় নন্দদীর্ঘিকার নাম,[177] ইতিপূর্বে কোনও বৌদ্ধবিহারের নামের আগে জলাশয়ের নাম যুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়না যা সম্ভবত উক্ত সময়পর্বে স্থানীয় ক্ষেত্রে এই জলাশয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আভাষ দেয়।

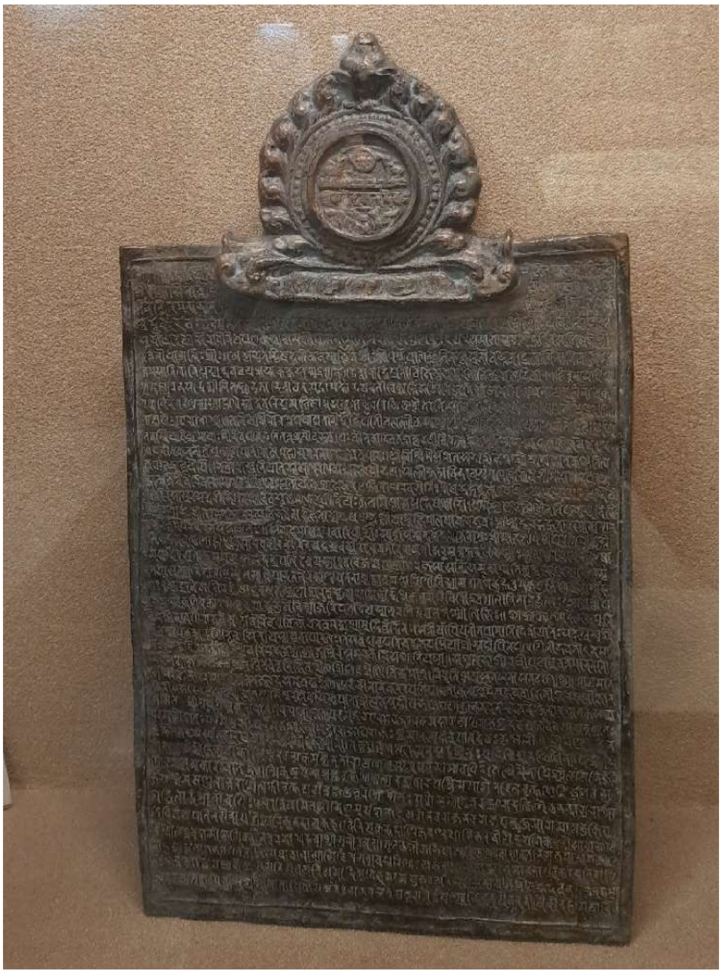

[177] পাঁজা, 'জগজ্জীবনপুর অ্যান্ড বাণগড়ঃ নর্দান ওয়েস্ট বেঙ্গল', পৃষ্ঠা- ২১৭

চিত্র ১- 'জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন'
সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা, ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

উপরিবর্ণিত তাম্রশাসনটির প্রাপ্তি সূত্রেই পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত তুলাভিটা স্তূপটিতে উৎখনন চালানো হয় (চিত্র-২)।[178] প্রাপ্ত তাম্রশাসন, সীলে উৎকীর্ণ লিপি, রেডিও কার্বন অনুসন্ধান ও অন্যান্য প্রত্নউপাদানের ভিত্তিতে প্রত্নকেন্দ্রটির সময়সীমা নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে নির্ধারণ করা হয়[179] এবং এই কেন্দ্রে মূলত পাল রাজবংশীয় নিদর্শনেরই আভাষ পাওয়া যায়, তার পূর্ব সময়কালের কোনরূপ সংস্কৃতির উপস্থিতি উক্ত স্থানে ছিলনা বলেই মনে করা হয়। বৃহৎ ইটের কাঠামোযুক্ত মঠ ও তার বিভিন্ন অংশ অংশ উন্মোচিত হয়। বৌদ্ধ মঠটির পরিকাঠামোগত নির্মাণ থেকে একে পূর্ব ভারতীয় অন্যান্য বৌদ্ধমঠ বিশেষত বিহারের এন্টিচকে অবস্থিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়।[180]

---

[178] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, পৃষ্ঠা-২৭

[179] পাঁজা, 'জগজ্জীবনপুর অ্যান্ড বাণগড়ঃ নর্দান ওয়েস্ট বেঙ্গল', পৃষ্ঠা- ২১৭

[180] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, পৃষ্ঠা- ২৬-৩২

চিত্র-৪ জগজ্জীবনপুর প্রত্নকেন্দ্র, সৌজন্যেঃ গনপথি সুবিয়া, রেম্যা ভি.পি- 'আর্কিটেকচার', আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত "হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ", ভলিউম ১, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ ২০১৮,পৃষ্ঠা-৫০৭

৩.২ মহাস্থানগড়:

বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম মহাস্থানগড়, আদি ঐতিহাসিক সময়কাল থেকে শুরু করে আদি মধ্যযুগীয় পর্বের পোড়ামাটি শিল্প ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এই প্রত্নস্থল। দামোদরপুর তাম্রপট্টোলী সমূহ, পাহাড়পুর তাম্রলিপি প্রভৃতি নানান সূত্রে দেখা যায় গুপ্তপর্বে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তৎকালীন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্য বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি, আর সেসময় বাংলার বৃহত্তম ভুক্তি বিভাগ ছিল 'পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি'[181] যার পরবর্তী একটি বিভাগ ছিল বরেন্দ্র বা

[181] রায়, *বাঙালীর ইতিহাস,* পৃষ্ঠা- ৩২১

রমারঞ্জন মুখার্জী, এস.কে.মাইতি – 'পাহাড়পুর কপারপ্লেট ইন্সক্রিপশন অফ দ্য গুপ্তা ইয়ার ১৫৯ (৪৭৯ এ ডি)', *করপাস অফ বেঙ্গল ইনস্ক্রিপশনস বিয়ারিং অন হিস্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল,* ক্যালকাটা,ফার্মা কে এল এম, ১৯৬৭ পৃষ্ঠা- ৫৩-৫৮

বরেন্দ্রী মণ্ডল।[182] পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির মুখ্য কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রনগর, ১৮৭৯-৮০ নাগাদ প্রত্ন অনুসন্ধান পর্বে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম সর্বপ্রথম এর সাথে 'মহাস্থান'কে শনাক্ত করেন।[183] আলোচ্য প্রত্নস্থলটি বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার করতোয়া নদী সন্নিকটে অবস্থিত।[184] নগরীটি প্রথম থেকেই সুরক্ষিত ছিল; নগর প্রাচীর ছাড়াও পূর্বে করতোয়া নদী, দক্ষিণে বারানসী খাল, পশ্চিমে গিলাতলা খাল ও উত্তরে কালীদহ সাগর চতুর্দিক থেকে একে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল যা প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল বলা যায় ।[185] মহাস্থানগড় সম্পর্কিত যে সাক্ষ্য সমগ্র প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রূপে বিবেচিত হয় তা হল মহাস্থানের সুবিস্তৃত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্রাহ্মী লিপিখন্ডের আবিষ্কার। একমাত্র এর দ্বারাই খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় -দ্বিতীয় শতকে বাংলার এক অংশের রাস্ট্রবিন্যাসের ধারণা পাওয়া যায় তথা বাংলায় মৌর্য শাসনের একমাত্র কেন্দ্র রূপে মহাস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার ইতিহাসে প্রাথমিক লিখিত উপাদান হিসেবে এই শিলালিপিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[186]

মহাস্থানগড় অঞ্চলে সর্বপ্রথম নিয়মমাফিক উৎখনন কার্য পরিচালিত হয় ১৯২৮-২৯ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে, এরপর কিছুকাল উৎখনন বন্ধ থাকার পর যথাক্রমে ১৯৬০-৬১ সালে এবং ১৯৮৮ সালে এই অঞ্চলে উৎখনন কার্য পরিচালিত হয় ও বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়। এরপর সর্বশেষ বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের প্রত্নতত্ত্ব বিদগণের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৩ সাল

---

[182] Jean-francois Salles, 'মহাস্থান', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা- ২২৭

[183] আফরোজ আকমাম – *মহাস্থান,* ঢাকা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৬

[184] এনামুল হক, 'মহাস্থানগড়- গ্রেট সিটাডেল', *বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস,* প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, নিউ দিল্লী, মার্গ ,২০০৩, পৃষ্ঠা- ৭৮

[185] হক, 'মহাস্থানগড়- গ্রেট সিটাডেল', পৃষ্ঠা- ৭৮

আফরোজ আকমাম, *মহাস্থান,* পৃষ্ঠা- ২৬

[186] রমারঞ্জন মুখার্জ্জী, এস.কে.মাইতি - *করপাস অফ বেঙ্গল ইনস্ক্রিপশনস, বিয়ারিং অন হিস্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল,* ক্যালকাটা ,ফার্মা কে এল এম, ১৯৬, পৃষ্ঠা ৩৯--৪০

ডি.আর.ভান্ডারকর- 'মরিয়ান ব্রাহ্মী ইনস্ক্রিপশন অফ মহাস্থান' ইন *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা,* হীরানন্দ শাস্ত্রী, কে.এন.দীক্ষিত, এন.পি.চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম- ২১, জনপথ, নিউ দিল্লী , গভঃ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩১-৩২, পৃষ্ঠা- ৮৩- ৯১

থেকে মহাস্থানগড় এর দুর্গ এলাকায় বিজ্ঞানসম্মত উৎখনন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ গৃহীত হয়।[187] বর্তমানে মহাস্থান সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনায় এই উৎখনন রিপোর্ট টিকেই সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরিউক্ত এই রিপোর্ট থেকেই দেখা যায় মহাস্থান দুর্গ এলাকায় আদি ঐতিহাসিক বাংলার অসংখ্য পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং উক্ত অঞ্চলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা কালে দেখা যায় সেগুলি মহাস্থান জাদুঘরে সুরক্ষিত ও প্রদর্শিত। কিন্তু আলোচ্য গবেষণা পত্রের প্রধান পরিসর অর্থাৎ আদি মধ্য যুগীয় মৃৎফলকের উপস্থিতি কিন্তু উক্ত দুর্গ এলাকায় পাওয়া যায়না তথা তাঁদের উৎখনন রিপোর্টে আদি মধ্যযুগীয় মৃৎ-ফলকের কোনও উল্লেখ নেই। বরং মহাস্থানের গড় এলাকার নিকটবর্তী একাধিক ঢিবির উপস্থিতি রয়েছে যেখানে আদি মধ্য যুগীয় মৃৎ ফলকের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ফলত আলোচ্য পরিসরে অবশ্যই তাদের উল্লেখ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় **বৈরাগীর ভিটা**, (চিত্র-৩) এটি করতোয়া নদীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মহাস্থান গড় এলাকার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কে.এন.দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে উৎখনন দ্বারা বেশ কিছু ইট নির্মিত মন্দিরের সন্ধান মেলে এবং একটিতে গুপ্ত পর্বীয় দুটি স্তম্ভের উপস্থিতি মেলে। পাশাপাশি প্রত্নবস্তু রূপে একাধিক মৃৎফলক ও মৃৎপাত্রের সন্ধান মেলে।[188]

---

[187] মহম্মদ শফিকুল আলম ও Jean-Francois SALLES, *ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়, ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯,* বাংলাদেশ, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৮২-৯৮

[188] ডঃ সৈফুদ্দিন চৌধুরী, আর্লি টেরাকোটা ফিগারিনস্ অফ বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ পৃষ্ঠা- ১২৪

চিত্র-৩ বৈরাগীর ভিটা, মহাস্থান, বগুড়া, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

এরপর অবশ্য উল্লেখ্য **বিহার ধাপ** (চিত্র-৪) ও **ভাসু বিহার** (চিত্র-৫ক, ৫খ) কেন্দ্রের কথা। ১৯৭৪-৭৫ এর উৎখনন দ্বারা যেখানে দুটি বৌদ্ধ বিহার ও একটি মন্দিরের সন্ধান সহ প্রায় সাতশ প্রত্নবস্তুর সন্ধান মেলে। যার মধ্যে বিপুল পরিমাণ পোড়ামাটি ফলক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মহাস্থান জাদুঘর সহ বাংলাদেশের একাধিক প্রত্নশালায় ভাসু বিহার থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটি ফলকের উপস্থিতি রয়েছে।[189]

[189] তদেব

চিত্র-৪ বিহার ধাপ, মহাস্থান, বগুড়া, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র- ৫ক, ভাসু বিহার, মহাস্থান, বগুড়া, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র-৫খ যোদ্ধা, ভাসু বিহার থেকে প্রাপ্ত মৃৎ ফলক, সৌজন্যে- মহাস্থান জাদুঘর, বগুড়া, বাংলাদেশ, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

আবার **১৯৩৪**-৩৫ এর উৎখননের ফলে একাধিক পোড়ামাটি ফলক পাওয়া যায় **গোকুল** ও **মেধ** নামক দুটি ঢিবি থেকে, যার মধ্যে গোকুলে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় মৃৎ ফলকে স্থাপত্যিক নকশা, ফুলের অলংকরণ কিংবা পশু ও মানব অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। মেধ থেকেও আনুমানিক পরবর্তী গুপ্ত পর্বের পোড়ামাটি ফলকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যদিও ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে দেখা যায় একটি নির্দিষ্ট পুরাকেন্দ্রই স্থানীয়ভাবে 'গোকুল মেধ' (চিত্র-৬) নামে পরিচিত।[190]

[190] তদেব,পৃষ্ঠা-১২৫

চিত্র-৬ গোকুল মেধ, মহাস্থান, বগুড়া, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

১৯৬১ সালের উৎখননের ফলে কিছু পাল বৈশিষ্ট্য সম্বলিত মৃৎফলক পাওয়া যায় **পরশুরামের প্রাসাদ** (চিত্র-৭) নামক ঢিবি থেকে।[191] এছাড়া মহাস্থানগড় এলাকার **উত্তরের দুর্গপ্রাকার** অংশে **১৯৬৬** পর্যন্ত সংঘটিত উৎখননের ফলে বিবিধ প্রত্নবস্তুর মধ্যে বৃহৎ সংখ্যক গুপ্ত ও পাল পর্বীয় পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়।[192] এছাড়াও উল্লেখযোগ্য **মঙ্গলকোট**, যেখানে একাধিক সর্পফনা যুক্ত মানবীয় অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় যা মহাস্থান জাদুঘরে সংরক্ষিত এবং ইতিপূর্বেই গবেষণা পত্রটির প্রথম অধ্যায়ে বিষয়টি উল্লিখিত। এছাড়া আদি মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্পের পরিসরে মহাস্থানের নিকটবর্তী অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্র হল পলাশবাড়ী (মতান্তরে বামনপাড়া), যেখানে আনুমানিক ষষ্ঠ -সপ্তম শতকীয় একটি বৈষ্ণব মন্দিরগাত্রে রামায়ণের কাহিনী সম্বলিত একাধিক মৃৎফলক পাওয়া যায়, যেগুলি বর্তমানে বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত।

[191] তদেব,পৃষ্ঠা-১২৫

[192] তদেব, পৃষ্ঠা-১২৫

আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য অধ্যায়ে এর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। মোটামুটিভাবে মহাস্থানে আদি মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্পের প্রসার সম্পর্কে আলোচনায় এই কেন্দ্রগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

চিত্র- ৭ পরশুরামের প্রাসাদ, মহাস্থান, বগুড়া, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

৩.৩ পাহাড়পুর:

বাংলার মৃৎশিল্প ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পাহাড়পুর, বিশেষরূপে বাংলায় পালপর্বীয় টেরাকোটা শিল্পধারার আলোচনায় বিশেষ নাম এই পাহাড়পুর। আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বিশেষ জনপ্রিয় বৌদ্ধবিহার সোমপুর মহাবিহারের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার অধীনস্ত পাহাড়পুর গ্রামে।[193] এই বৌদ্ধবিহারকে কেন্দ্র করেই প্রায় সব মিলিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গী ও বিষয়বস্তু সম্বলিত আনুমানিক ২৮০০ পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় এই প্রত্নস্থলে। পাহাড়পুর আদতে বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পধারার ইতিহাসে বিশেষরূপে পাল শৈল্পিক ঐতিহ্যকে নির্দিষ্ট রূপদান করে বলে মনে করা হয়ে থাকে।

সাধারণত মনে করা হয় পালসম্রাট ধর্মপাল এই বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন। বিস্তীর্ণ সমভূমির মাঝে এক সুউচ্চ কাঠামোর অবস্থান আপাতভাবে পাহাড়ের ন্যায় মনে হত যা থেকে পাহাড়পুর নামকরণটি এসেছে বলে মনে করা হয়।[194] অপরদিকে এই উৎখননকৃত বিহার ও স্তূপটির প্রাচীন নাম অর্থাৎ সোমপুর নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় উৎখননে প্রাপ্ত বিবিধ পোড়ামাটি সীলমোহর থেকে যেখানে 'ধর্মপালদেব এর সোমপুর মহাবিহারের ভিক্ষুসংঘ' ("Of the organization of the monks belonging to the great Somapur monastery of Dharmapaladeva") পংক্তির উল্লেখ রয়েছে।[195] উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই এই কেন্দ্রটি নানাভাবে বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং ক্রমে একাধিক উৎখনন পরিচালিত হয় যার মধ্যে কে.এন.দীক্ষিত কর্তৃক প্রকাশিত উৎখনন রিপোর্টটি সোমপুর মহাবিহার সংক্রান্ত অদ্যাবধি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রূপে পরিগণিত হয়। উৎখননের ফলে স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় এই অঞ্চলে এবং সমগ্র ক্ষেত্রটিকে মূলত চারটি অংশে চিহ্নিত করা হয়, যথা- ১) ১৭৭ টি বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাস ও উপাসনার কক্ষ ২) কেন্দ্রীয় মন্দির ৩)প্রাঙ্গন চত্বর ও তার সংলগ্ন অংশে স্নান বা শৌচকর্মাদির উদ্দেশ্যে নির্মিত কাঠামো ৪) সত্যপীরের ভিটায় অবস্থিত দেবী তারাকে উৎসর্গীকৃত মন্দির।[196]

---

[193] রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর, বেঙ্গল,* মেমোয়ার্স অফ দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, নং- ৫৫,জনপথ, নিউ দিল্লী, দ্য ডিরেক্টর জেনারেল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১

[194] স্বাধীন সেন,মহম্মদ শফিকুল আলম- 'পাহাড়পুর', পৃষ্ঠা- ৩৫১- ৩৫৩

[195] দীলিপ কুমার চক্রবর্তী, 'পাহাড়পুরঃ বুদ্ধিষ্ট কমপ্লেক্স অফ আর্লি বেঙ্গল', ইন *বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস* , নিউ দিল্লী, মার্গ, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৫২

[196] স্বাধীন সেন,মহম্মদ শফিকুল আলম- 'পাহাড়পুর', পৃষ্ঠা- ৩৫৬
দীলিপ কুমার চক্রবর্তী, 'পাহাড়পুরঃ বুদ্ধিষ্ট কমপ্লেক্স অফ আর্লি বেঙ্গল', পৃষ্ঠা- ৫৩

উল্লিখিত সমস্ত কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্দিরটি (চিত্র-৮) শিল্পইতিহাসের নিরিখে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এটি মহাবিহারের অঙ্গনের মধ্যবর্তী স্থানে ক্রুশাকৃতি পরিকল্পনায় নির্মিত। কেন্দ্রীয় মন্দিরটির কাঠামো বিন্যাসের প্রেক্ষিতে একে 'সর্বোতভদ্র' (চতুর্দিকে চারটি প্রবেশপথ সহ বর্গাকৃতি মন্দির) শৈলীর মন্দির বলে উল্লেখ করা হয়[197]। এই মন্দিরের দেওয়াল গাত্রের বহির্ভাগই মূলত অজস্র পোড়ামাটি ফলক দ্বারা অলংকৃত ছিল।(চিত্র-৯) এখানকার কাঠামোর সাথে বিহারের অ্যান্টিচকের বিক্রমশীলা মহাবিহার এবং বাংলাদেশের লালমাই ময়নামতী অঞ্চলের বেশ কিছু বৌদ্ধবিহারের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। বিশেষ উল্লেখ্য, বৌদ্ধবিহারের এই স্থাপত্য পরিকাঠামো পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন মায়ানমার, জাভা ও কম্বোডিয়াতেও।[198] এছাড়াও প্রাঙ্গন এলাকায় অন্যান্য কিছু কাঠামোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে কিছু নিবেদন স্তূপ, কেন্দ্রীয় মন্দিরটির অনুকরণে ক্ষুদ্র মন্দির সংস্করণ, রান্নাঘর ও ভোজনকক্ষ, কুয়ো ইত্যাদি বিদ্যমান। অপরদিকে মঠের বাইরের দিকে দক্ষিণ ভাগে লক্ষ করা যায় শৌচকক্ষ, একটি স্নানঘাট এবং গন্ধেশ্বরী মন্দির। এছাড়া দেবী তারাকে উৎসর্গীকৃত সত্যপীরের মন্দিরটি অবস্থিত ছিল মঠের পূর্ব প্রান্তে।[199]

---

[197] স্বাধীন সেন,মহম্মদ শফিকুল আলম- 'পাহাড়পুর', পৃষ্ঠা- ৩৫৯
বাংলাপিডিয়া

[198] স্বাধীন সেন,মহম্মদ শফিকুল আলম- 'পাহাড়পুর', পৃষ্ঠা- ৩৫৯

[199] স্বাধীন সেন,মহম্মদ শফিকুল আলম- 'পাহাড়পুর', পৃষ্ঠা- ৩৫৮-৩৬০

চিত্র-৮ কেন্দ্রীয় মন্দির কাঠামো, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র- ৯ পোড়ামাটি ফলক দ্বারা অলংকৃত কেন্দ্রীয় মন্দিরের দেওয়ালগাত্র, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

৩.৪ অ্যান্টিচক:

পাহাড়পুর আলোচনা সূত্রেই উল্লেখ করতে হয় বাংলার নিকটবর্তী ভূখণ্ড তথা দক্ষিণ বিহারের টেরাকোটা সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল অ্যান্টিচক বা বিক্রমশীলা মহাবিহার এর কথা। কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই উভয় কেন্দ্রই রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাল শাসনাধীনের অন্তর্গত ছিল এবং স্থাপত্যিক, শৈল্পিক প্রেক্ষিত থেকে সর্বতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐতিহ্যের অনুসারী। ফলে বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে আবশ্যিকভাবে এর উল্লেখ করতে হয়। এটি পাল যুগের (অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী) একটি বিশিষ্ট মঠ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। খননকার্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, বর্গাকার একটি বৃহৎ মঠ প্রাঙ্গন উন্মোচিত হয়েছে, যা তেরোটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় মন্দির, যেখানে দুটি প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে, ১৫ মিটার উচ্চতার একটি ক্রুশাকৃতি স্তূপ এবং ২৫৩টি মঠকক্ষ, যার মধ্যে কয়েকটি অনন্য বৃত্তাকার কক্ষ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাঠামোর মধ্যে রয়েছে একটি বিশাল প্রবেশদ্বার, অসংখ্য ভোটিভ স্তূপ ইত্যাদি। অবশ্যই রয়েছে টেরাকোটা ফলক ও মূর্তি, যেখানে বিবিধ পশু পাখি, যোদ্ধা, বৌদ্ধ দেবদেবী সহ একাধিক চিত্র ফুটে উঠেছে, যা জগজ্জীবনপুর ও পাহাড়পুরের মতো অন্যান্য পাল কেন্দ্রের শিল্পকর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও লিপি সম্বলিত মাটি ও ব্রোঞ্জের শিলমোহর, লিপি সম্বলিত প্রস্তর ভাস্কর্য প্রভৃতি বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিসরে এর গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরে।[200] (চিত্র- ১০)

[200] রজত স্যান্যাল, 'অ্যান্টিচক' , পৃষ্ঠা- ১৩১-১৪৩

চিত্র- ১০ কেন্দ্রীয় মন্দির, বিক্রমশীলা মহাবিহার, বিহার, ভারত। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, জানুয়ারি ২০২০

EARLY MEDIEVAL TERRACOTTA SITES OF SAMATATA REGION

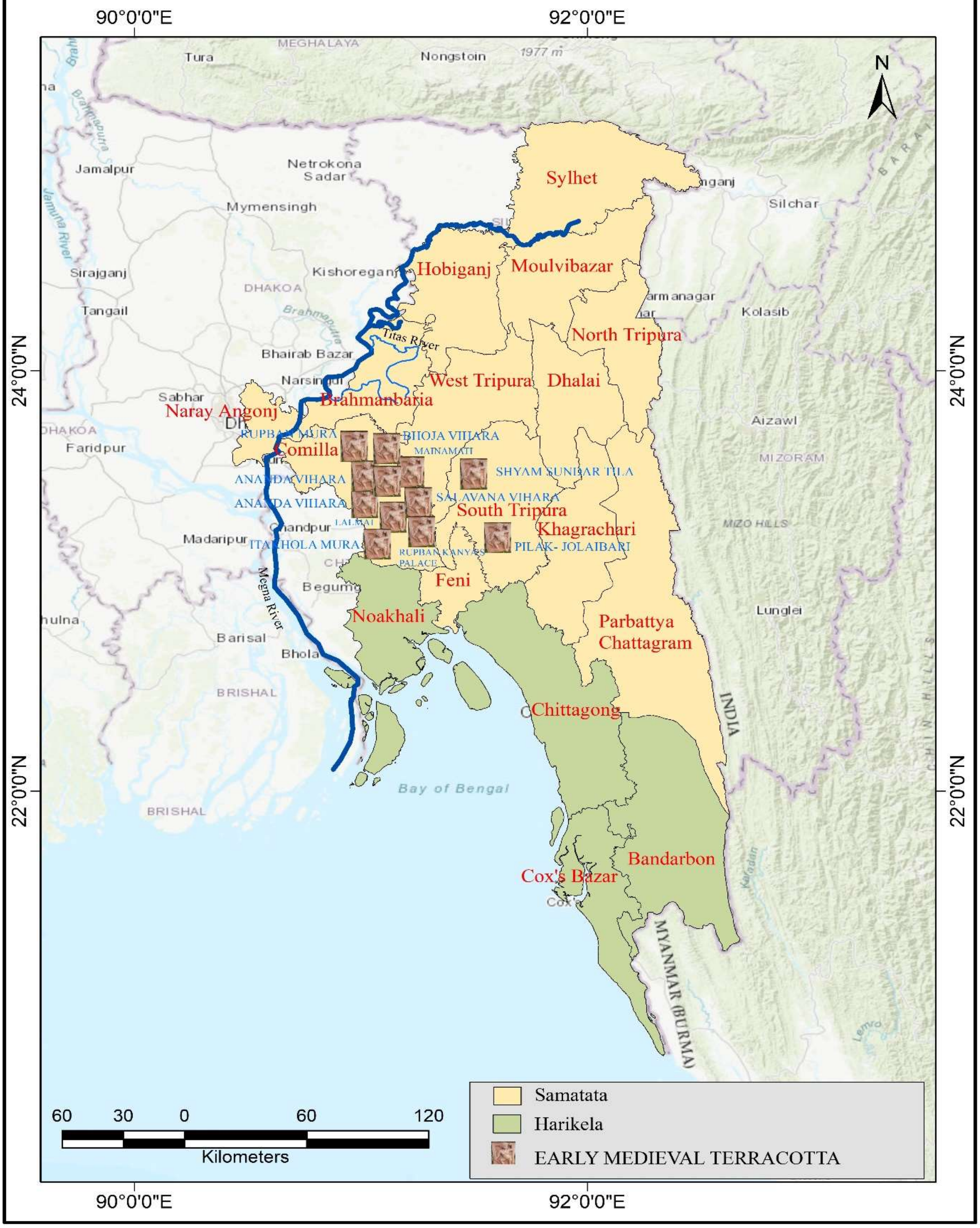

মানচিত্র-২ সমতট ও সন্নিহিত অঞ্চল ভুক্ত আদি মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নকেন্দ্র সমূহ, গবেষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত।

৩.৫ ময়নামতী:

আলোচ্য পরিসরে শেষ কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল ময়নামতী। একাধিক বৌদ্ধবিহারের সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয় এই অঞ্চলে। এটি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত এবং ভৌগোলিক দিক থেকে ময়নামতী প্রাচীন সমতট ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল, আর সমতটের রাজধানী ছিল দেবপর্বত। সমতট প্রাচীন বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ভূখণ্ড ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের উপকূলীয় সমভূমি। মেঘনার পূর্ব এলাকায় কুমিল্লা- নোয়াখালী- চিটাগাং ও সন্নিহিত সমতল অঞ্চলে ছিল এর অবস্থান। এছাড়াও বর্তমান ত্রিপুরার কিছু অংশ এবং উত্তর ও দক্ষিণার্ধে যথাক্রমে শ্রীহট্ট ও হরিকেল উপবিভাগ আবর্তিত ছিল। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে মূলত সুরমা ও মেঘনার প্লাবনভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল, ত্রিপুরার উপরিভাগ (Tippera surface) এবং পূর্বে লালমাই পার্বত্য এলাকাকে কেন্দ্র করে এই সমতট অঞ্চল গঠিত ছিল।[201] এই সমতটের অস্তিত্ব প্রথম পাওয়া যায় সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে (৪র্থ শতক)। আবার বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসন থেকে (৫০৭ খ্রিস্টাব্দ) ময়নামতী-দেবপর্বতের আবির্ভাবের পূর্বেই সংলগ্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতির আভাষ পাওয়া যায় বলে গবেষকরা অনুমান করেছেন। সপ্তম থেকে একাদশ শতকে খর্গ, রাত, দেব এবং চন্দ্র বংশীয় রাজারা ময়নামতী-দেবপর্বত অঞ্চলে রাজত্ব করেন যার মধ্যে রাত বংশীয়রা ছাড়া সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।[202] অর্থাৎ পূর্ব ভারতের উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধকেন্দ্র হিসেবে এই অঞ্চল যে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিল সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক পর্যায়ের সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের ফলে পঞ্চাশ এর ও অধিক প্রত্নস্থল এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় এবং **১৯৫৫-১৯৬৩** সময়কালে আবিষ্কৃত কেন্দ্র কুটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়া এবং শালবন বিহারে উৎখনন কার্য পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে ‘ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি, গভর্মেন্ট অফ

---

[201] আব্দুল মোমিন চৌধুরী, আকসাদুল আলম- ‘হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি’, পৃষ্ঠা-২৪

[202] গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য, ‘ময়নামতীঃ সিটি অন দ্য রেড হিলস্’, *বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস,* প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, নিউ দিল্লী, মার্গ ,২০০৩ পৃষ্ঠা- ৬৬

বাংলাদেশ' উপরিউক্ত পঞ্চাশটি কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় ১৩টি কেন্দ্রে খনন চালায়, যার মধ্যে শালবন বিহার, কুটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়াতে কাজ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রূপবান মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার নামক আরও কিছু কেন্দ্রে খননকার্য পরিচালনা করা হয়।[203] জগজ্জীবনপুর, পাহাড়পুর বা মহাস্থানগড়ের মতই ময়নামতীতেও বিবিধ প্রত্নক্ষেত্রেও ঐশ্বরিক, অর্ধ-ঐশ্বরিক অবয়ব, পশু-পাখি, মানব জীবনের বিভিন্ন কর্মরত দৃশ্য প্রভৃতির বিস্তৃত উপস্থাপন রয়েছে যা বাংলার শিল্প ইতিহাসকে এক ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে।

মহাস্থানের ন্যায় ময়নামতীর মৃৎশিল্প আলোচনা করতে গেলেও একাধিক পৃথক পুরাকেন্দ্রের মৃৎভাস্কর্যের কথা উঠে আসে। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত ময়নামতী আদতে একাধিক পুরাক্ষেত্রের সমাহার। যার মধ্যে অধিকাংশ কেন্দ্র থেকে অজস্র মৃৎফলকের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে সংক্ষেপে উক্ত মৃৎভাস্কর্যের প্রাপ্তিস্থলগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হল।

এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায় **রূপবান মুড়া,** (চিত্র-১১) যা ময়নামতী অঞ্চলে উৎখননকৃত প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে সম্ভবত প্রথম। এই কেন্দ্রে একটি বর্গাকার বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া যায় এবং একাধিক মৃৎফলকের সন্ধান মেলে যা বিহারের দেওয়ালগাত্রে সজ্জিত ছিল বলে অনুমিত।[204] এই বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির থেকে বৃহৎ আকৃতির বেলে পাথরে নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়।[205] একটি অষ্টভুজ নিবেদন স্তূপের ও উপস্থিতি লক্ষণীয় প্রত্নকেন্দ্রটিতে। (চিত্র-১২)

---

203 ভুঁইয়া, 'ময়নামতী',পৃষ্ঠা – ২৬৩-২৬৪

204 চৌধুরী, আর্লি টেরাকোটা ফিগারিনস্ অফ বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-১৩২

205 ভুঁইয়া, 'ময়নামতী',পৃষ্ঠা –২৬৭

চিত্র-১১ রূপবান মুড়া, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র-১২ অষ্টভুজাকৃতি নিবেদন স্তূপ, রূপবান মুড়া, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

তবে এই অঞ্চলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র **শালবন বিহার** (চিত্র-১৩ক,খ)। এখানে খননের ফলে পাহাড়পুরের ন্যায় একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ মঠ আবিষ্কৃত হয়েছে যা ময়নামতীতে প্রাপ্ত বৌদ্ধমঠের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এর কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ মন্দির কাঠামোর ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত, দেববংশীয় শ্রী ভবদেব সপ্তম শতকের শেষ কিংবা অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে এটি নির্মাণ করেছিলেন; যার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত রয়েছে 'শ্রী-ভবদেব মহা বিহার-আর্য-ভিক্ষু-সংঘ' খোদিত টেরাকোটা সীলের উপস্থিতি।[206] উৎখননের ফলে খর্গ বংশীয় শাসক দেবখর্গ ও বালভট্ট দ্বারা প্রণীত ৩টি তাম্রশাসন, যার ভিত্তিতে অনুমান করা হয় সম্ভবত তারা এই বৌদ্ধমঠে ভূমিদান করেছিলেন। আরও ৪টি তাম্রশাসন মেলে দেব শাসনপর্বে প্রণীত বলে মনে করা হয়। এছাড়া অপর একটি ভগ্নপ্রায় তাম্রফলকে একটি শায়িত ষাঁড়ের প্রতিকৃতি সহ 'মহারাজা শ্রী বৈন্যগুপ্তস্য' খোদিত আছে, যা এই কেন্দ্রটির প্রাচীনত্বকে বৈন্যগুপ্তের সময়কাল তথা ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দে নিয়ে যায় বলে গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য মন্তব্য

[206] ভুঁইয়া, 'ময়নামতী',পৃষ্ঠা –২৬৮-২৬৯

করেছেন।[207] যদিও মনে রাখা দরকার তাম্রফলক সহজেই স্থানান্তরযোগ্য, ফলত পারিপার্শ্বিক অন্যান্য নথীও বিশ্লেষণ প্রয়োজন যেকোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে। তাম্রশাসন ছাড়াও বৃহৎ সংখ্যক প্রস্তর ও ব্রোঞ্চ অবয়ব, সীলমোহর, বিবিধ বিষয়বস্তু সম্পন্ন অসংখ্য পোড়ামাটি ফলক (চিত্র-১৪) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় যা বর্তমানে শালবন বিহার পুরাকেন্দ্র সংলগ্ন ময়নামতী জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। পাশাপাশি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সম্বলিত ৩টি মজুত ভাণ্ডার পাওয়া যায় এই অঞ্চল থেকে যার মধ্যে প্রথম ভাণ্ডারটিতে একটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের, একটি দেব বংশের ও একটি গুপ্তশৈলীর অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। এছাড়া অপর ২টি ভাণ্ডারে যথাক্রমে ৫২ ও ১৭২টি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়, যার সম্মুখভাগে 'পট্টিকের' অথবা 'ললিতকর ধর্মবিজয়' পংক্তি খোদিত এবং পশ্চাৎভাগে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। গুপ্ত পরবর্তী অধ্যায় থেকে প্রাক ইসলামিক সময়পর্বে এই অঞ্চলেই প্রথম বিপুল পরিমাণ সমৃদ্ধ রৌপ্যমুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়।[208] এসকল পুরাবস্তুর প্রাপ্তি শিল্প ইতিহাসে তো বটেই, দক্ষিণ পূর্ব বাংলার সার্বিক ইতিহাসেও এই কেন্দ্রকে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করে।

চিত্র-১৩ক শালবন বিহার কেন্দ্রীয় মন্দির, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

[207] ভট্টাচার্য, 'ময়নামতীঃ সিটি অন দ্য রেড হিলস্', পৃষ্ঠা- ৬৭-৬৯

[208] তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০

চিত্র-১৩খ শালবন বিহারের প্রাঙ্গন কেন্দ্রে উপস্থিত একাধিক কাঠামো ও নিবেদন স্তূপ, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র-১৪ শালবন বিহার থেকে আবিষ্কৃত মৃৎফলক , সৌজন্যে- ময়নামতী মিউজিয়াম, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২।

ময়নামতীর অন্যান্য বৌদ্ধবিহারগুলির মধ্যে **আনন্দ বিহার** সর্ববৃহৎ, এবং সমগ্র বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তা দ্বিতীয় বৃহত্তম। এটি বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল বলে অনুমান করা হয়। সপ্তম শতকের শেষ কিংবা অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে দেব বংশীয় তৃতীয় শাসক আনন্দদেব এই বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন।[209] বিবিধ মৃৎফলক (চিত্র-১৫,১৬) সহ কিছু ব্রোঞ্চ অবয়ব ও আলংকারিক ইটের সন্ধান মেলে এই অঞ্চলে।[210]

চিত্র- ১৫

চিত্র-১৬

চিত্র-১৫ পোড়ামাটির সিলিং এ অঙ্কিত অক্ষোভ্য, আনন্দ বিহার, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। সৌজন্যে- বুলবুল আহমেদ (সম্পা.) *বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ, নিমফিয়া পাবলিকেশনস,২০১৫, পৃষ্ঠা- ৯১

চিত্র-১৬ পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ পদ্ম, আনন্দ বিহার, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। সৌজন্যে- বুলবুল আহমেদ (সম্পা.) *বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ, নিমফিয়া পাবলিকেশনস,২০১৫, পৃষ্ঠা- ৯১

এই অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র **ভোজ বিহার**, (চিত্র-১৭) একটি বর্গাকার বৌদ্ধমঠ এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে একটি ক্রুশাকৃতি মন্দির উন্মোচিত হয়েছে এই কেন্দ্রে। এর সময়কাল

[209] ভুঁইয়া, 'ময়নামতী', পৃষ্ঠা- ২৭০

[210] চৌধুরী, আর্লি টেরাকোটা ফিগারিনস্ অফ বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-১৩১

হিসেবে মোটামুটি নবম-দশক শতক অনুমান করা হয়ে থাকে। শালবন বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ন্যায় এখানেও বিবিধ বিষয়াদি সম্পন্ন পোড়ামাটি ফলকের অলংকরণ লক্ষ করা যায়।[211]

চিত্র-১৭ ভোজ বিহার, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। সৌজন্যে- বুলবুল আহমেদ (সম্পা.) *বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ,* বাংলাদেশ, নিমফিয়া পাবলিকেশনস,২০১৫, পৃষ্ঠা-৯৯

ভোজ বিহারের সন্নিকটেই অবস্থিত **কুটিলা মুড়া,** (চিত্র-১৮) যেখানে মোট বারোটি স্তূপ ও তিনটি চৈত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যার মধ্যে রয়েছে ত্রিরত্ন স্তূপ যা যথাক্রমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক। এই কেন্দ্রে একাধিক টেরাকোটা সিলিং ও পোড়ামাটির নিবেদন স্তূপের উপস্থিতি পাওয়া যায়। পূর্বোল্লিখিত কেন্দ্রগুলির পোড়ামাটি ফলকের কথা অদ্যাবধি পাওয়া যায়না তবে সার্বিক ভাবে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিসরে এই কেন্দ্র বিশেষ তাৎপর্য, কেননা কেবল বাংলা নয় সমগ্র উপমহাদেশে এরূপ ত্রিরত্ন স্তূপ অন্যত্র লক্ষণীয় নয় বলেই মনে করা হয়।[212]

---

211 ভুঁইয়া, 'ময়নামতী',পৃষ্ঠা – ২৭০-২৭২

212 বুলবুল আহমেদ (সম্পা.) *বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ,* বাংলাদেশ, নিমফিয়া পাবলিকেশনস,২০১৫, পৃষ্ঠা-৮৮

চিত্র-১৮ ত্রিরত্ন স্তূপ বিশিষ্ট কুটিলা মুড়া, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। সৌজন্যে- বুলবুল আহমেদ (সম্পা.) *বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ, নিমফিয়া পাবলিকেশনস,২০১৫, পৃষ্ঠা- ৮৮

পাশাপাশি উল্লেখ করা চলে **রানীর বাংলো বা রানী ময়নামতীর প্রাসাদ** কেন্দ্রটির কথা যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে শালবন বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ন্যায় ক্রুশাকৃতি স্থাপত্য কাঠামো উন্মোচিত হয়েছে।[213] যদিও বিহারের অস্তিত্ব ছিল কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনো। এই কেন্দ্র থেকেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় যা সমকালীন গ্রাম্য জীবনযাত্রা সম্পর্কে আভাষ দেয়।[214]

এছাড়া আলোচ্য পরিসরে অন্যতম ও শেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র **ইটাখোলা মুড়া**, (চিত্র-১৯) এখানেও মন্দির ও বিহারের সন্ধান পাওয়া যায় এবং উল্লেখযোগ্য স্টাকো অভোক্ষ মূর্তি, ৬টি ব্রোঞ্চ অবয়ব, মুদ্রা প্রভৃতি সহ বেশ কিছু পোড়ামাটি ফলকের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।[215] ময়নামতী অঞ্চলের

---

[213] ভুঁইয়া, 'ময়নামতী',পৃষ্ঠা – ২৭০-২৭২

[214] আহমেদ (সম্পা.), *বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ,* পৃষ্ঠা-৯৯

[215] আহমেদ (সম্পা.), *বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ* , পৃষ্ঠা- ৮৩-৮৬

পোড়ামাটি সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। ময়নামতীর সমস্ত কেন্দ্রে এখনও যথাযথ উৎখনন কার্য সম্পন্ন হয়নি, আরও ব্যাপক উৎখনন কার্য সম্ভব হলে তা ভবিষ্যতে দক্ষিণ পূর্ব বাংলা তথা সমগ্র প্রাচীন বঙ্গীয় ইতিহাসকে যে বিশেষ রূপে সমৃদ্ধ করবে বলা বাহুল্য।

চিত্র-১৯ ইটাখোলা মুড়া, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

৩.৬ পিলাকঃ

অন্যদিকে ত্রিপুরা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, যা তার সমৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনের জন্য সুপরিচিত। পিলাক, বক্সানগর, উনকোটি, দেবতামুরা এবং উদয়পুরের মতো স্থানগুলোতে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং উপজাতীয় সংস্কৃতির এক চমৎকার মিশ্রণ দেখা যায়। এগুলো ৫ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে গঠিত এবং পাল যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের অসাধারণ নিদর্শন বহন করে। এই স্থানগুলো শুধুমাত্র ত্রিপুরার স্থানীয় ইতিহাস নয়, বরং ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সংযোগও প্রকাশ করে। তবে মৃৎশিল্পের পরিসরে মূলত তাৎপর্যপূর্ণ পিলাক, এখানকার শ্যাম সুন্দর টিলায় একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ স্তূপ উন্মোচিত হয়েছে, যা মহাযান ও বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। ৯ম থেকে ১০ম শতাব্দীতে বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম এখানে প্রধান ধর্ম ছিল। শ্যামসুন্দর টিলার খননে পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে, যেখানে পুরাণ, ধর্মীয় প্রতীক, এবং দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্য চিত্রিত রয়েছে। এই ফলকগুলো শিল্পগত উৎকর্ষ এবং পাল যুগের শিল্পধারার প্রতিফলন। ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলো বাংলাদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্রগুলোর সাথে সরাসরি সংযুক্ত। পাহাড়পুর, ময়নামতী, বিক্রমশীলার মতো স্থানগুলোর সাথে শিল্পকলা, ধর্ম এবং স্থাপত্যের মিল ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে।[216]

আলোচ্য পরিসরে তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্রগুলির ভৌগোলিক ও পুরাতাত্ত্বিক পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস করা হল। কিন্তু যেকোনও প্রত্নস্থলের অন্যতম অপরিহার্য দিক হল তার বিপুল পুরাসামগ্রীর আবিষ্কার, আর পোড়ামাটি ছাড়াও অজস্র প্রত্নউপাদানের সমাহার এই প্রত্নকেন্দ্রগুলি; যারা সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। ফলত সমস্ত প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত উপাদান সম্পর্কে একত্রে ছকের মাধ্যমে সংক্ষেপে আভাষ দেওয়ার প্রয়াস করা হল।

---

[216] মন্দিরা দাশগুপ্ত ও রাজেশ ভৌমিক, ‘দ্য আর্কিওলজিকাল সাইটস অফ ত্রিপুরাঃ আ স্টাডি অফ দ্য এক্সকাভেটেড সাইটস অফ পিলাক, বক্সানগর, উনকোটি, দেবতামুড়া অ্যান্ড দ্য টেম্পলস অফ উদয়পুর’, *হেরিটেজঃ জার্নাল অফ মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্টাডিস ইন আর্কিওলজি*, ভলিউম-৮.২, পৃষ্ঠা- ৭১২-৭২৯

৪. আলোচিত প্রত্নকেন্দ্রগুলির পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহঃ

প্রত্নদ্রব্য	প্রাপ্তিস্থল ও বিবরণ
মুদ্রা	আলোচ্য ক্ষেত্রে পাহাড়পুরে পাঁচটি বৃত্তাকার তাম্রমুদ্রা, বাগদাদের খলিফা হারুন-উর-রশিদের একটি রৌপ্য মুদ্রা, বেশ কিছু সুলতানী আমলের রৌপ্য মুদ্রা,১টি আকবরের মুদ্রা। এছাড়া জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কীর একটি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে।[217] মহাস্থানগড় থেকে বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য পাঞ্চ মার্কড মুদ্রা, এবং রৌপ্য ও তাম্র নির্মিত একাধিক মুদ্রার সন্ধান মেলে।[218] এছাড়া ময়নামতী থেকে প্রাপ্ত বেশ কিছু স্বর্ণ মুদ্রা ও প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা, মূলত হরিকেল-পট্টিকের ধাঁচের রৌপ্যমুদ্রা (উচ্চ ধাতব বিশুদ্ধি সম্পন্ন এবং 'হরিকেল' বা 'পট্টিকের' নাম খোদিত) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[219]
পুঁতি	জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত প্রায় ২৯টি পুঁতির মধ্যে ২০টি পোড়ামাটি এবং বাকি কাঁচ বা অন্যান্য পাথর যথা কার্নেলিয়ান, চ্যালসেডানি প্রভৃতি নির্মিত যা অধিকাংশই গোলাকৃতি এবং অনুজ্জ্বল লাল বা ধূসর কালো বর্ণের।[220] পাশাপাশি মহাস্থানগড়[221], পাহাড়পুর[222] প্রভৃতি সর্বত্রই বিভিন্ন মাপ ও আকৃতির অ্যাজেট, কার্নেলিয়ান প্রভৃতি রত্ননির্মিত পুঁতির পাশাপাশি নানা বর্নের কাঁচের ও পোড়ামাটি পুঁতি পাওয়া যায়।
মৃৎপাত্র	জগজ্জীবনপুরে মোটামুটি তিনপ্রকার মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা- অনুজ্জ্বল লাল ও বাদামী, ধূসর এবং কিছু কালচে মৃৎপাত্র। যার মধ্যে রয়েছে হাড়ি, বাটি, প্রদীপ, ঘটিজাতীয় দ্রব্য প্রভৃতি। এছাড়াও কিছু শ্বেতবর্ণীয় মৃৎপাত্রের সন্ধান মেলে যা কোনওভাবে বাইরে থেকে

[217] দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর,* পৃষ্ঠা- ৮৬-৮৭

[218] মহম্মদ মোশারফ হোসেন, 'রিসেন্ট ডিসকভারি অফ আ হোর্ড অফ পাঞ্চ মার্কড কয়েনস অ্যাট মহাস্থানগড়', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,* খণ্ড- ৪, আই-সি-এস-বি-এ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৪৭৭-৪৮৩

[219] সুস্মিতা বসু মজুমদার, 'মিডিয়া অফ এক্সচেঞ্জঃ রিফ্লেকশনস অন দ্য মানিটারি সিস্টেম', পৃষ্ঠা- ২৩৩-২৬৮

[220] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা- ৩৮

[221] শাহ সুফী মোস্তাফিজুর রহমান, 'রিসেন্ট ডিসকভারি অফ গ্লাস বিডস ফ্রম মহাস্থানগড়ঃ অ্যান আর্কিওলজিক্যাল পার্সপেকটিভ',ইন *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট*, খন্ড-৪, আই-সি-এস-বি-এ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৬৭-৭৬

[222] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* ৮৮-৮৯

	আসে বলে অনুমান করা হয়।[223] প্রায় একই ধাঁচ দেখা যায় অন্য প্রত্নকেন্দ্রগুলিতেও, যেমন মহাস্থানগড়েও ভিন্ন রং ও ধাঁচের (থালা, বাটি, বয়াম) উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, ধূসর মৃৎপাত্র, কালো ও লাল বর্ণীয় মৃৎপাত্র, কালো এবং লাল বর্ণীয় পিচ্ছিল পদার্থ যুক্ত পাত্র প্রভৃতি লক্ষণীয়।[224] পাহাড়পুরে দশম-দ্বাদশ শতকীয় প্রচুর মৃৎপাত্রের টুকরো পাওয়া গেছে, আড়াআড়ি রেখার নকশাযুক্ত পাল যুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। আবার প্রাক বিহার স্তর তথা প্রাক পাল পর্বীয় যুগের অসংখ্য প্লেট জাতীয় মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি লাল থেকে হলদে সবুজ বর্ণের ছিল। হাড়ির মত কিছু পাত্র, চোঙাকৃতি পাত্র, বড় থালা, প্রদীপ প্রভৃতি নিদর্শন পাওয়া গেছে।[225] ময়নামতীতেও একই ধাঁচের কিছু দৈনন্দিন ব্যবহার যোগ্য মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।
প্রস্তর উপাদান	প্রস্তর মূর্তির মধ্যে পাহাড়পুরে কালো ব্যাসল্ট পাথরে নির্মিত ঘোড়ায় উপবিষ্ট রেবন্ত মূর্তি, পদ্মে উপবিষ্ট চতুর্ভুজা মনসা, স্টিয়েটাইট পাথরের মঞ্জুশ্রী অবয়ব, বোধিস্বত্ত্ব মস্তক, কৃষ্ণ জীবনীর বিভিন্ন উপস্থাপনা, এছাড়াও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর উপস্থাপনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিছু উপস্থাপনা অপরিণত হলেও কিছু ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা ও গতিশীলতা প্রকাশিত, কিছু ভাস্কর্যে গুপ্ত প্রভাব লক্ষণীয় বলে মনে করা হয়।[226] ময়নামতীতে খুব বেশি প্রস্তর ভাস্কর্যের উল্লেখ না থাকলেও রূপবান মুড়ায় ২.৪৪ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট বেলেপাথরে নির্মিত দন্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তি, কুটিলা মুড়া থেকে প্রাপ্ত বিবিধ পোড়ামাটি অবয়ব দ্বারা পরিবেষ্টিত ধূসর শ্লেটপাথরে নির্মিত ধ্যানমগ্ন অবলোকিতেশ্বর অবয়ব, চন্দ্রবংশীয় ২টি বৃহৎ কালোপাথরে নির্মিত শাক্যমুনী অবয়ব, অষ্টবাহু মারিচি অবয়ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[227] এছাড়া জগজ্জীবনপুরের কালো প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি[228] অন্যতম।

[223] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা- ৯৯-১০০

[224] মহম্মদ শফিকুল আলম, ‘সিরামিকস ফ্রম মহাস্থানঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি’, ইন *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,* খণ্ড- ৪, আই-সি-এস-বি-এ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৪৮৫-৪৯৬

[225] দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর,* পৃষ্ঠা- ৯১-৯৪

[226] তদেব পৃষ্ঠা- ৮৭-৮৮

[227] ভট্টাচার্য, ‘ময়নামতীঃ সিটি অন দ্য রেড হিলস্’, পৃষ্ঠা- ৭১- ৭২

[228] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা-৩৮

ব্রোঞ্জ উপাদান	ব্রোঞ্জ উপাদানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নাম ময়নামতী। এই অঞ্চলে অসংখ্য সমৃদ্ধ ব্রোঞ্জ উপাদানের সন্ধান মেলে যার অধিকাংশই মূলত বৌদ্ধ অবয়ব তবে কিছু ব্রাহ্মণ্য অবয়বও পাওয়া যায়, যদিও শতাধিক অবয়ব ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিখোঁজ। এখানকার অবয়ব দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাভার ব্রোঞ্জ অবয়বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানকার অবয়বের মধ্যে ভোজবিহার থেকে আবিষ্কৃত ১.১০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট নবম/দশম শতকীয় বজ্রস্বত্ত্ব অবয়ব, ময়নামতীর পার্বত্য ভূমি থেকে প্রাপ্ত স্বর্ন প্রলেপ সহ ব্রোঞ্জের অবলোকিতেশ্বরের মস্তক[229], রূপবানকন্যা মুড়ায় আবিষ্কৃত ব্রোঞ্জের বৃহৎ ঘন্টা[230] প্রভৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত উপাদানের মধ্যে ব্রোঞ্জনির্মিত বুদ্ধের আবক্ষ মূর্তি, ব্রোঞ্জের গনেশ মূর্তি, ব্রোঞ্জের উমা-মহেশ্বর মূর্তি, ব্রোঞ্জের তীর্থংকর মূর্তি প্রভৃতি উল্লেখ্য।[231] মহাস্থানে ভাসু বিহার থেকে আবিষ্কৃত প্রায় ৪০টি ব্রোঞ্জ নির্মিত বৌদ্ধ দেবদেবী অবয়ব[232] প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও জগজ্জীবনপুরের ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন ব্রোঞ্জ নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি, ব্রোঞ্জ নির্মিত মারিচী অবয়ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য[233]।
অন্যান্য প্রত্ন-সামগ্রী	উপরিল্লিখিত দ্রব্যাদি ছাড়াও এসকল বঙ্গীয় প্রত্নস্থলগুলিতে একাধিক প্রত্নউপাদানের সম্ভার পাওয়া যায়। যেমন- সীল বা সীলমোহর, প্রায় সবকেন্দ্রেই পোড়ামাটির সীলমোহর পাওয়া যায় যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জগজ্জীবনপুরে প্রায় ৮২টি সীলমোহরের সন্ধান মেলে, যা অধিকাংশই মঠ সম্বন্ধীয়। কিছু ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় শ্রদ্ধার্ঘের সীল মেলে।[234] বিক্রমশীলা থেকেও বিপুল লিপি সম্বলিত টেরাকোটা ও ব্রোঞ্জ সীলমোহরের সন্ধান মেলে।[235] আবার জগজ্জীবনপুর থেকে নানা মোটিফ দ্বারা অলংকৃত ইটের সন্ধান পাওয়া যায় যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধাঁচের পদ্ম পাপড়ি, দুটি সোপান যুক্ত শিখরাকার অলংকরণ প্রভৃতি বিচিত্র ধাঁচের

[229] ভট্টাচার্য, 'ময়নামতীঃ সিটি অন দ্য রেড হিলস্', পৃষ্ঠা- ৭২-৭৪

[230] ভুঁইয়া, 'ময়নামতী',পৃষ্ঠা – ২৭৮

[231] দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর,* পৃষ্ঠা- ৮৫-৯০

[232] হক, 'মহাস্থানগড়ঃ গ্রেট সিটাডেল',পৃষ্ঠা- ৮২-৮৪

[233] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা- ৩৮

[234] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২

[235] রজত স্যান্যাল, 'অ্যান্টিচক' , পৃষ্ঠা- ১৩১-১৪৩

	নকশা।[236] পাহাড়পুরের অন্যতম উল্লেখ্য চুন বালির সংমিশ্রণে নির্মিত স্টাকো[237] শিল্পের উপস্থিতি, এই শৈলীতে বেশ কিছু বুদ্ধের মুখাবয়ব, পদ্ম উপস্থাপনা পাওয়া গেছে। আবার লিপিসাক্ষ্যের[238] মধ্যে ৪৭৯ শতকীয় পাহাড়পুর তাম্রশাসন এবং দশম-দ্বাদশ শতকে নির্মিত কিছু শিলাস্তম্ভলিপির নিদর্শন, তামার বালা, দোয়াত, ঘণ্টা, কিছু লৌহসামগ্রী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[239] ময়নামতীর ইটাখোলা মুড়াতে আবিষ্কৃত বৃহদাকৃতি ষ্টাকো বুদ্ধমূর্তি[240], বেশ কিছু তাম্রশাসন, প্রদীপ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই প্রাচীন বাংলার ইতিহাসচর্চায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

আলোচনার শেষভাগে অপর যে ক্ষেত্রটি উল্লেখ করা যাতে পারে, যে প্রাচীন বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে মোটামুটি সপ্তম অষ্টম শতক থেকে বৌদ্ধ স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রবণতা অনুসৃত হয়েছে, তা হল বৌদ্ধবিহারের মধ্যে ক্রুশাকৃতি কেন্দ্রীয় মন্দির নির্মাণ এবং সাধারণত তার অলংকরণেই বিপুল পরিমান পোড়ামাটি ফলকের ব্যবহার। ময়নামতী অঞ্চলে রূপবান মুড়া বিহার, শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, রানীর বাংলো কেন্দ্রে ক্রুশাকৃতি পরিকল্পনার বৌদ্ধ বিহারের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে।[241] এই প্রবণতা বাংলার পাহাড়পুর, ময়নামতী সহ বিহারের অ্যান্টিচক এমনকি বহির্ভারতেও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি কিছু অংশে লক্ষ করা যায়।[242] অর্থাৎ তৎকালীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য নির্মাণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই শৈলী এবং বিভিন্ন বৌদ্ধকেন্দ্রগুলির মধ্যে এক বিপুল সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য লক্ষণীয় যা বিহারের নির্মাণ কাঠামো কিংবা অন্যান্য পুরাদ্রব্যের মধ্য দিয়েও প্রতিফলিত। জগজ্জীবনপুর বা

[236] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, পৃষ্ঠা- ৩৬-৩৮

[237] তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৯-৯০

[238] দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর*, পৃষ্ঠা- ৭৪-৭৫

[239] তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৫-৯০

[240] ভট্টাচার্য, 'ময়নামতীঃ সিটি অন দ্য রেড হিলস্', পৃষ্ঠা-৭৪

[241] ভুঁইয়া, 'ময়নামতী',পৃষ্ঠা –২৭২

[242] আকসাদুল আলম, 'বেঙ্গল অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়াঃ কমার্শিয়াল অ্যান্ড কালচারাল লিঙ্কেজেস', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ২, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৬২৬

পাহাড়পুর সংক্রান্ত ক্ষেত্রে দেখা গেছে উক্ত কেন্দ্রের উৎখননকর্তা কিংবা গবেষকরা এদের নির্মাণ পরিকাঠামোর সাথে ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারের সামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং অধ্যায়ের শেষে গিয়ে বলা যায়, অদ্যাবধি আলোচনার ভিত্তিতে দেখা গেছে বঙ্গীয় পরিসরে দীর্ঘ কালব্যাপী সমৃদ্ধ মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু উক্ত শিল্প গড়ে ওঠার পশ্চাতে কি জাতীয় প্রেক্ষাপট বা শর্ত নিহিত ছিল তার অনুসন্ধানই বর্তমান অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিশ্লেষণের নিরিখে বলা চলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শর্তরূপে জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, অফুরন্ত মৃত্তিকা, নদীপথ, পাথরের অপ্রতুলতা সব নিয়ে আদি মধ্যযুগীয় বাংলা তথা সার্বিকভাবে প্রাচীন বাংলায় এক যথোপযুক্ত ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট উপস্থিত ছিল এই শিল্পধারার বিকাশ ও ক্রমপ্রবাহমানতার পশ্চাতে। তবে যেহেতু বিশেষরূপে আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় মৃৎশিল্পের বিশ্লেষণ আলোচ্য গবেষণা পরিসরে প্রধান উপজীব্য, সেকারণে এই অধ্যায়ের মূল আলোচনাতেও উক্ত সময়কালীন ভৌগোলিক পরিসর বা প্রেক্ষাপটেই প্রধানত আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি উপস্থাপিত আলোচনায় দেখা গেছে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল আলোচ্য পরিসরে যা এই শিল্পের বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এছাড়া বলা যায়, এই অধ্যায়ে বর্ণিত পুরাকেন্দ্রগুলি ছাড়াও প্রাচীন বাংলার সার্বিক ইতিহাস নির্ধারণে আবিষ্কৃত অন্যান্য প্রত্নস্থলগুলির ভূমিকা অসামান্য কিন্তু এক্ষেত্রে মূলত পোড়ামাটি শিল্পসাক্ষ্যের উপস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রত্নস্থল নির্ধারণ করায় উপরিল্লিখিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে মূল আলোচনাকে তুলে ধরা হল। মূল গবেষণা পত্রটি যেহেতু পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাস কেন্দ্রিক, ফলত উক্ত শিল্পের প্রাপ্তিস্থানগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকাও প্রয়োজনীয় ছিল। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এই সকল প্রত্নস্থলই যে নিজ নিজ গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বিশেষ স্থানাধিকারী সন্দেহ নেই। এরাই স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে নানান বৈচিত্র্যের পারস্পরিক সংযোগ ও নিত্যনতুন শিল্প ভাবনা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে বাংলার শিল্প ইতিহাসকে। যার বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পঃ বর্ণনা ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

শিল্প একাধারে মানুষের নান্দনিকতা এবং সংশ্লিষ্ট সমাজ-বিন্যাস প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রূপে বহমান। দীর্ঘকালব্যাপী বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের প্রয়োজন ও সৃষ্টিশীলতার সংমিশ্রণ রূপে প্রতিভাত হয়ে এসেছে এই শিল্প। যেহেতু গবেষণা পত্রটির মূল আলোচ্য বিষয় বঙ্গীয় মৃৎশিল্প, ইতিপূর্বেই প্রথম অধ্যায়ে সামগ্রিক রূপে প্রাচীন বাংলায় মৃৎশিল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলায় মৃৎশিল্পের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক–সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং আলোচ্য পর্বে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক) মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বাংলার মৃৎশিল্প জনিত বিবিধ আভাষ দেওয়া হলেও বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎ অবয়বগুলির আলোচনায় আলোকপাত করা হবে, অর্থাৎ আলোচ্য পর্বে বঙ্গীয় মৃৎ অবয়ব বা মৃৎশিল্প বলতে আমরা ঠিক কি পাই তার নিখুঁত উপস্থাপন করা হবে বর্তমান অধ্যায়ে। সেই উদ্দেশ্যে অধ্যায়ের প্রথম ভাগে বাংলায় যে মৃৎশিল্পধারার অনুসন্ধান পাওয়া যায়, ভিন্ন বঙ্গীয় প্রত্নস্থলভেদে ও উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর নিরিখে তাদের পৃথক ও নিখুঁত চিত্রায়নের প্রয়াস করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিল্প অবয়বে সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুর বিস্তৃত আলোচনা, উক্ত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ বা তাৎপর্য, বিবিধ অবয়বের সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ববর্তী আলোচনার নিরিখেই অধ্যায়ের পরবর্তীভাগে তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে বাংলার এই শিল্পের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান তথা আলোচ্য পর্বে এই শিল্পের বিশেষত্ব নির্ধারণের সংক্ষিপ্ত প্রয়াস করা হয়েছে।

বাংলায় প্রাপ্ত মৃৎশিল্প রূপে আমরা প্রধানত পাই পোড়ামাটি বা টেরাকোটা অবয়ব, যা সাধারণত মাটিকে হাতে কিংবা ছাঁচের মাধ্যমে তৈরি করে তাতে স্থায়িত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আগুনে পোড়ানো হয়। আলোচ্য পর্বে বাংলার স্থাপত্যিক অলংকরণের অংশ হিসেবে মূলত পোড়ামাটি ফলকের উপস্থিতি মেলে যার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলার মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা প্রদান করা হয়েছে, যা থেকে দেখা যায় মুখ্যত অধুনা বাংলাদেশের পাহাড়পুর, ময়নামতী, মহাস্থান, পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুর, বিহারের অ্যান্টিচক,

ত্রিপুরার পিলাক ইত্যাদি আলোচ্য পরিসরে তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্র। এই মূখ্য কেন্দ্রসমূহের অন্তর্গত একাধিক স্তূপ বা প্রত্নক্ষেত্র থেকে বৃহৎ সংখ্যক ও বিচিত্র বিষয় সম্পন্ন পোড়ামাটি অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও সকল কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি মৃৎ অবয়ব সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য আমাদের হাতে নেই। তা স্বত্তেও বলা বাহুল্য, অদ্যাবধি প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ মৃৎ ফলকের প্রতিটি পৃথক অবয়বকে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। ফলে আলোচনার সুবিধার্থে সামগ্রিক রূপে এই বঙ্গীয় মৃৎশিল্প কে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর বা উপাদানের নিরিখে নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাজন দ্বারা আলোচনা করা যেতে পারে। বিষয়বস্তুর নিরিখে মূখ্যভাবে বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

১. বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্প ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণঃ

১.১ ধর্মীয়/ ঐশ্বরিক উপস্থাপনা

১.২ অর্ধ – ঐশ্বরিক উপস্থাপনা

১.৩ পশুপাখি,উদ্ভিদ তথা প্রাকৃতিক জগতের উপস্থাপনা

১.৪ যোদ্ধা বা সৈন্যবাহিনী উপস্থাপনা

১.৫ কাহিনী/ বর্ণনামূলক উপস্থাপনা

১.৬ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপস্থাপনা

১.৭ অন্যান্য (এর মধ্যে সংযুক্ত অবয়ব, স্থাপত্য কাঠামো উপস্থাপনা ইত্যাদি রাখব)

প্রধানত এই বিষয়গুলির উপস্থাপনা লক্ষ করা যায় বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের ইতিহাসে, যার প্রতিটির মধ্যে আবার একাধিক সূক্ষ্ম উপাদান নিহিত রয়েছে যা বিস্তৃতভাবে এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

১.১ ধর্মীয়/ঐশ্বরিক উপস্থাপনাঃ

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার নিরিখে বারংবার উল্লিখিত যে, আলোচ্য সময়কালে (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ দ্বাদশ শতক) বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল স্থাপত্যিক অলংকরণ এর অংশ রূপে তার ব্যবহার। এই পর্বে ধর্মীয় স্থাপত্য যথা বৃহৎ রূপে বৌদ্ধবিহার এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্রাহ্মণ্য মন্দির গাত্র অলংকরণের অঙ্গ রূপে পোড়ামাটি অবয়বগুলি উপস্থাপিত হয়েছিল। ফলে অনুমান করাই চলে এই শিল্পের ভিত্তির সাথেই ধর্মীয় সূত্র সংযুক্ত ছিল, যদিও এই শিল্পের পরিচয় বা চরিত্র সম্পর্কে এমন সরলীকরণ সিদ্ধান্ত একেবারেই যথোপযুক্ত নয়। তবুও যেহেতু মূলগত ভাবে ধর্মীয় স্থাপত্যের অংশ হিসেবে এদের সৃষ্টি এবং যে কোনও কালপর্বেই মানুষের জীবনযাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস, আচারাদি বিশেষ স্থান জুড়ে থাকে ফলস্বরূপ এই শিল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে ধর্মীয় উপাদানের উপস্থিতি যথেষ্টই কাম্য। এগুলির মধ্যে ধর্মীয় অবয়ব বলতে সাধারণত দুই ধরণের উপাদান পাই যথা- কিছু বৌদ্ধ দেবদেবী এবং কিছু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর উপস্থাপনা। প্রথমেই বৌদ্ধ উপস্থাপনা সম্পর্কে বলা যায় - আলোচ্য সময়কালে বাংলা যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল তার প্রমাণ দেয় একাধিক বৌদ্ধ বিহার ও প্রাপ্ত অসংখ্য বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রত্নবস্তু। আমরা জানি আলোচ্য পর্ব তথা আদি মধ্যযুগীয় সময়কালে বাংলায় মূলত মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে প্রাপ্ত অবয়বগুলি মূলত মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। উপরিল্লখিত প্রত্নস্থলগুলি থেকে বিবিধ মুদ্রা (ধ্যানমুদ্রা, ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, ধর্মচক্র মুদ্রা ইত্যাদি) ও ভঙ্গীর কিছু বুদ্ধ অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন- জগজ্জীবনপুরে দুটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রা ও একটি ধর্মচক্র মুদ্রায় আসীন বুদ্ধমুর্তি মেলে। আবার পাহাড়পুরের সত্যপীর ভিটায় ধ্যানমুদ্রায় আসীন তিনটি বুদ্ধ মূর্তির সন্ধান মেলে যার বিশেষত্ব হল বৌদ্ধ ধর্ম বাণী সম্বলিত ২টি সিলমোহর যা উক্ত অবয়বটিকে অধিক ধর্মীয় পবিত্রতা প্রদান করে।[243] তবে বুদ্ধ অপেক্ষা বোধিসত্ত্ব অবয়ব অধিক পরিলক্ষিত হয় বঙ্গীয় পোড়ামাটি সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলিতে। যার মধ্যে প্রথমেই বলা যায় মঞ্জুশ্রীর কথা, বৌদ্ধ ধর্মঐতিহ্য অনুযায়ী যিনি প্রধানত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা প্রভৃতি ধারণার সাথে

---

243 রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর, বেঙ্গল,* মেমোয়ার্স অফ দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, নং- ৫৫ , জনপথ, নিউ দিল্লী, দ্য ডিরেক্টর জেনারেল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯৯ পৃষ্ঠা-৬১

সম্পর্কিত।[244] ফলত জ্ঞান তথা বিদ্যাচর্চার অন্যতম পীঠস্থান বৌদ্ধবিহারে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মঞ্জুশ্রীর উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন জগজ্জীবনপুরের একটি ফলকে (চিত্র-১) পদ্মাসনে উপবিষ্ট রূপে মঞ্জুশ্রীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যার ডান হাত ডান পায়ের উপর এবং বাম হাত পাদবেদীতে স্থিত। তার দেহে একটি নিম্নবস্ত্র লক্ষণীয় ও তিনি অলংকার পরিহিত, মাথার পেছনে বৃত্তাকার জ্যোতির্বলয় এবং তার বাম পাশে লম্বা বৃন্ত সহ একটি পদ্মফুলের উপর একটি গ্রন্থ উপস্থাপিত[245] যা তার সত্তা বা পরিচিতিকে স্পষ্টরূপে প্রতিকায়িত করে। এক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখ্য অবয়ব অবলোকিতেশ্বর, বাংলায় বিভিন্ন প্রত্নস্থলে তার সন্ধান পাই। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা চলে জগজ্জীবনপুরেই ২টি সমরুপ অবলোকিতেশ্বর অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি ললিতাসনে উপবিষ্ট এবং তার ডান হাত ডান হাঁটুর উপর বরাদ মুদ্রায় (Varada-mudra) আসীন। তাঁর দেহে কেবল ধুতি জাতীয় নিম্নবস্ত্র, কোনরূপ অলংকার অনুপস্থিত, চুল মাথার উপরে খোপা বাঁধা, ঘাড়ের দুপাশে একাধিক কেশরাশি চিত্রিত এবং তাঁর বাম হস্তে যুগ্ম পাপড়ি বিশিষ্ট ও লম্বা বৃন্তসহ সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি পদ্ম লক্ষণীয়।[246] (চিত্র-২) অবলোকিতেশ্বর তাঁর অ-তান্ত্রিক সত্তায় পদ্মপাণি রূপে অভিহিত।[247] বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে তাঁরও উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গেই বলা যায় ময়নামতি থেকে প্রাপ্ত একটি মৃৎফলকে উক্ত উপস্থিতি লক্ষণীয়, যেখানে তাঁর কানে কুন্ডল, কোঁকড়ানো চুলে বেনুনি বাঁধা, ডান হাত মাটিতে রাখা এবং বাম হাতে পদ্মবৃন্ত ধরে আছেন। এটি এই পর্বে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় অবয়বের মধ্যে অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে মনে করা হয়।[248] আবার অ্যান্টিচক এও দেখা যাচ্ছে বিহার গাত্রে একটি ফলক এ অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি ললিতাসনে বসে আছেন, ডান হাতটি ডান হাঁটুর উপর এবং বাম হাতটি একটি ফুল ধরে আছেন। মূর্তিটি বড় কানের

---

244 ডঃ উমা চক্রবর্তী, *বেঙ্গল টেরাকোটাসঃ এ নিউ এপ্রোচ, ফ্রম আর্লিয়েস্ট টাইম টু টুয়েলভ সেঞ্চুরি সি ই,* আর্লি বেঙ্গল আর্ট সিরিজ, ভলিউম ১, কলকাতা, লেভান্ত বুকস, ২০২১ পৃষ্ঠা- ১৭০

245 অমল রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিসেম্বর ২০১২,পৃষ্ঠা-৮৮

246 তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮

247 চক্রবর্তী, *বেঙ্গল টেরাকোটাস,* পৃষ্ঠা-১৭২

248 আবু ইমাম, (সাধারণ সম্পাদক- এনামুল হক) - *এক্সকাভেশন অ্যাট ময়নামতী : অ্যান এক্সপ্লোরেটারি স্টাডি,* ঢাকা,বাংলাদেশ,আই সি এস বি এ, ২০০০, পৃষ্ঠা- ১৬৪

অলঙ্কার এবং একটি সাধারণ মালা পরা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। মাথার উপরে শঙ্কু আকৃতির মুকুট দেখা যাচ্ছে।[249] বাংলার প্রায় সকল কেন্দ্রেই এই পর্বে এরূপ বিবিধ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অবয়বের উপস্থাপনা রয়েছে।

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-১ মঞ্জুশ্রী, জগজ্জীবনপুর, সৌজন্যে-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, ডিসেম্বর, ২০২৪

চিত্র-২ অবলোকিতেশ্বর, জগজ্জীবনপুর, সৌজন্যে-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, ডিসেম্বর, ২০২৪

এছাড়াও উল্লেখ করা চলে জম্ভলর কথা, যিনি সম্পদ ও সমৃদ্ধির ধারণার সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য কুবেরের সমতুল্য। দারিদ্রতা দূর করে যথযথ ধর্মাচরণ এ জাম্ভালার আরাধনা বা আশীর্বাদ প্রয়োজনীয় ছিল। আবার একাধিক জীবন দর্শনের সাথে জাম্ভালার একাধিক সত্তা সংযুক্ত ছিল। যেমন- অহংকার অতিক্রম করতে হলুদ জাম্ভালা, হিংসা অতিক্রম করতে সবুজ, সংযোগ পরিত্যাগে সাদা, লোভ অতিক্রমে লাল এবং অসন্তোষ অতিক্রম করতে কালো জাম্ভালার উপস্থিতি রয়েছে বৌদ্ধদর্শনে।[250]

---

249 ড. এ কে সিং ও ড. দিলীপ কুমার(সম্পাদিত), *অ্যান্টিচক এক্সক্যাভেশনস রিপোর্ট (১৯৬০-৬৯)* ,পাটনা, বিহার, ডিপার্ট্মেন্ট অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্কিওলজি , পাটনা ইউনিভার্সিটি, পৃষ্ঠা- ৪৮

250 চক্রবর্তী, *বেঙ্গল টেরাকোটাস,* পৃষ্ঠা-- ১৭৪

অর্থাৎ জীবনের বিবিধ আদর্শ বা দর্শনের সাথে তাঁর সংযোগ স্থাপন করা হয়। বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের পরিসরে এই জম্ভলর উপস্থিতিও লক্ষণীয়। যেমন পাহাড়পুরে পদ্মের উপর লীলাসনে উপবিষ্ট রূপে জাম্ভালা অবয়ব পরিলক্ষিত হয়, যিনি ঘট জাতীয় একটি অবয়ব বহন করছেন, তাঁর মাথার চূড়ায় এক ধ্যানী বুদ্ধের অবয়ব চিত্রিত এবং ফলকটির পেছনের ডান দিকে একটি পদ্মও লক্ষণীয়।[251] (চিত্র-৩) অর্থাৎ লক্ষ করলে দেখা যায় সকল বোধিসত্ত্বের অস্তিত্বের সাথেই পদ্ম অত্যন্ত ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত। পদ্মের সাথে সাধারণত জীবন, সমৃদ্ধি তথা মঙ্গলময়তার ধারণা জড়িত, ফলত পদ্মের সংযোগ সম্ভবত উপরিউক্ত অবয়ব সমূহের ঐশ্বরিক অস্তিত্বকে অধিক দৃঢ়রূপে প্রতিকায়িত করে। যদিও এই মৃৎফলকগুলির চরিত্র বা উদ্দেশ্য কতখানি ধর্মীয় ছিল সেটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বরং বলা বাহুল্য এই ফলকগুলি একান্তই অলংকরণের উদ্দেশ্যেই নির্মিত এবং এর সাথে কোনোরূপ আচার বিধি পালনের সংযোগ ছিলনা, ফলত ধর্মীয় বিষয়বস্তু সম্পন্ন অবয়ব হলেও এক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল এই শিল্প অবয়বের চরিত্রকে আদতে নির্দিষ্টরূপে কতখানি 'ধর্মীয়' আখ্যা দেওয়া যায়? আর কেবল উপরিল্লিখিত অবয়বসমূহ নয় বরং ধর্মীয় বা ঐশ্বরিক উপাদান সম্বলিত সকল মৃৎফলকগুলির ক্ষেত্রেই এই বিষয়টি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। উপরিউক্ত অবয়ব ছাড়া বৌদ্ধ দেবীদের মধ্যে তারা, জাঙ্গুলির উপস্থাপনা লক্ষণীয়। মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা বিশেষ জনপ্রিয়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি ফলকে দেখা যায় দেবী তারা যুগ্মপদ্ম শোভিত আসনে উপবিষ্ট, তাঁর পশ্চাতে নীল পদ্ম যা তাঁর পরিচিতির প্রতীক। (চিত্র-৪) মোটামুটিভাবে এসকল বৌদ্ধ দেবদেবী অবয়বেরর উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় সার্বিক বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে যা বৌদ্ধ ধর্মঐতিহ্য সম্পর্কে আভাষ দেওয়ার পাশাপাশি নিঃসন্দেহে সমকালীন সমাজের ধর্মব্যবস্থার একাংশের চিত্রকে প্রতিফলিত করে।

---

[251] দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* ,পৃষ্ঠা- ৬১

চিত্র-৩

চিত্র-৪

চিত্র-৩ জম্ভল, সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার, পাহাড়পুর, সৌজন্যে- রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর, বেঙ্গল,* মেমোয়ার্স অফ দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, নং- ৫৫, জনপথ, নিউ দিল্লী , দ্য ডিরেক্টর জেনারেল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯৯, প্লেট – xlv-c

চিত্র-৪ তারা, সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার, পাহাড়পুর, সৌজন্যে- রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর,* প্লেট - xliv-c

এসকল বৌদ্ধ অবয়ব ছাড়াও ঐশ্বরিক অবয়বের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় একাধিক ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর উপস্থাপনা, যার মধ্যে প্রথমেই বলা চলে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় শিবের উপস্থাপনা। আর এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য পাহাড়পুরের নাম, এই কেন্দ্রে সর্বাধিক শৈব উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় এবং বিশেষ উল্লেখ্য তার কোনওটি একে অন্যের অনুরূপ নয়। আবার পালপর্বের প্রস্তর ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ ‘হর-গৌরী’ জাতীয় বিধিসম্মত অবয়ব থেকেও সেগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উৎখনন রিপোর্টে পাহাড়পুরে শিব উপস্থাপনার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কে এন দীক্ষিত, যেখানে মোটামুটিভাবে দেখা যায় ৩ ধরণের শৈব অবয়ব লক্ষণীয়। যথা- লিঙ্গরূপে, যেখানে একটি আয়তাকার বেদীর উপর নলাকার স্বতন্ত্র অবয়ব স্থিত এবং ফুলের মালা, ধ্বজা ইত্যাদি দ্বারা ফলকটি সজ্জিত। আবার নলাকার লিঙ্গের উপরিভাগে ৩টি মুখবিশিষ্ট চতুর্মুখী লিঙ্গেরও উপস্থাপনা মেলে (চিত্র-৫) পাহাড়পুরে। বেশ কিছু ফলকে আবার নগ্ন সাধক/যোগী রূপে শিবের উপস্থাপনা লক্ষণীয়, যেখানে কখনো তাঁর হাতে ত্রিশূল ও কাঁধে সর্প পরিলক্ষিত, কখনো পাশে বৃষ উপস্থাপিত আবার কখনো জপমালা-কমণ্ডলু ইত্যাদি ধরে

আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অতি সাম্প্রতিক সময়ে আমার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে দীক্ষিত কর্তৃক উল্লিখিত উৎখনন রিপোর্টের সকল অবয়ব পাওয়া সম্ভব হয়নি, হয়তো সেগুলি কোনও জাদুঘরে সঞ্চিত দ্রব্যের ভাণ্ডারে স্থিত যা প্রদর্শিত নয়। তবে আমার ক্ষেত্র সমীক্ষায় পাহাড়পুরের বিহারের গাত্রে প্রাপ্ত একটি অবয়বের এখানে উল্লেখ করা চলে যিনি হাতে একটি সাপ ধরে আছেন, ঘাড়ের দুপাশে কেশবিন্যাশ খানিক শিবের জটার ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। (চিত্র- ৬) এটিকেও শৈব উপস্থাপনা রূপে অভিহিত করা চলে কিনা, কিংবা এটি নাগ উপাসনার সাথে সম্পর্কিত কোনও অবয়বের উপস্থাপন সেজাতীয় প্রশ্ন করাই চলে। এছাড়াও সুসজ্জিত ভৈরবের উপস্থাপনা, একাধিক মস্তক ও দশ হাতে দশটি ভিন্ন অস্ত্র সম্বলিত উপস্থাপনা সম্ভবত 'পঞ্চানন' রূপের (চিত্র-৭) উপস্থাপনা।[252] পাহাড়পুর ছাড়াও জগজ্জীবনপুরে বেশ কিছু শিবের উপস্থাপনা পাই, যেমন একটি ফলকে দেখা যায় শিব ঊর্ধ্বলিঙ্গ ভঙ্গীতে উপবিষ্ট, তাঁর উত্থিত ডান হাতে ডমরু জাতীয় অবয়ব এবং বাম হাতটি পাদবেদীতে স্থিত। তাঁর ডান পাশে ত্রিশূল, মাথায় জটা এবং কপালে ত্রিনয়ন পরিলক্ষিত।[253] (চিত্র-৮) মৃৎশিল্পে এই বিপুল শৈব উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে সমকালীন সাধারণ সমাজে শৈব ধর্ম ও উপাসনার জনপ্রিয়তার দিকটিকে ইঙ্গিত করে অনুমান করা যেতে পারে।

---

[252] তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯

[253] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা-৮৯

চিত্র-৫

চিত্র-৬

চিত্র-৫ চতুর্মুখী শিবলিঙ্গ, সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার, পাহাড়পুর, সৌজন্যে- রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর,* প্লেট –LVIe

চিত্র-৬ শৈব উপস্থাপনা (?), সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার, পাহাড়পুর, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

চিত্র-৭

চিত্র-৮

চিত্র-৭ পঞ্চানন/দশহাত সম্বলিত শিব, সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার, পাহাড়পুর, সৌজন্যে- রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর,* প্লেট – XLIVa
চিত্র-৮ শিব, জগজ্জীবনপুর, সৌজন্যে-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, ডিসেম্বর, ২০২৪

বাংলার পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য অবয়বের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গনেশ, সূর্য প্রমুখ উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় বিবিধ প্রত্নস্থলগুলিতে। যেমন পাহাড়পুরে উপবিষ্ট ভঙ্গীতে ব্রহ্মার উপস্থিতি মেলে যার ডান হাতে সম্ভবত কিছু ধরে আছেন, বাম হাত বাম পায়ের ওপর রাখা, উভয় পার্শ্বের মস্তকগুলি দৃশ্যমান।(চিত্র-৯ক) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়ামেও একটি ব্রহ্মার অবয়ব পরিলক্ষিত হয় যা মহাস্থানের বামনপাড়া নামক স্থান থেকে প্রাপ্ত, উক্ত অবয়বেও তাঁর তিনটি মস্তক পরিলক্ষিত এবং ফলকটি একটি লিপি উৎকীর্ণ। (চিত্র-৯খ) যদিও বাংলার মৃৎশিল্পে ব্রহ্মার উপস্থিতি সীমিতই কিন্তু প্রসঙ্গত বলা চলে আলোচ্য পর্বে প্রস্তর ভাস্কর্যে কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ব্রহ্মার অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। যার প্রমাণ দেয় অধুনা বাংলাদেশের বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, পাহাড়পুর যাদুঘর, মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম এ সংরক্ষিত একাধিক ব্রহ্মা অবয়ব। যা সমকালীন পর্বে সম্ভবত ব্রহ্মার উপাসনা বা সমাজে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা জনিত ধারণার ইঙ্গিত দেয়।

চিত্র-৯ক
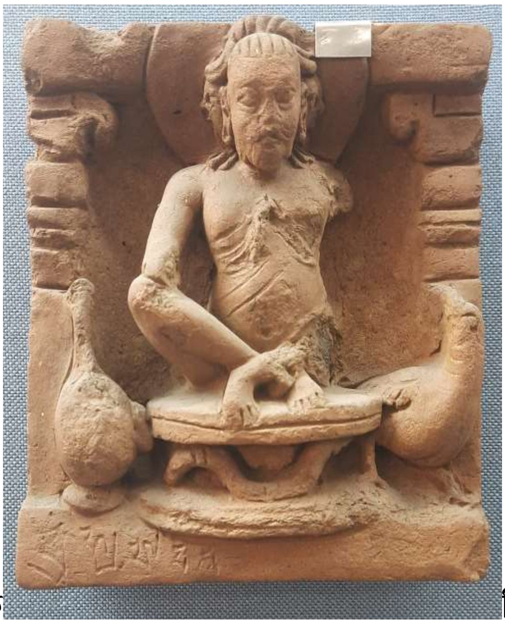
চিত্র-৯খ

চিত্র-৯ক ব্রহ্মা, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, সৌজন্যে- রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর,* প্রাগুক্ত, প্লেট – XLIVb

চিত্র-৯খ ব্রহ্মা, বামনপাড়া, বগুড়া, সৌজন্যে- বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

আবার বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে বর্ণিত দেবমূর্তির মধ্যে অন্যতম ‘সূর্য’ উপস্থাপনা। বিভিন্ন রূপে সৌর উপাসনার ইঙ্গিত প্রতিকায়িত হয় নানান প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটি শিল্পসাক্ষ্যের মাধ্যমে। আদি ঐতিহাসিক পর্বে বাংলার মৃৎশিল্পে প্রাপ্ত স্বপক্ষ পুরুষ মূর্তিগুলি সাধারণত সঙ্গে পদ্ম বা দুই হাতে পদ্মের নাল এবং ২টি পাখা সহ উপস্থাপিত, আবার উত্তর ভারতীয় ধারায় ঘোড়ায় টানা রথে উপবিষ্ট সূর্য মূর্তিও আদি ঐতিহাসিক বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে পরিলক্ষিত হয়।[254] তবে কুষান পর্বে এই পুরুষের দৈহিক উপস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন আসে ; পাখা বিলুপ্ত হয়, দেহে কুষান বস্ত্রাদি, পায়ে বুট জুতো, হাতে পদ্মের নাল সহ উপস্থাপিত হয়।[255] আলোচ্য পর্ব তথা আদি মধ্যযুগের মৃৎশিল্পেও সূর্য উপস্থাপনা পাই, জগজ্জীবনপুরে সূর্য উপস্থাপনার মধ্যে দেখা যায় তিনি দু হাতে লম্বা বৃন্তযুক্ত

---

254 ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *লোকশিল্প বনাম “উচ্চ” মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে,* (কলকাতা,লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯) পৃষ্ঠা -৪০

255 তদেব

দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ধরে আছেন। পায়ে লম্বা বুট, কুষান ঐতিহ্যের ন্যায় পোশাক, উত্তরীয় এবং বহু ভাঁজ বিশিষ্ট নিম্নাঙ্গের পোশাক লক্ষণীয়।[256] মহাস্থানগড়েও ষষ্ঠ শতকীয় পোড়ামাটি সূর্য উপস্থাপনা (চিত্র-১০) লক্ষণীয় যা তাঁর দৈহিক শৈল্পিক কারিগরীর তথা অলংকরণের জন্য প্রসিদ্ধ এবং এই অবয়ব বর্তমানে মহাস্থান জাদুঘরে প্রদর্শিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহাস্থানে প্রাপ্ত এই সূর্য অবয়ব কিন্তু সমকালীন অন্যান্য বর্গাকার ফলকের থেকে ভিন্ন এবং এর বাহ্যিক কাঠামো তাঁর এক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। এই ভাস্কর্যে তিনি একটি পাতলা বস্ত্র পরিধান করেছেন এবং পায়ে উঁচু পাদুকা পরিহিত, কোমরে একটি তরবারি বাঁধা এবং তার সাথে প্রয়োজনীয় অলংকারের উপস্থাপনা রয়েছে। নিশ্চিত রূপেই স্থাপত্যিক অলংকরণের অঙ্গ হিসেবে নয় বরং এই অবয়বটি স্বয়ং কোনও ধর্মীয় উপাসনা জনিত অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় অবয়ব হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা চলে। কিন্তু আলোচ্য পর্বে সাধারণত প্রায় সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় দেবতা রূপে তথা উপাসনার অংশ হিসেবে মূলত প্রস্তর নির্মিত ঐশ্বরিক মূর্তি ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফল স্বরূপ প্রস্তর নির্মিত অসংখ্য বৃহৎ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী অবয়ব বাংলা বা বিহারের বিবিধ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। মৃৎশিল্পের ব্যবহার একান্তই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক অলংকরণে পরিলক্ষিত হয়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থার উপাসনা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে মৃৎ ভাস্কর্য গ্রহণীয় ছিলনা। আলোচ্য পর্বে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মূলস্রোতের ভাস্কর্য ধারার বাইরে মৃৎশিল্পের অবস্থান ছিল। এমনকি শিল্প ইতিহাস চর্চাতেও সাধারণত ভাস্কর্যের ইতিহাস আলোচনায় মৃৎ ভাস্কর্য অন্তর্ভুক্ত থাকেনা। যা নিঃসন্দেহে মৃৎশিল্পের সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদার ক্ষেত্রটিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় এবং ভাস্কর্য নির্মাণের পৃথক উপাদানের নিরিখে তার ব্যবহার বা গ্রহণযোগ্যতার পরিসরটিকেও পরিবর্তিত করে। তাহলে এখানে এই পোড়ামাটি নির্মিত সূর্য মূর্তিটির অবতারণা কেন? তার উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? প্রকৃতই কি এর সাথে ধর্মীয় উদ্দেশ্য সন্নিহিত ছিল? অন্তত বাহ্যিক উপস্থাপনা তো সেরূপই ইঙ্গিত করে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে মৃৎশিল্পের ইতিহাসে যে এই মূর্তি এক বিশেষ স্থানের অধিকারী বলা বাহুল্য। অর্থাৎ মৃৎশিল্প নির্মাণের উদ্দেশ্য বা চরিত্রকে একেবারেই একমুখীন হিসেবে আলোচনা করা যথেষ্টই সংশয়পূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে যাইহোক, ক্রমশ সময়ের সাথে সূর্য অবয়বের সহিত জড়িত প্রতীকী বা তার রূপগত বিবর্তন ঘটেছে, প্রাপ্ত বিভিন্ন ধাঁচের এই পোড়ামাটি অবয়বগুলি

---

[256] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, পৃষ্ঠা-৮৯

উক্ত ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রটিকে নির্দেশিত করে। সবমিলিয়ে বাংলায় অতি প্রাচীন পর্ব থেকেই সৌর সম্প্রদায় বা সূর্য উপাসনার প্রচলন এবং তার ধারাবাহিক প্রবাহমানতার দিকটিও কিন্তু স্পষ্ট রূপেই পরিস্ফুট হয়।

চিত্র-১০

চিত্র-১০ সূর্য অবয়ব, মহাস্থান, সৌজন্যে-মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, মহাস্থান – বগুড়া, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

আবার গনেশ উপস্থাপনাও বঙ্গীয় মৃৎশিল্পে বিশেষ জনপ্রিয়, সাধারণত মনে করা হয় সকল বাধা কাটিয়ে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি এনে দেন ব্রাহ্মণ্য গনেশ বা গণপতি।[257] স্থূলকায় উদর এবং সঙ্গে হস্তীর ন্যায় মুখাবয়ব ব্রাহ্মণ্য গনেশের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তবে আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে পোড়ামাটি শিল্পে হস্তী মুখ সম্পন্ন একাধিক বিচিত্র অবয়বের সন্ধান পাওয়া গেলেও এইরূপ দৈবিক উপস্থাপনা মোটামুটি গুপ্ত যুগের পূর্বে বাংলায় পরিলক্ষিত হয়না।[258] আলোচ্য পর্বে আমরা যেরূপ গনেশ উপস্থাপনা পাই তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়পুরে গনেশ তাঁর বাহন ইঁদুরের দুপাশে পা দিয়ে

---

[257] চক্রবর্তী, *বেঙ্গল টেরাকোটাস,* পৃষ্ঠা- ১৩৮

[258] এস এস বিশ্বাস , *টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল,* দিল্লী, আগম কলা প্রকাশনী, ১৯৮১, পৃষ্ঠা–৮২

দণ্ডায়মান, উপরের বাঁ হাতে ফুল বাঁ কচি পল্লব, ডান হাতে অঙ্কুশ, নীচের বাঁ হাত ঊরুতে বিশ্রামরত ও নীচের ডান হাত উপঢৌকন/আশীর্বাদ প্রদান ভঙ্গীতে রয়েছে। তাঁর চুল জটাকৃতি ও কপালে ত্রিনয়ন লক্ষণীয়।[259] (চিত্র-১১) অর্থাৎ এই পর্বে মৃৎশিল্পে কিন্তু গনেশ তাঁর সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক দৈবসত্ত্বা নিয়ে আবির্ভূত, যেহেতু গুপ্তপর্ব থেকে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বাংলায় প্রবেশ করতে শুরু করেছিল ফলত উক্ত প্রভাবেই সম্ভবত বাংলায় গনেশের এই প্রতীকী অবয়বের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় যা নিঃসন্দেহে বাংলার ধর্মীয় বিবর্তনের দিকটিকেও নির্দেশিত করে, ।

চিত্র- ১১

চিত্র-১১ গনেশ, সোমপুর বৌদ্ধবিহার, সৌজন্যে- পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ, বাংলাদেশ। সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

মোটামুটিভাবে উপরিল্লিখিত ব্রাহ্মণ্য অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় বাংলার বিভিন্ন পোড়ামাটি সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলিতে, তথা বৃহৎভাবে পাওয়া যায় তৎকালীন সমৃদ্ধ বৌদ্ধবিহারের গাত্রে। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে বৌদ্ধবিহারে ব্রাহ্মণ্য অবয়বের উপস্থাপনা কেন? কিন্তু সে জাতীয় বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই কিছু বিষয় খেয়াল রাখা উচিৎ। যথা- এই মৃৎশিল্প বা বাংলায় প্রাপ্ত বিপুল পোড়ামাটি ফলকগুলি আদতে কি কারণে নির্মিত হয়েছিল বা তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? তা কি কেবলই স্থাপত্যের

259 দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* ,পৃষ্ঠা- ৬০

বাহ্যিক অলংকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত? নাকি এর বাইরেও কোনও আধ্যাত্মিক সংযোগ নিহিত ছিল? যদিও এজাতীয় প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর আমাদের হাতে নেই। তাই এদের সাথে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সংযোগ স্থাপনের বিষয়টিও যথেষ্টই সংশয়াত্মক এবং একইভাবে স্থাপত্যের বহির্গাত্রে উপস্থাপিত এইরূপ ভাস্কর্যের নিরিখে উক্ত নির্মাণ স্থাপত্যের চরিত্র নির্ধারণও যথার্থ নয়। এফ.এম.আশার অবশ্য উল্লেখ করেছেন, এই ধরণের প্যানেল কেবলমাত্রই সাধারণ সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে নির্মিত, যে ধারা বাদামী বা অজন্তা বা অন্য একাধিক ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। যার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে সাধারণত বিনোদনমূলক বা আনন্দদায়ক অবয়ব তুলে ধরা, সে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য যেকোনো নির্মাণ স্থাপত্যই হতে পারে। তাঁর চরিত্র কখনোই ধর্মীয় ছিলনা।[260] আবার নিকোলাস মরিস জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত মৃৎ অবয়ব সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করে মূলত উপস্থাপিত অবৌদ্ধ দেবদেবী বা অর্ধঐশ্বরিক অবয়বগুলিকে বৌদ্ধ তন্ত্র দর্শন ও সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট রূপে বিশ্লেষণ করা যায় কিনা সেই সংক্রান্ত আভাষ দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ রূপে বৌদ্ধসাহিত্যের 'প্রতিরক্ষা' চেতনার উপস্থিতির কথা বলেছেন।[261] তবে অপর একটি বিষয় ও খেয়াল রাখা প্রয়োজন যেহেতু এই মৃৎফলকগুলি স্থাপত্যের বাহ্যিক দেওয়াল গাত্রে উৎকীর্ণ ফলত তার সাথে একটি নান্দনিক চেতনা জড়িত থাকারও অবকাশ রয়েছে। যা আগত দর্শনার্থী বা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণকারী হতে পারে। আর সেজন্যই কি তাহলে উক্ত শিল্পের বিষয়বস্তুকে হয়তো খুব সচেতনভাবেই সকল মানুষের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য নিরপেক্ষ উপাদান সমৃদ্ধ করে তোলা হয়েছিল? যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আগত মানুষদের উক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা বা অনুদানের প্রেক্ষিতটিও ছিল অন্যতম কারণ? নাকি হয়তো এও সম্ভব শিল্পীরা কোনও বিধি নিষেধ বা অনুশাসনের বাইরে নিজেদের মনন থেকে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা বা সমকালীন সমাজস্থিত বিবিধ উপাদানকে নিজ শিল্পকর্মে তুলে ধরেছিল যা ছিল সকল ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে? এরূপ

---

260 এফ.এম.আশার, *দ্য আর্ট অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ৩০০-৮০০,* দিল্লী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮০, পৃষ্ঠা-৪৯

261 নিকোলাস মরিসে, 'অ্যাপোট্রোপেয়িক পাওয়ার অ্যান্ড রিচুয়াল এফিকেসি ইন দ্য বুদ্ধিস্ট আর্ট অফ মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অবসারভেশনস অন দ্য টেরাকোটা স্কাল্পচারস অফ নন্দদীর্ঘি বিহার', *অভিষেক সিং অমর,* নিকোলাস মরিসে এবং আকিরা সিমাডা (সম্পাদিত), *অন দ্য রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট অফ আর্লি মিডিএভাল বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন সাউথ এশিয়া,* রিওকোকু ইউনিভার্সিটি, জাপান, রিন্ডাস, সিরিজ অফ ওয়ার্কিং পেপার ৩৪, ২০২১ পৃষ্ঠা-১৬১-১৮৯

একাধিক প্রশ্ন বারংবার উঠে আসে বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের আলোচনায় যার বিশ্লেষণ আদতেই অত্যন্ত জটিল।

১.২ অর্ধ-ঐশ্বরিক উপস্থাপনাঃ

তবে উপরিল্লিখিত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মন্য অবয়ব ছাড়াও বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের পরিসরে বেশ কিছু অবয়ব পাওয়া যায় যায় যাদের অর্ধ-ঐশ্বরিক অবয়ব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে প্রথমেই বলা যায় গান্ধর্বরা হলেন আকাশের অধিবাসী, (চিত্র-১২) যারা স্বর্গের সঙ্গীতজ্ঞ রূপে পরিচিত। তারা গান,নৃত্য করেন এবং হাতে বাঁশি ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ধরে থাকেন।[262] এছাড়াও কখনো তাদের পা পদ্মাকৃতি বুট জুতো দিয়ে ঢাকা, চুলে বেনুনি বাঁধা ও দেহ শূন্যে ভাসমান রূপে উপস্থাপিত, কখনো তারা হাতে তরোয়াল ও দড়ির ফাঁস কিংবা পদ্ম বা মালা বহন করেন। এজাতীয় একাধিক ভিন্ন ভঙ্গীতে বিবিধ প্রত্নস্থলে তাদের উপস্থিতি পাই। গান্ধর্বরা কখনো একক ভাবে কখনো বিদ্যাধরের সাথে কখনো বা তাদের নারী সঙ্গীর সঙ্গে উপস্থাপিত।

একই সাথে পাওয়া যায় প্রায় সমরুপ দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিদ্যাধর এর উপস্থিতি, (চিত্র-১৩) যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা যায় মালা সহ বসা, দাঁড়ানো বা উড়ন্ত ভঙ্গীতে। অধিকাংশ অবয়বেই তারা সাধারণত অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত, পায়ে বুট, এবং ধুতি জাতীয় নিম্নবস্ত্র পরিহিত থাকেন। কখনো তাদের ডানদিকে কখনো বাম দিকে উড়ন্ত বা চলন্ত অবস্থায় দেখা যায়।

---

[262] ইমাম, *এক্সকাভেশন অ্যাট ময়নামতী,* পৃষ্ঠা- ১৬৫

চিত্র-১২

চিত্র-১২ গন্ধর্ব, জগজ্জীবনপুর, সৌজন্যে- অমল রায়, 'জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট', প্রাগুক্ত ২০১২, প্লেট- 73h

চিত্র-১৩

চিত্র-১৩ বিদ্যাধর, ভাসু বিহার, মহাস্থান সৌজন্যে- মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, বগুড়া, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

আবার আলোচ্য পরিসরে নাগ উপস্থাপনার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, বাংলা তথা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নাগ উপাসনার ধারা একদম প্রাথমিক পর্ব থেকে পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত বাংলার স্বর্পসংকুল অঞ্চলে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে নাগ উপাসনার চল ছিল যা আজও বিদ্যমান রয়েছে বহুলাংশে, একই উদ্দেশ্যে বাংলায় দেবী মনসার উপাসনা লক্ষণীয়। আমাদের আলোচ্য পর্বেও বাংলার মৃৎশিল্পের পরিসরে একাধিক নাগ উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন পাহাড়পুর, ময়নামতী প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাধারণ সাপের উপস্থাপনা যেমন একাধিক লক্ষণীয়, (চিত্র-১৪) তেমনই মনুষ্য দেহে সাধারণ মস্তকের পরিবর্তে সর্পফণা যুক্ত কিংবা সাধারণ মাথার উপর সর্পফণা সহ,(চিত্র-১৫) কিংবা দেহের নিম্নভাগ সাপের লেজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নাগ উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। মহাস্থানের মূল দুর্গাঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত মঙ্গলকোট এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাম। মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে দেখা গেছে এখানে মঙ্গলকোট থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বগুলিতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে অধিকাংশ অবয়বের মস্তকেই সর্পফনা বিদ্যমান (চিত্র-১৬)।এই বিপুল সর্প উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে সমকালীন শিল্পী মননে এর গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতির দিকটিকে প্রকাশিত করে। কিন্তু খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে বৌদ্ধবিহারের গাত্রে এত বিপুল সংখ্যক সর্প উপস্থাপনা কেন? মোটামুটি দুইভাবে এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। প্রথমত, এই অবয়বগুলি হয়তো সমকালীন বঙ্গীয় সমাজে উক্ত নাগ কাল্ট সম্পর্কিত আরাধ্য ধর্মীয় অবয়ব তথা দেবদেবীর অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তাকে নির্দেশ করে অনুমান করা যেতে পারে। যেখানে হয়তো শিল্পীরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন নিজেদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি আবার অন্যভাবে বলা যায় বৌদ্ধধর্মের থেকে নাগ উপস্থাপনা কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব রূপে দেখা আদৌ কতখানি যুক্তিসঙ্গত? কেননা বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী গুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে কিন্তু একাধিক কাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ নাগ সংযোগ উপস্থিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে 'শঙ্খপাল জাতকে' নাগ জগতের ঐশ্বর্যময় জীবন অতিবাহিত করার বাসনায় বোধিসত্ত্ব চম্পা নদীতে নাগরাজ চম্পেয় রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[263] আবার 'ভুরিদত্ত জাতকে' প্রভাবশালী ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত নাগ রাজপরিবারের উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে যমুনা তীরে এক নাগকন্যার সাথে বারানসী রাজের পুত্রের দাম্পত্য সম্পর্ক এবং ক্রমে তাঁর পারিবারিক ও জীবন কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। যেখানে আবার

[263] এইচ. টি. ফ্রান্সিস (অনুদিত), *দ্য জাতক,* (প্রফেসর ই. বি. কাওয়েল সম্পাদিত), খণ্ড-৫ কেমব্রিজ, অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস,১৯০৫, পৃষ্ঠা- ৮৪-৯১

নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সাথে তাঁদের কন্যার বৈবাহিক সম্পর্ক এবং তাঁদের তৃতীয় পুত্র রূপে বোধিসত্ত্বের জন্মকাহিনী, কাহিনীর ক্ষেত্র প্রসঙ্গে সাপ-গরুড় এর দ্বন্দ ইত্যাদি একাধিক বিষয় বর্ণিত আছে।[264] নাগ রাজ বা রাজবংশের পাশাপাশি বেদে বা সাপুড়ের উপস্থাপনাও আছে বেশ কিছু কাহিনীতে, যেমন এপ্রসঙ্গে 'অহিগুন্ডিক জাতকের' উল্লেখ করা চলে।[265] এরূপ নাগ সম্পর্কিত একাধিক উপস্থাপনা রয়েছে জাতকের কাহিনী গুলিতে যা বৌদ্ধ ধর্মে উক্ত অস্তিত্বের গুরুত্বকে প্রতিকায়িত করে। ফলত আদতেই কি বৌদ্ধবিহার গাত্রে উপস্থাপিত সর্প সম্পর্কিত মৃৎ অবয়বসমূহকে বৌদ্ধ ঐতিহ্য থেকে পৃথক রূপে আলোচনা করা যথার্থ? নাকি উক্ত শিল্পী বা পৃষ্ঠপোষকগণ আদতে জাতকের কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এজাতীয় বিপুল উপস্থাপনা নির্মাণ করেছিলেন তা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উপরি বর্ণিত ভঙ্গিমার সর্প অবয়ব ছাড়াও বাংলার মৃৎশিল্পে নাগ নাগিনী কখনো বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে, কখনো বুদ্ধের প্রতি প্রণাম জানাচ্ছে রূপে যেমন পাই তেমনই সর্পকথার কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত গরুড় তথা সাপের প্রধান শত্রুর উপস্থিতিও অনুমান করা হয় যেখানে তাঁর মনুষ্যরূপী উপস্থাপনা এবং দু হাতে দুটি ফণা যুক্ত সর্প ধরে আছেন। আবার সাপের সাথে ময়ূর ও বেজীর যে বিদ্বেষের সম্পর্ক তাও প্রতিভাত হয় পাহাড়পুরের মৃৎশিল্পে।

এই সর্প বা নাগ উপস্থাপনা সম্পর্কে অপর একটি প্রেক্ষিতও গুরুত্বপূর্ণ, অধ্যাপিকা নূপুর দাশগুপ্ত তার সর্পদেবতা উক্ত কাল্ট সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যের উপস্থাপনা দ্বারা দেখিয়েছেন সেখানে সর্প ও তৎ সম্পর্কিত নানান আরোগ্যবিধি তথা মন্ত্রের উপস্থাপনা রয়েছে যা থেকে ক্রমে এক কাল্টের বিকাশ ঘটেছে সময়ের সাথে। যেমন বৈদিক সাহিত্যে মূলত অথর্ব বেদে এই সর্প বিষ এবং তার আরোগ্যের বিধান রয়েছে। আবার বর্তমান পরিসরে বিশেষ উল্লেখ্য কিছু বৌদ্ধ গ্রন্থে এর উপস্থাপনা রয়েছে। যেমন বিনয় পিটকের চুল্লোভগ্য তে সর্পদংশনের একাধিক কাহিনী রয়েছে যেখানে দেখা যায় বুদ্ধ একটি সংঘের ভিক্ষুদের এর প্রতিরোধ জনিত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারনের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি খন্ড-ভট্ট জাতক, অঙ্গুত্তর নিকায় তে প্রায় অনুরূপ ধারণার উপস্থাপন রয়েছে। বাওয়ার ম্যানুস্ক্রিপ্ট এ আরও জটিল ও

---

264 প্রফেসর ই. বি. কাওয়েল ও ডবলু. এইচ. রুস (অনুদিত),*দ্য জাতক,* প্রফেসর ই. বি. কাওয়েল সম্পাদিত, খণ্ড-৬ কেমব্রিজ, অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯০৭ পৃষ্ঠা- ৮০- ১১৪

265 এইচ.টি.ফ্রান্সিস এবং আর.এ.নীল (অনুদিত),*দ্য জাতক,* (প্রফেসর ই. বি. কাওয়েল সম্পাদিত), খণ্ড-৩ কেমব্রিজ, অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৮৯৭ পৃষ্ঠা- ১৩০-১৩১

প্রাতিষ্ঠানিক ধাঁচে সর্পদংশন এর আরোগ্য স্বরূপ নারীশক্তি কেন্দ্রিক উপস্থাপন পাওয়া যায় এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ক্রমে তান্ত্রিক উপাদান রূপে তা গণ্য হয়েছে। পাশাপাশি মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে জাঙ্গুলী দেবীসত্ত্বার আবির্ভাব ঘটে সর্প দংশন ও বিষ জনিত প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে।[266] ফলত বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সর্প চেতনা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বলা বাহুল্য এবং এসকল বৌদ্ধবিহারে সর্প উপস্থাপনের পশ্চাতে নিহিত উদ্দেশ্য আদতে কি ছিল নিশ্চিত রূপে তা বলা মুশকিল। তবে এই ধরণের উপস্থাপনা মৃৎশিল্পে উক্ত বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করে। নিঃসন্দেহে টেরাকোটা নির্মাতারা এসকল জটিল গ্রন্থের সাথে পরিচিতি ছিলেন না। ফলত হয়তো অনুমান করাই যায় এজাতীয় শিল্প বিষয়ের অনুমোদনে ভূমিকা পালন করেছিল অন্য কোনও গোষ্ঠী। তবে কি এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বিহারের সন্ন্যাসীরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন? কেননা তাদের ছাড়া বৌদ্ধ গ্রন্থের এত নিখুঁত অধ্যয়ন কারাই বা করে থাকবেন?

এছাড়াও কীর্তিমুখ, (চিত্র-১৭) গন, কিন্নর - কিন্নরী (চিত্র-১৮) প্রমুখ পৌরাণিক অবয়বের উপস্থিতি মেলে সমকালীন বাংলার এই সকল প্রত্নকেন্দ্রগুলিতে যাদের অর্ধ- ঐশ্বরিক অবয়ব রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

---

[266] নূপুর দাশগুপ্ত, ফেইথ, হিলিং অ্যান্ড সার্পেন্ট গডেসেসঃ এক্সপ্লোরিং দ্য থ্রেসহোল্ড বিটুইন দ্য রিচুয়াল অ্যান্ড দ্য মেডিক্যাল ইন দ্য কাল্টস অফ জাঙ্গুলী -মনসা , জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, ঢাকা, আই সি এস বি এ, ২০১৬, পৃষ্ঠা-২৫-৩৬

চিত্র-১৪ চিত্র-১৫

চিত্র-১৬

চিত্র-১৭

চিত্র-১৮

চিত্র-১৪ সাপ, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

চিত্র-১৫ সর্পফণা যুক্ত মনুষ্য মুখাবয়ব, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

চিত্র-১৬ সর্পফণা যুক্ত মনুষ্য মুখাবয়ব, মঙ্গলকোট, সৌজন্যে-মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, মহাস্থান, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

চিত্র-১৭ কীর্তিমুখ, শালবন বৌদ্ধবিহার, ময়নামতি, সৌজন্যে-ময়নামতি জাদুঘর, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

চিত্র-১৮ কিন্নরী, শালবন বৌদ্ধবিহার, সৌজন্যে-ময়নামতি জাদুঘর, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

১.৩ পশুপাখি,উদ্ভিদ তথা প্রাকৃতিক জগতের উপস্থাপনাঃ

আমরা জানি মানবসভ্যতার যেকোনো পর্যায়ে তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল সমকালীন পরিবেশ। তার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে মানুষের জীবনযাপন ও সংস্কৃতির বিকাশ। আর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূলগত চরিত্রই ছিল অরণ্যকেন্দ্রিক, যার প্রমাণ পাওয়া যায় নানা সাহিত্যিক উপাদান বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সাক্ষ্যে এবং অবশ্যই বাংলাও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বঙ্গীয় সমাজের নানান চরিত্র তৎকালীন টেরাকোটা শিল্পের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয় যার মধ্যে অন্যতম উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল। এর ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলের প্রাপ্ত শিল্পসাক্ষ্যে। যেমন প্রথমেই বলা যায় প্রাণীজগতের কথা- মহিষ, হরিণ, হাতি, বাদর,ভল্লুক, ষাঁড়, সিংহ, বাঘ, গণ্ডার, শিয়াল, শূকর, মাছ, কুমীর বিবিধ প্রাণীদের নানান গতিময় মুহূর্ত বা নানান ক্রিয়াকলাপকে শিল্পীরা তাদের কর্মের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন পাহাড়পুরে হরিণকে দেখা যায় কখনো কখনো দৌড়াতে, কখনো সে শাবক সহ ঊর্ধ্বমুখী ভঙ্গীতে। (চিত্র-১৯) পঞ্চতন্ত্রে হরিণের দু ধরণের চলনভঙ্গীর উল্লেখ আছে, সোজাসুজি ও ঊর্ধ্ব/খাড়া ভাবে। আর এই উভয় ভঙ্গীই পাহাড়পুরে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত।[267] পাহাড়পুরের অন্যান্য পশু উপস্থাপনার মধ্যে দেখা যায় হাতি কখনো শুঁড় দিয়ে বৃক্ষচ্ছেদনরত, কখনো সে পরিবহনের জন্য তৈরি,(চিত্র-২০) কখনো উত্থিত শুঁড়ে দাঁড়িয়ে, কখনো

---

267 দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* ,পৃষ্ঠা- ৬৭

মনুষ্য কর্তৃক হাতিকে দমনের প্রয়াস সহ একাধিক হস্তী উপস্থাপনা লক্ষণীয়। সকল চিত্র স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভবপর নয় তাই সোমপুর মহাবিহারের ভিত্তি দেওয়ালে প্রদর্শিত কিছু হস্তী চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল। আবার অন্যতম আকর্ষণীয় উপস্থাপনা উটের, (চিত্র-২১) কেননা বঙ্গীয় পরিবেশে উটের উপস্থিতি নেহাতই অপ্রত্যাশিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেবল ভারতীয় উট নয়, যুগ্ম কুজ সম্পন্ন ব্যাকট্রিয় উটের উপস্থিতিও আলোচ্য পরিসরে বিশেষ লক্ষণীয়। ফলত তার উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে বহির্দেশীয় বিষয়াবলীর সাথে বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দিকটিকে প্রকাশিত করে যা খুব সম্ভবত বাণিজ্য সূত্রে বাংলায় প্রবেশ করেছে।[268] পাশাপাশি দেখা যায় কখনো একক কখনো জোড়ায় উপবিষ্ট কিংবা হাতে ফল ধরে, থাপ্পড় মারার ভঙ্গী ইত্যাদি ধাঁচের বাঁদর, শস্য ক্ষেতে আক্রমণকারী ভল্লুক, উল্লেখযোগ্য কেশর সম্পন্ন সিংহ, হাতিকে জালমুক্ত কারী রূপে ইঁদুর, (চিত্র-২২) মানুষের পা খাওয়ার ভঙ্গীতে কুমীর, আবার ছোট পশুদের মধ্যে খরগোশ,কচ্ছপ, টিকটিকি এবং পাখিদের মধ্যে হাঁস, টিয়া ইত্যাদি লক্ষণীয়।[269] আবার ময়নামতি জাদুঘরে প্রদর্শিত শালবন বিহার থেকে প্রাপ্ত ফলকে দেখা যায় হাতি চমৎকারভাবে তার স্বভাবসিদ্ধ চলনভঙ্গীতে হাঁটছে, মহিষ মাথা নীচু করে তার পা দিয়ে চুলকাচ্ছে, (চিত্র-২৩) আক্রমনাত্মক ভঙ্গীতে বন্য শূকর ইত্যাদি। রূপবান মুড়াতে এক বাঁদর অপরকে গাছে উঠতে সাহায্য করছে,[270] আনন্দরাজার প্যালেসে কৃষ্ণসারমৃগ, মকর, ন্যুব্জ গলা ও পালকশোভিত পুচ্ছ সহ রাজহাঁস প্রভৃতি লক্ষণীয়। একইভাবে জগজ্জীবনপুরেও উপরিল্লিখিত পশুপক্ষীর বিপুল উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়।

---

268 দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* ,পৃষ্ঠা-৬৮

269 তদেব, পৃষ্ঠা-৬৮-৭০

270 ইমাম, *এক্সকাভেশন অ্যাট ময়নামতী*,পৃষ্ঠা- ১৭১

চিত্র-১৯

চিত্র-২০

চিত্র-২১

চিত্র-২২

চিত্র-২৩

চিত্র-১৯ শাবকসহ উত্থিত মস্তকে হরিণ, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, বাংলাদেশ , সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

চিত্র-২০ আরোহী সহ হাতি, সোমপুর মহাবিহার, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

চিত্র-২১ উট, সোমপুর মহাবিহার, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

চিত্র-২২ ইঁদুর কর্তৃক হাতিকে জালমুক্ত করার দৃশ্য, সৌজন্যে- পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

চিত্র-২৩ মহিষ পা দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে, শালবন বিহার, ময়নামতি, সৌজন্যে- ময়নামতি জাদুঘর, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

অপরদিকে উদ্ভিদজগতের যদি উল্লেখ করতে হয় সেক্ষেত্রে অন্যতম পদ্মের উপস্থাপনা, নানান ভাবে বিবিধ প্রত্নস্থলে তার সাক্ষাৎ মেলে। কখনো কেবল পদ্ম কুঁড়ি ও পাতার সাথে পুষ্পের উপস্থাপনা, (চিত্র-২৪) কখনো কোনও দেবতার সাথে প্রতীকরূপে, কিংবা বিচিত্র অবয়ব যেমন শঙ্খের সাথে পদ্মের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অর্থাৎ জনমানসে পদ্মের গুরুত্ব সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায়, আর পদ্মের সাথে সার্বিক সমৃদ্ধি, উর্বরতা বা মঙ্গলময়তার ধারণা জড়িত ফলে বৌদ্ধবিহারে এর বিপুল উপস্থিতির যৌক্তিকতা সহজেই অনুমান করা যায়। এছাড়াও কলাগাছ বা নারকেল গাছের উপস্থাপনা পাওয়া যায় বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে।[271] সুতরাং বলা যায়, বাংলার পরিবেশের বিভিন্ন দিককে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরেছেন শিল্পীরা যা একাধারে সমকালীন দিনকাল সম্পর্কে ধারণা দেয় তেমনই পাশাপাশি টেরাকোটা শিল্পধারাকে সমৃদ্ধ করে। পশুপাখিদের বিবিধ গতিশীল বা ভিন্ন ক্রিয়ারত একাধিক ফলকের উপস্থাপনা বাংলার শিল্পইতিহাসে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। এসকল বিবিধ উপস্থাপনা শিল্পীদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে দক্ষতারও পরিচয় দেয় যার ফলে পরিবেশের বিবিধ দিক তথা মানুষের সাথে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের দিকগুলিকে তারা সূক্ষ্ম ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। যদিও পূর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় শুধু সর্প নয়, বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে উপস্থাপিত প্রায় সকল পশু পক্ষীর উপস্থাপনাও রয়েছে জাতকের বিবিধ কাহিনীতে,

[271] দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* , পৃষ্ঠা-৭০

তাহলে তাদের বিপুল উপস্থাপনাকেই বা কিভাবে বিবেচনা করা যায়? যদিও কোনোরকম একরৈখিক সিদ্ধান্তই এখানে সমস্যাজনক।

চিত্র-২৪ পদ্ম, সোমপুর মহাবিহার, বাংলাদেশ , সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, অক্টোবর, ২০২২

১.৪ যোদ্ধা বা সৈন্যবাহিনী উপস্থাপনাঃ

আলোচ্য পরিসরে বাংলায় প্রাপ্ত মৃৎশিল্পের মধ্যে অন্যতম চমকপ্রদ উপস্থাপনা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সহ নানান ভঙ্গীতে উপস্থাপিত যোদ্ধা বা সৈন্য উপস্থাপনা। নিঃসন্দেহে যেকোনো সময়কালে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বা নিরাপত্তায় রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভিত হিসেবে কাজ করে থাকেন যোদ্ধা বা সৈন্যবাহিনী, হয়তো তার বাহ্যিক চরিত্র কেবল পরিবর্তিত হয়। ফলত তৎকালীন রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এইরূপ যোদ্ধা শ্রেণীর উপস্থিতি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা, যা শিল্পীরা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন। যেমন- ময়নামতিতে দেখা যায়, ঢাল ও ছুরিকা সহ যুদ্ধ ভঙ্গীতে, বাঘমারার ভঙ্গীতে, তীরন্দাজ রূপে প্রভৃতি লক্ষণীয়।[272] আবার পাহাড়পুরেও বিভিন্ন অস্ত্র সহযোগে পুরুষ ও মহিলা পদাতিক সৈনিকের উপস্থাপন রয়েছে।[273] মহাস্থানের বিভিন্ন অংশ থেকেও

[272] ইমাম, *এক্সকাভেশন অ্যাট ময়নামতী,* পৃষ্ঠা- ১৬৪

[273] দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* ,পৃষ্ঠা- ৬৬

কিছু কিছু এই শ্রেণীর অবয়ব পাওয়া যায়। (চিত্র-২৫) তবে এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য জগজ্জীবনপুরের নাম, এই কেন্দ্রে সর্বাধিক যোদ্ধার অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। এই কেন্দ্রে প্রায় ৩৮৭ টি প্রাপ্ত ফলকের মধ্যে ১৫০ টি তেই এই যোদ্ধা বা সৈনিকের অবয়ব লক্ষণীয়।[274] তাঁদের অস্ত্র ও যুদ্ধভঙ্গীর নিরিখে উৎখননকার একাধিক শ্রেণী বিভাজন করে বিস্তৃত রূপে তাঁদের আলোচনা করেছেন,কিন্তু বর্তমানে স্বল্প পরিসরে সবকিছু তুলে ধরা সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে দেখা যায় সকল ফলকে তাঁদের হাতে ঢাল, তরোয়াল, তীর-ধনুক, গদা প্রভৃতি অস্ত্র সহ কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো বসে বা আরও একধিক ভঙ্গীতে লক্ষণীয়।[275] (চিত্র-২৬) বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার গাত্রের অলংকরণে এইরূপ যোদ্ধা শ্রেণীর উপস্থাপন নিঃসন্দেহে প্রশ্নের উদ্রেক করে। তবে আবার অপর এক দিকের ও ইঙ্গিত করে এই উপস্থাপন যে শিল্পীরা সমকালীন সমাজের বিবিধ উপাদানকে যে অবলীলায় তুলে ধরেছিলেন যোদ্ধা শ্রেণীও তা থেকে বাদ পড়েননি এবং সমাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে সহজেই অনুমান করা যায় এই বিপুল উপস্থাপনা থেকে। যদিও এক অন্য সম্ভাবনাও এক্ষেত্রে প্রবলভাবে নিহিত থাকতে বলে অনুমান করা যায় যা অধ্যায়ের শেষ ভাগে আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতা শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[274] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা- ৯১-৯৩

[275] রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা- ৯১-৯৩

চিত্র-২৫

চিত্র-২৬

চিত্র-২৫ ঢাল তরোয়াল সহ যোদ্ধা, ভাসুবিহার, মহাস্থান, সৌজন্যে- মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, বগুড়া, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র- ২৬ ঢাল তরোয়াল সহ যোদ্ধা, জগজ্জীবনপুর, সৌজন্যে-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, ডিসেম্বর, ২০২৪

১.৫ কাহিনী/ বর্ণনামূলক উপস্থাপনাঃ

বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ বিভিন্ন কাহিনী সম্বলিত ফলকগুলি। যেখানে কিছু অসামান্য মাইথোলজিকাল কাহিনী যথা জাতক, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ বা বিভিন্ন স্থানীয় লোককাহিনীর নানান দৃশ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয় । ক্রমে পোড়ামাটি শিল্পে তার উপস্থাপনার ফলে এতদিন যে গল্প শুধু মানুষ শুনেছিল, এই উপস্থাপনার দ্বারা তারা এক নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে শুরু করল। সর্বোপরি এগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা প্রচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল বা স্থিত সাহিত্য সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়েছিল বলা চলে, অর্থাৎ সামাজিক ইতিহাসের ধারায় এর অবদান যে অসামান্য তা অনুমান করা চলে। এইরূপ বেশ কিছু ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় মহাস্থান, পাহাড়পুর, ময়নামতি, পিলাক থেকে প্রাপ্ত মৃৎফলকে। যেমন - এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা চলে মহাস্থানের পলাশবাড়ি নামক কেন্দ্রের কথা, যেখানে আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতকীয় প্রায় ৪৫টি পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে রামায়নের আদিকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের কাহিনী উপস্থাপন লক্ষ করা যায়, এর মধ্যে রাম- সীতার বিবাহ দৃশ্য, দশরথের মৃত্যুদৃশ্য (চিত্র-২৭) সহ নানান দৃশ্যের অবতারন রয়েছে।[276] বাংলার মৃৎশিল্পে বিশেষত পাহাড়পুরে উপস্থাপিত গল্পশৈলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কৃষ্ণকথা, যা পূর্বে প্রস্তর ভাস্কর্যে সুপরিচিত ছিল। এখানেও বেশ কিছু চিত্রায়ন দেখা যায় যেমন এক ফলকে দেখা যাচ্ছে এক মহিলা দুগ্ধ মন্থন করছেন তাঁর পাশে এক বালক যা সম্ভবত কৃষ্ণ- যশোদার উপস্থাপন বলে অনুমান করা হয়, আবার অন্য ফলকে দেখা যায় এক বালক গাছের কাণ্ড ধরে আছে কিংবা কখনো দেখা যায় এক উলঙ্গ বালক মাথায় দু হাত দিয়ে কলস ধরে আছে, সঙ্গে এক ব্যক্তি যিনি এক হাতে ছাতা ধরে আছেন অন্য হাতে মাথার কলস। এইরূপ একাধিক উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় যেগুলি কৃষ্ণকথার প্রতিচ্ছবি বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। আবার পাহাড়পুরেই দেখি বানর এক গোছা আম নিয়ে উৎসর্গীকৃত ভঙ্গীতে স্থিত যা হয়তো বৌদ্ধ সাহিত্যের অংশ ইতিপূর্বেই যার আভাষ দেওয়া হয়েছে। আবার এখানে পঞ্চতন্ত্রের বিবিধ কাহিনীর উপস্থিতি যেমন একটি ফলকে দেখা যায় অহংকারী সিংহ যে একটি খরগোশ দ্বারা ফাঁদে পড়ে কুয়োর মধ্যে, যেখানে সে নিজের প্রতিবিম্বকে অন্য পশু ভেবে ভুল করে এবং তার সাথে ক্রমাগত লড়াই করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায় এই কাহিনীর প্রতিফলন রয়েছে

[276] আফরোজ আকমাম – *মহাস্থান*, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা ২০১৬, পৃষ্ঠা-৮৪

যদিও পাহাড়পুরের শিল্পীরা বাকি কাহিনী বাদ দিয়ে কেবল সিংহটি কুয়োর দিকে তাকিয়ে আছে সেই দৃশ্যটি তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ভারতীয় লোককথার এসকল নীতিশিক্ষামূলক গল্পগুলির শিল্পঅবয়ব রূপে এই ধরণের জনপ্রিয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে প্রতিফলিত হওয়া যথার্থই উপযুক্ত। কেননা এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে থাকেন, ফলে এগুলি যথার্থই সাধারন মানুষকে শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।[277] পাশাপাশি উক্ত শিল্পীদের কর্মদক্ষতা ও শৈল্পিক রসবোধেরও এক অভূতপূর্ব নিদর্শন এই ফলকগুলি।

চিত্র-২৭

চিত্র-২৭ দশরথের মৃত্যুতে তাঁর তিন স্ত্রী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার বিলাপ দৃশ্য, বামুনপাড়া, বগুড়া, সৌজন্যে- বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর ২০২২

277 দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* , পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪

১.৬ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপস্থাপনাঃ

বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের বিশেষত্বই হল এগুলি সমকালীন সমাজ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্থান, কাল নির্বিশেষে এই শিল্প সমকালীন সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হয়। আলোচ্য পর্বেও তেমনই সমকালীন অন্যান্য শিল্প যথা প্রস্তর বা ধাতব অবয়ব অপেক্ষা মৃৎশিল্পে সমাজের বিবিধ প্রেক্ষিত তথা সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম আঙ্গিক অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা চলে সাম্প্রতিক পর্বে ইতিহাস চর্চায় বিশেষ স্থান পেয়েছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিশ্লেষণ; সাধারণত সামাজিক ইতিহাসের আলোচনার মধ্যেই 'দৈনন্দিন জীবনযাত্রার' ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু বর্তমানে তা একটি স্বতন্ত্র উপ-শৃঙ্খলা (sub discipline) রূপে পরিচিতি পেয়েছে।[278] সাধারণত আমরা সমাজের বড় পরিবর্তন বা ঘটনাবলী তথা রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়েই অধিক আলোচনা করে থাকি, কিন্তু সাম্প্রতিক এই ইতিহাস উক্ত ধারার বাইরে কেবলমাত্র সামাজিক ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত তথা সাধারণ মানুষের অনুভূতি, মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের অন্বেষণ করে। নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় স্থিত মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা, মুহূর্ত বা ক্রিয়াকলাপই তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ইতিহাস তথা তাঁর সামাজিক অস্তিত্বকে সুস্পষ্ট করে তোলে। ফলত তাঁর অনুসন্ধান ব্যাতিত সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সাম্প্রতিক পর্বে অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা ঘোষ ও সায়ন্তনী পাল বিবিধ লিখিত গ্রন্থ ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাবলীর নিরিখে প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত তুলে ধরেছেন যে, 'সাধারণ মানুষ' বলতে কাদের বোঝায়? কাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি আমরা পেতে পারি তা বেশ জটিল প্রশ্ন, কেননা এর মধ্যে একাধিক স্তরের মানুষ একাধিক পেশা নিহিত থাকতে পারে যথা- কৃষক, মৎস্যজীবী প্রমুখ যাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[279] অর্থাৎ এই জাতীয় আলোচনা একরৈখিক ভাবে সম্ভব নয়, এসকল বিষয় খেয়াল রেখে তবেই ইতিহাস বিশ্লেষণ কাম্য।

---

[278] সুচন্দ্রা ঘোষ, সায়ন্তনী পাল 'এভরি ডে লাইফ ইন আর্লি বেঙ্গল' , *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ২ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা-১

[279] ঘোষ, পাল, 'এভরি ডে লাইফ ইন আর্লি বেঙ্গল' পৃষ্ঠা- ৫

আমাদের আলোচ্য পরিসরে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার পোড়ামাটি শিল্পের অন্যতম তাৎপর্যই হল বিপুল পরিমাণে প্রাপ্ত ফলকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন মুহূর্ত প্রতিফলিত হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে সমাজের বিবিধ মানুষের জীবনের ইতিহাসের ধারণা পাওয়া সম্ভব। জগজ্জীবনপুর, পাহাড়পুর, মহাস্থান বা ময়নামতীর বিভিন্ন প্রাপ্ত নানান ফলকে দেখা যায় কখনো বিবিধ প্রেমময় ভঙ্গীতে দম্পতি উপস্থাপনা (চিত্র-২৮) যা যেকোনো মানুষের দাম্পত্য জীবনের অতি পরিচিত মুহূর্তের প্রতিফলন। আবার একাধিক ফলকে দেখি নারীরা কুয়ো থেকে জল তুলে জল ভর্তি কলস নিয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে কিংবা প্রসাধনরতা রমণী বা শায়িত নারী, কখনো শিশু কোলে নারী অর্থাৎ পরিবারের কর্ত্রী বা মহিলাদের জীবনযাত্রাও শিল্পীরা অতি দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। কখনো দেখি সাধক বা ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষুকের উপস্থাপনা যার লম্বা দাঁড়ি, ন্যুব্জ দেহ, কখনো কঙ্কালসার দেহ লক্ষণীয়। যিনি হাতে কিছু বহন করছেন এবং কিছু জিনিস কাঁধে রাখা বাঁক থেকে ঝুলছে। কখনো বা সাধক বা ব্রাহ্মণরা তাঁদের ধর্মীয় আচারাদি পালন করছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অপর যে বিস্তৃত উপস্থাপনা আমরা পাই তা হল অবসর যাপন বা বিনোদনের বিবিধ দৃশ্যাবলী। যার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় একাধিক ক্রীড়া জগতের উপস্থাপনা, বাংলাদেশে আমার ক্ষেত্র সমীক্ষাকালে দেখা গেছে পাহাড়পুরে মন্দিরগাত্রে এবং ময়নামতির সংরক্ষিত একাধিক মৃৎ ফলকে এই জাতীয় উপস্থাপনা পাওয়া যায়, যথা- ব্যায়ামবিদরা ভার দিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করছেন, মল্লবীররা নানা ভঙ্গীতে কুস্তি করছেন (চিত্র-২৯) যা একাধারে এক শ্রেণীর মানুষের পেশা আবার সমাজের অন্য কিছু মানুষের নিকট তা বিনোদনের মাধ্যম। আবার অবসর যাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে একাধিক ফলকে পাওয়া যায় বিবিধ ভঙ্গীতে নৃত্যরত নারী পুরুষ অবয়ব (চিত্র-৩০) কিংবা বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজানো মুহূর্তের অবয়ব যেমন কেউ ভেঁপু বাজাচ্ছে, কেউ বাঁশি, বীণা, মৃদঙ্গ বা ঢোল বাজাচ্ছে ইত্যাদি। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম অনুভূতি বা মুহূর্তগুলিকে শিল্পীরা তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি সমকালীন সমাজে বিবিধ পেশাজীবী মানুষদেরও উপস্থাপন করেছেন তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে যারা সম্ভবত ছিলেন তথাকথিত এলিট ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যবর্তী কোনও স্তরের অধিবাসী। আবার সমাজের রাজা-মহারাজা বা সামন্তদের তথা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের বিনোদনের অন্যতম উপাদান ছিল শিকার বা মৃগয়া। ফলত বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিকার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, অপরদিকে বিশেষ উল্লেখ্য শবর, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী গোষ্ঠীর কথা, শিকারই ছিল যাদের প্রধান উপজীব্য। পাহাড়পুরের বেশ কিছু ফলকে তাঁদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গেই বলা যায় বাংলার মৃৎফলকে অপর যে ক্ষেত্রটি ফুটে ওঠে তা হল মানুষের খাদ্যাভাস। ইতিপূর্বেই বাংলায় প্রতিফলিত উদ্ভিদজগত সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায় কলা, নারকেল প্রভৃতি গাছের উপস্থাপনা রয়েছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেগুলিকে মানুষের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পাশাপাশি কিছু ফলক বা সিলমোহর থেকে প্রাপ্ত ধান বা শস্যের প্রতিফলন থেকে বাংলার মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসেবে ভাত কে পরিগণিত করা যায়। পাশাপাশি বিশেষত পাহাড়পুর, ময়নামতি থেকে প্রাপ্ত একাধিক ফলকে মাছের উপস্থাপনা খুব স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমানের ন্যায় নদীমাতৃক বাংলার অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসেবে মাছ – ভাতের কথাই মনে করায়। (চিত্র-৩১) যদিও মাছের সাথে মঙ্গলময়তার ধারণাও সম্পৃক্ত থাকে, যে কোনও শুভ আচার অনুষ্ঠানে মঙ্গলময়তার প্রতীকরূপে মাছের উপস্থাপনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফলত সেই সময় দাঁড়িয়ে মানুষ নির্দিষ্ট রূপে কোন ভাবনা থেকে প্রতিটি অবয়ব নির্মাণ করেছিলেন তা নিশ্চিত রূপে ব্যাখ্যা করা যথেষ্টই সংশয়াত্মক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এক্ষেত্রে পাহাড়পুরের কথা পৃথকরূপে উল্লেখ করা চলে, কেননা পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারে উপস্থাপিত মৃৎফলকে বিশেষ স্থান দখল করে আছে তৎকালীন বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলে বসবাসকারী 'শবর' শ্রেণীর উপস্থাপনা। (চিত্র-৩২) যারা ছিলেন দেশের মধ্যভাগের বৃহৎ জঙ্গলের আদিবাসী সম্প্রদায়, তাঁরা সম্ভবত বাংলার সমভূমির অধিবাসীদের নিকট পরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের অরণ্য কেন্দ্রিক প্রকৃতি ও শিকার প্রবৃত্তির জন্য টেরাকোটা শিল্পীদের নিকট অন্যতম পছন্দের বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তাঁদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য রূপে বিচিত্র পোশাক যথা স্তনবর্ম বা উরস্ত্রাণ, পাতার তৈরি বহির্বাস, কাঁধে তীর রাখার খাপ যা থেকে কখনো তাঁরা তীর বের করার ভঙ্গীতে দৃশ্যমান এবং হাতে ধনুক। একটি ফলকে শবর নারী কাঁধে পত্রমাল্য দ্বারা ভূষিত এবং কোমরের চারপাশেও পত্রমাল্য দ্বারা সজ্জিত। অলংকার হিসেবে সাধারণত ফুল ও জংলা পাতার কানের দুল লক্ষণীয়, এছাড়া বিভিন্ন পুঁতি ও গাঁজা বীজের নেকলেস যা তাঁদের অন্যতম প্রিয় তাও লক্ষণীয়। তাঁরা কখনো হাতে ধনুক বা ছুরি আছে কখনও শিশু ধরে আছে, আবার কখনো হাতে শিকার করা হরিণ বা বন্য পশু ধরে আছে যা তাঁদের প্রচলিত খাদ্য। আবার বেশ কিছু ফলকে শবর দম্পতির প্রেমময় মুহূর্তের উপস্থাপনাও লক্ষণীয়।[280] সুতরাং এই শবর মানুষদের কিন্তু অত্যন্ত

[280] দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* ,পৃষ্ঠা- ৬৪-৬৫

সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে বঙ্গীয় মৃৎশিল্পে। তবে এক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন কিন্তু অবশ্যই উল্লেখ করা যেতে পারে, বৌদ্ধ বিহারের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় স্থাপত্যের অলংকরণে প্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা কি কেবল ই শিল্পীর রসবোধের প্রকাশ নাকি এর পশ্চাতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আদি মধ্যযুগীয় পর্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিদার্থে প্রান্তীয় মানুষদের মূলস্রোতের সাথে সংযুক্ত করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এটা কি তারই কোনও বহিঃপ্রকাশ? শিল্পীরা একান্তই নিজের মন থেকে এজাতীয় উপস্থাপনা গড়ে তুলেছিলেন নাকি উক্ত প্রান্তীয় মানুষদের তথা সমাজের সকল স্তরের মানুষদেরই এক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার জন্য বা তাঁদের গুরুত্ব বোঝাতে সচেতনভাবেই এরূপ উপস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছিল সে বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখা প্রয়োজন। হয়তো বর্তমান পরিসরে দাঁড়িয়ে এসকল প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর খুঁজে পাওয়া সর্বদা সম্ভব নয় কিন্তু এজাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন যে যথার্থই প্রাসঙ্গিক তা বলা চলে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্বে মহাস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে ভাসু বিহার থেকে প্রাপ্ত ফলকের মধ্যে একটিতে অনুরূপ পাতার পোশাক পরিহিত এক পুরুষ অবয়বকে হস্তী শিকারের ভঙ্গীতে লক্ষ করা গেছে, যা সম্ভবত এমনই কোনও অরণ্যচারী মানুষের উপস্থাপনা। (চিত্র-৩৩) তবে শুধু পাহাড়পুর বা মহাস্থানে নয়, অ্যান্টিচকেও অনুরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ উক্ত পরিসরে এইরূপ অরণ্যচারী গোষ্ঠীর উপস্থিতির বিষয়টিকে হয়তো অনুমান করাই চলে।

চিত্র-২৮ দম্পতি, ভাসু বিহার, মহাস্থান, সৌজন্যে- মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, বগুড়া, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র-২৯ মল্লবীর, সোমপুর মহাবিহার, নওগাঁ, বাংলাদেশ, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র-৩০

চিত্র-৩১

চিত্র-৩২

চিত্র-৩৩

চিত্র-৩০ নর্তকী, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, নওগাঁ, বাংলাদেশ, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র-৩১ মাছ, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, নওগাঁ, বাংলাদেশ, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র-৩২ শবর পুরুষ, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, নওগাঁ, বাংলাদেশ, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র-৩৩ শিকাররত অরণ্যচারী গোষ্ঠী, ভাসু বিহার, মহাস্থান,সৌজন্যে- মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, বগুড়া, বাংলাদেশ, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

১.৭ অন্যান্যঃ

আলোচ্য পর্বে বাংলার মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্যই হল তাঁর বৈচিত্র্যতা। বিস্তীর্ণ বিষয়বস্তু সম্পন্ন নানান ভঙ্গীর পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় বিবিধ প্রত্নস্থলে যার আভাষ উপরে দেওয়া

হল। তবে তার প্রসারতা এত বেশী যে সকল ফলকের পৃথক বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। উপরিবর্ণিত অবয়বসমূহ ছাড়াও আরও বেশ কিছু ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় আলোচ্য পরিসরে। যেমন প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কিছু সংযুক্ত অবয়বের কথা যার উপস্থিতি বাংলার প্রায় প্রতিটি প্রত্নস্থলে লক্ষণীয়। যার মধ্যে রয়েছে ময়নামতির ভোজরাজার প্রাসাদ থেকে প্রাপ্ত মনুষ্য মস্তক ও পক্ষীর দেহ এবং ডানা সহ অর্ধ-ঐশ্বরিক কিন্নর অবয়ব, অশ্ব মস্তকে মনুষ্য দেহ উপস্থাপনা[281] আবার পাহাড়পুরে ছাগলের সিং সহ মস্তকে চিতাবাঘের দেহ কিংবা পক্ষীর মস্তক, ডানা ও পায়ের সাথে মনুষ্য দেহের উপস্থাপনা লক্ষণীয়।[282] তেমনই জগজ্জীবনপুরে এক নারী দেহে গর্জনরতা সিংহীর মুখাবয়ব, পুরুষ দেহে বাঁদরের মুখাবয়ব ইত্যাদি লক্ষণীয়।[283] সাধারণত অনুমান করা হয়ে থাকে সমাজে প্রচলিত লোককাহিনী বা মানুষের চিন্তন থেকে এজাতীয় কল্পিত বা মিশ্র পশুর অস্তিত্বকে গ্রহণ করেছিল এবং শিল্পীরা সেই কল্পনাকে নিজ কর্মের মধ্য দিয়ে যথার্থভাবেই বাস্তবায়নের প্রয়াস করেছেন। এজাতীয় মিশ্র অবয়ব ছাড়াও বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পে লক্ষ করা যায় বিবিধ নির্মাণ স্থাপত্যের পরিকাঠামোর প্রতিফলন। যেমন- দেখা যায় গোলাকার পর্ণ কুটীর যা সম্ভবত বনবাসী সন্ন্যাসীদের বাসস্থান ছিল, আবার দেখা যায় মন্দিরের ন্যায় কাঠামো, বৌদ্ধ বিহারের ন্যায় পরিকাঠামো, দুর্গ বা পাহাড়ের ন্যায় পরিকাঠামো, এছাড়াও রয়েছে বাড়ির দরজা জানালার একাধিক উপস্থাপন যার মধ্যে পাহাড়পুরে একটি সাধারণ উপস্থাপনা লক্ষ করা যায় যেখানে এক মহিলা অর্ধেক খোলা একটি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন অপর দরজাটি বন্ধ এবং তাঁর হাত দরজার খিলানের গর্তে রাখা। (চিত্র-৩৪) এছাড়াও বিভিন্ন আকৃতির শঙ্খ, ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত নৌকো,[284] গ্রহ ও রাশি চক্রের উপস্থাপনা,[285] পদ্মের ওপর রক্ষিত পুঁথি যা সম্ভবত বৌদ্ধ পুঁথি প্রজ্ঞা পারমিতার উপস্থাপনা, ভোটিভ স্তূপ ও ধর্মচক্রের উপস্থাপনা[286] প্রভৃতি আরও একাধিক সমৃদ্ধ ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলি থেকে যা সার্বিক ভাবে সমৃদ্ধ করেছে বাংলার শিল্প ইতিহাসকে।

---

281 ইমাম, *এক্সকাভেশন অ্যাট ময়নামতী,* পৃষ্ঠা- ১৬৬

282 দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* ,পৃষ্ঠা-৬৩

283 রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা- ৯০

284 দীক্ষিত, *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর* ,পৃষ্ঠা- ৭১

285 রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা- ৮৯

286 রায়, *জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট,* পৃষ্ঠা- ৯৪

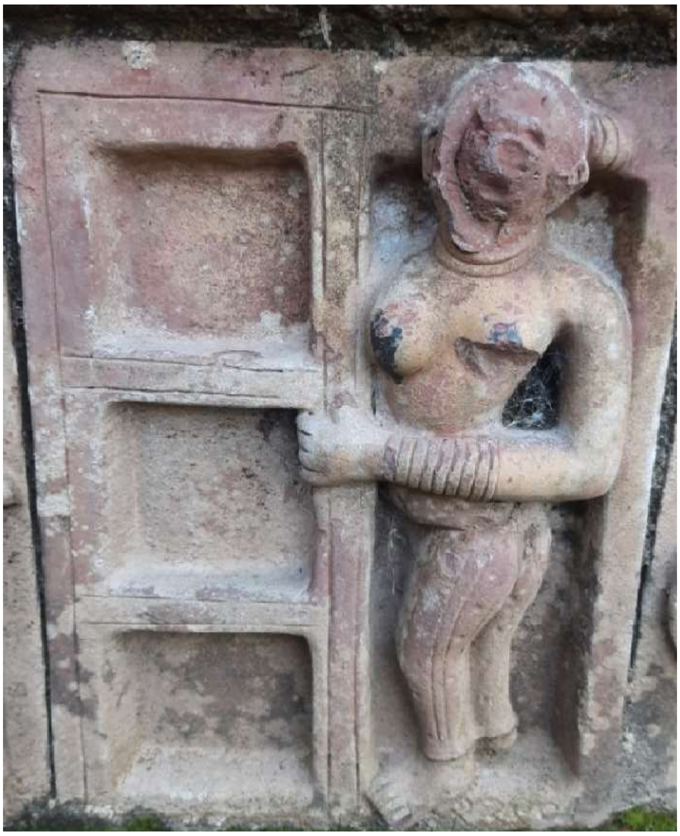

চিত্র- ৩৪ অর্ধেক খোলা দরজায় দাঁড়ানো নারী অবয়ব, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, নওগাঁ, বাংলাদেশ , ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

অদ্যাবধি আলোচনার নিরিখে বলা চলে, আলোচ্য পর্ব তথা আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কাল বাংলার টেরাকোটা শিল্প ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। যেকোনো কালপর্বের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার বস্তু উপাদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলত প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রেও তার পুরাদ্রব্যের ভূমিকা অসামান্য, কেননা এগুলি সমকালীন মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তারা তাঁদের নিজের নান্দনিক শিল্পবোধ থেকে, সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কিংবা সম্ভবত

পৃষ্ঠপোষকের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকেন। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে পোড়ামাটি ফলকগুলি সমকালীণ সমাজ ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। ফলত সমকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে যে এই মৃৎশিল্প বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সামাজিক ইতিহাস কিন্তু কোন পৃথক বিষয় নয়; শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন তথা মানব জীবনের বিবিধ দিক আদতে সমাজের মধ্যে সম্পৃক্ত। বঙ্গীয় টেরাকোটার বিশেষত্বই হল তার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে। সেখানে যেমন বাস্তব রূপ পেয়েছে শিল্পীর মানস জগৎ তেমনই তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা বিষয় থেকে নিজ শিল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছে। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যায়, তৎকালীন মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও তৎসম্পর্কিত বিবিধ অবয়বের আভাষ যেমন দেয়, অর্থাৎ একাধিক বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অবয়ব যেমন সমাজে উভয় ধর্মের সহাবস্থানকে নির্দেশ করে তেমনই এই শিল্পের এক বিস্তীর্ণ সামাজিক প্রেক্ষিতও বিদ্যমান। যার থেকে সমকালীন সমাজের একাধিক চিত্রের আভাষ পাওয়া যায় যথা; সাধারণ মানুষ, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পরিবেশ, পশু-পাখি, বিনোদন মাধ্যম, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিবিধ দিক কিন্তু প্রকাশিত এই ফলকগুলির মধ্য দিয়ে দিয়ে যা শিল্পীদের রুচিবোধ, পর্যবেক্ষণ দক্ষতা, প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান, সর্বোপরি শিল্প সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ও অভিজ্ঞতার দিকটিকে উপস্থাপিত করে। আলোচ্য পর্বে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে শিল্পক্ষেত্রও প্রভাবিত হয় যার প্রতিফলন উপলব্ধি করা যায় আলোচ্য শিল্পমাধ্যমের মধ্য দিয়ে যার ফলে প্রযুক্তি, কলাকৌশলের পাশাপাশি উপস্থাপিত বিষয়বস্তুতেও নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য আসে বলে মনে করা হয় যারই ফলশ্রুতিতে উক্ত উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমকালীন মানুষের জীবনযাপনের বিস্তীর্ণ দিক প্রকাশিত হয় বলে মনে করা যেতে পারে।

২. বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের স্বতন্ত্রতা অনুসন্ধান

এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা চলে এক্ষেত্রে অন্যতম প্রশ্ন হল, এই পর্বের (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক) বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের বিশেষত্ব কি? তথা, বাংলার এই শিল্পধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান বা এর মধ্যে আদৌ কতখানি স্বতন্ত্রতা বা নিজস্বতা নিহিত ছিল তার বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ের অন্যতম প্রতিপাদ্য। সেই সূত্রে বলা চলে মোটামুটিভাবে দুইভাবে বঙ্গীয়

মৃৎশিল্পের এই বিশেষত্ব বা স্বতন্ত্রতাকে বিশ্লেষণের প্রয়াস করা যেতে পারে, প্রথমত তার সময়কালের নিরিখে এবং দ্বিতীয়ত আঞ্চলিক অবস্থানের নিরিখে।

(২.১) সময়কালের নিরিখে বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের বিশেষত্ব নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা চলে বর্তমানে আমাদের আলোচনা আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ দ্বাদশ শতক কেন্দ্রিক, কেননা মৃৎশিল্পের ইতিহাসের নিরিখে এই পর্যায়টি বিশেষ সমৃদ্ধ অধ্যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় হল বাংলায় মৃৎশিল্পের প্রাপ্তি বা বিকাশ কিন্তু এই পর্বেই প্রথম নয় বরং ইতিপূর্বে বঙ্গীয় পরিসরে তার এক সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে যার আভাষ দেওয়া হয়েছে প্রথম অধ্যায়েই। প্রায়-ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে শুরু করে আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতক অর্থাৎ সমগ্র প্রথম সহস্রাব্দ ব্যাপী বঙ্গীয় পরিসরে পোড়ামাটি শিল্প ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। যা বাংলার সাধারণ মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এর এখানেই উক্ত প্রশ্নটি উঠে আসে তাহলে পৃথক রূপে এই পর্যায়ের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কি বা তার বিশেষত্ব কি? আর তার ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা চলে আলোচ্য পর্বে মৃৎশিল্প সম্পূর্ণ রূপে তার অভিনবত্ব ও নিজস্বতায় পরিপূর্ণ। শৈল্পিক উপস্থাপনা এবং বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট রূপেই তার নিজস্বতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমেই মৃৎ অবয়বের বাহ্যিক শৈল্পিক কাঠামো বা উপস্থাপনার নিরিখে বলা চলে, সমগ্র আদি ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে বাংলার পোড়ামাটি শিল্প ছিল মূলত একক অবয়ব বা ক্ষুদ্র ফলক রূপে। সেগুলিকে অতি সহজে এক স্থান থেকে অন্যত্র বহন করা যেত এবং যা ছিল একান্তভাবেই সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত চাহিদার প্রয়োজনে নির্মিত। কিন্তু ক্রমে সেই ধারা পরিবর্তিত হয়, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ দ্বাদশ শতকে বাংলার বর্গাকার বা আয়তাকার ফলকগুলি পরিমাপের দিক থেকেও পূর্বের তুলনায় ছিল বৃহৎ, যেমন- উচ্চতা বা দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে আদি ঐতিহাসিক ফলকগুলি ছিল আনুমানিক ৫/৬ – ১৪/১৫ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থের ক্ষেত্রে ৪-৫ সেন্টিমিটার এর ন্যায় কিন্তু গুপ্তোত্তর অধ্যায়েই মহাস্থান, পাহাড়পুর, জগজ্জীবনপুর বা ময়নামতী অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য সময়কালে প্রাপ্ত বঙ্গীয় ফলকগুলি মোটামুটি দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে ২১.৫- ৪১.৫ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থের

ক্ষেত্রে মোটামুটি ১৬.৫-৪৩ সেন্টিমিটার এর ফলক লক্ষণীয়।[287] পাশাপাশি অপর একটি কথা বলতে হয় এই শিল্পের নির্মাণ পদ্ধতির পরিবর্তন; আদি ঐতিহাসিক পর্বে মৃৎ অবয়ব নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্বের হস্ত নির্মিত অবয়ব ছাড়াও একাধিক ছাঁচের প্রয়োগ লক্ষ করা যেত যথা- একক ছাঁচ, যুগ্ম ছাঁচ প্রভৃতি। কিন্তু গুপ্তোত্তর পর্বের টেরাকোটাগুলি মূলত হাতে তৈরি যদিও আদি ঐতিহাসিক পর্বের হস্ত নির্মিত অবয়ব অপেক্ষা এগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রসঙ্গত বলা চলে, এই পর্বের মৃৎ অবয়বের প্রধান শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যই হল এগুলি বেস-রিলিফ (Base-Relief) পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ যা বিস্তৃত রূপে বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতেই ইতিপূর্বে আলোচিত, বাংলায় এর পূর্ববর্তী সময়ে মৃৎশিল্পে কিন্তু এই ধারা পরিলক্ষিত হয়না। আলোচ্য পর্বে উপরিল্লিখিত এইরূপ শৈল্পিক কাঠামোর মৃৎশিল্পের উপস্থিতি স্পষ্টতই নির্দিষ্টরূপে পাওয়া যায় স্থাপত্যিক নির্মাণ গাত্রে। আপেক্ষিকভাবে মনে হয় খুব সম্ভবত এই উপস্থাপনার উদ্দেশ্য ছিল স্থাপত্যিক নির্মাণের বাহ্যিক দেওয়ালের একঘেয়েমি কাটিয়ে তাকে শৈল্পিক দিক থেকে আকর্ষণীয় করে তোলা। আনুমানিক ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ কালীন মহাস্থানের পলাশবাড়ি এলাকায় কানাইধাপ নামক স্থানে প্রাপ্ত রামায়নের কাহিনী সম্বলিত মৃৎ ফলকের প্যানেলের মধ্য দিয়ে এর সূচনা বলা চলে যা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে পাল-দেব পর্বে পাহাড়পুর, অ্যান্টিচক, ময়নামতি, পিলাক, জগজ্জীবনপুরের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ বাহ্যিক উপস্থাপনার নিরিখে তথা মৃৎশিল্পের উদ্দেশ্য ব্যবহার তথা বিকাশের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি এই পর্যায়ে।

অপরদিকে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও বেশ কিছু অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয় আদি মধ্যযুগীয় বঙ্গীয় মৃৎশিল্পে। যেমন প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার নিরিখেই দেখা গেছে আদি ঐতিহাসিক পর্বের পোড়ামাটি অবয়বের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে মানুষের সহজ সরল প্রাথমিক বিশ্বাস বা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ। যা মূলত উর্বরতা বা প্রজনন স্বত্তা তথা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা যার মূলে রয়েছে আদতে সমৃদ্ধি বা মঙ্গলময়তার আকাঙ্ক্ষা উক্ত প্রেক্ষিত থেকে সম্পদের দেবী (শ্রীলক্ষ্মী), ধান্যদেবী, লজ্জাগৌরীর

---

[287] শরমিন রেজোয়ানা, 'রিপ্রেসেন্টেশন অফ লোটাস অন টেরাকোটা প্লাকস ৪র্থ টু ১৩থ সেঞ্চুরি সি ই', ব্রিজেশ রাওয়াত সম্পাদিত *আইকন (ICON) - জার্নাল অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড কালচার* , ওয়াকাংকার রক আর্ট অ্যান্ড হেরিটেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ভলিউম- ৪ ভোপাল/নিউ দিল্লী, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৯৯

ন্যায় অবয়বের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু গুপ্ত পর্ব থেকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বহুলাংশে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। ফলত পাহাড়পুর, জগজ্জীবনপুর বা ময়নামতীর পোড়ামাটি শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখি আদি ঐতিহাসিক পর্বের উক্ত উর্বরতার সাথে সম্পর্কিত দেবী অস্তিত্বের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আরাধ্য দেবদেবী যথা- ব্রহ্মা, শিব, বোধিসত্ব, তারা প্রভৃতি অবয়বের উপস্থাপনা রয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে শিল্পীরা এই সকল দৈবিক সত্বার সাথে সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় প্রতীক বা ভঙ্গিমা/মুদ্রা কেও তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন যা ইতিপূর্বে ছিল সম্পূর্ণই বিরল। সম্ভবত পরিবর্তিত আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে জনগণের চাহিদা পূরণে এ ধরণের অবয়বের উপস্থাপনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[288] আনুমানিক গুপ্ত পর্ব থেকে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারা বাংলায় প্রবেশ করলে স্থানীয় ধর্মীয় উপাদানের সাথে তাঁর সমন্বয় বা আত্তীকরণের ফলস্বরূপ মানুষের ধর্মীয় চিন্তা বা আচার বিধিতে পরিবর্তন আসে এবং স্থানীয় দেবদেবীরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল কাঠামোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে নতুন সত্তায় ভূষিত হয় কিংবা গৌন দেবতার পরিচয় লাভ করে। আর টেরাকোটা যেহেতু সংশ্লিষ্ট সমাজেরই প্রতিফলন ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মৃৎশিল্পেও তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি এই পর্বের বিশেষত্ব হল সহজ সরল ভঙ্গীতে স্থানীয় সামাজিক উপাদান বিশেষত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিবিধ দিক ও মুহূর্তের নিখুঁত উপস্থাপনা যা ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ে বিস্তারে আলোচিত হয়েছে; কিন্তু আদি ঐতিহাসিক পর্বে দু একটি ফলক ছাড়া মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের উপস্থিতি ছিল বিরল। আবার বলা চলে, বাংলার মৃৎশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিবিধ সামাজিক প্রেক্ষিতের উপস্থাপন। অন্যদিকে বিশেষ লক্ষণীয়, আদি ঐতিহাসিক পর্বে বাংলায় পোড়ামাটি শিল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিস্তীর্ণ মিথুন বা দম্পতি উপস্থাপনা। আদি ঐতিহাসিক পর্বের টেরাকোটা শিল্পের বিচারে বাংলায় বিশেষত চন্দ্রকেতুগড়ের নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যেখানে রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ভঙ্গি অতি দক্ষতার সহিত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা আদি মধ্যযুগীয় পরিসরে প্রায় অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে দম্পতি ফলকের সংখ্যাগত প্রাপ্তি কম হওয়ার পাশাপাশি সেখানে ফলকগুলি সাধারণত নারী পুরুষের প্রেমময় দৃশ্য বলে মনে হয়, কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ে যৌনক্রিয়ার বিভিন্ন ভঙ্গীকে অতি বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেভাবে তাতে মনে হয় উক্ত ভঙ্গীই মুখ্য বিষয় শিল্প উপস্থাপনার যা বহুলাংশে বাংলার শিল্পী বা নাগরিক পৃষ্ঠপোষকদের

[288] বিশ্বাস , *টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল,* পৃষ্ঠা- ১৮

উন্মুক্ত মানসিকতা এবং স্বতন্ত্র শিল্পধারারও পরিচয় দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রতিক্রিয়া মনুষ্য জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই জাতীয় উপস্থাপনা কেবল নান্দনিকতা বা বিনোদনের মাধ্যম নয়, বলা বাহুল্য প্রজনন সত্ত্বা বা উর্বরতার ধারণার ক্ষেত্রেও কিন্তু তা গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও আদি মধ্যযুগীয় পর্বে এই শিল্পের বিষয়বস্তু রূপে এই উপাদান সীমিত হয়ে পড়ল কেন? যেহেতু ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে বৌদ্ধ বিহারের অংশ হিসেবে আদি মধ্যযুগীয় ফলকের নির্মাণ সেকারণেই কি তার বিষয়বস্তুও সেই অনুযায়ী সীমিত? এইরূপ একাধিক উদাহরণ হয়তো লক্ষ করা যায় উভয় সময়কালের মৃৎশিল্পের সূক্ষ্ম বিচারে, কিন্তু পরিসরের স্বল্পতায় সবকিছু তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ শৈল্পিক উপস্থাপনা হোক বা অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু সর্বত্র এক স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয় পর্যায়ে।

(২.২) এই পর্বের মৃৎশিল্পের স্বতন্ত্রতা বা বিশেষত্ব অনুসন্ধানের প্রয়াসে অপর যে প্রেক্ষিতের উপর আলোকপাত করা যায় তা হল বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের আঞ্চলিক অবস্থানের নিরিখে তার বিশ্লেষণ। বলা যায় আলোচ্য সময়পর্বে আমরা ব্যাপকঅর্থে 'বঙ্গীয়' মৃৎশিল্প শব্দটি ব্যবহার করলেও, বাংলার ভৌগোলিক পরিচিতি যথেষ্ট জটিল। দেখা যায় প্রাচীন বাংলা মূলত স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক পৃথক কিছু আঞ্চলিক ভূখণ্ড বা উপঅঞ্চলে বিভক্ত ছিল যথা- পুণ্ড্র,রাঢ়,গৌড়,বঙ্গ,সমতট,হরিকেল এবং সেভাবেই মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলিও পৃথক পৃথক উপঅঞ্চলের অধীন ছিল। ফলে সূক্ষ্ম আঞ্চলিক ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের উপস্থিতির সম্ভাবনা হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলা যায়না। কিন্তু প্রশ্ন হল পৃথক আঞ্চলিক পরিসরে নির্মিত হলেও সমকালীন মৃৎশিল্পের বিকাশে সেই স্বতন্ত্র আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রভাব কতখানি বিদ্যমান ছিল? বলা বাহুল্য আদৌ কি বঙ্গীয় মৃৎশিল্পকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে পৃথক পরিচিতি প্রদান করা সম্ভব নাকি বাংলায় মৃৎশিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে সচেতনভাবে এক নির্দিষ্ট ধারা অনুসৃত হয়েছিল? এই জাতীয় নানা সম্ভাবনা কিন্তু সম্পৃক্ত রয়েছে বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে।

আলোচ্য পর্বে বাংলায় মৃৎশিল্পের প্রাপ্তিস্থানগুলি লক্ষ করলে মহাস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায় অদ্যাবধি উৎখননের নিরিখে তার মূল দুর্গাঞ্চল থেকে পাল সেন তথা গুপ্তোত্তর পর্বের মৃৎ অবয়ব আবিষ্কৃত হয়নি। বরং তার নিকটবর্তী বিবিধ কেন্দ্র যথা ভাসু বিহার, বিহার ধাপ, বৈরাগীর ভিটা, পলাশবাড়ির কানাইধাপ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সমৃদ্ধ পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার ময়নামতির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি কেবল একটা কেন্দ্র নয় বরং শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ

বিহার, ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়ার ন্যায় একাধিক বৌদ্ধবিহার গাত্রে সজ্জিত ছিল এই টেরাকোটা শিল্প। ফলে এত বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিসর জুড়ে ভিন্ন স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভিন্ন শিল্পী ব্যক্তিত্বের দ্বারা নির্মিত অজস্র মৃৎফলকে আপাতভাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকাই আশানুরূপ। সেক্ষেত্রে বর্তমানে তথ্য প্রমাণ হিসেবে স্থিত ফলকগুলির আলোচনার নিরিখেই যেকোনো সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু বক্তব্যের উপস্থাপন করা হল।

(২.২.১) প্রথমেই উল্লেখ করা যায় মহাস্থানের পলাশবাড়ীর কানাইধাপ এর কথা, যেখান থেকে আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতকীয় সমৃদ্ধ পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলিকে পরপর সাজালে রামায়নের আদিকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের কাহিনীর উপস্থাপন লক্ষ করা যায়, এবং প্রতিটি ফলককে নিশ্চিত পরিচিতি প্রদান করে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী লিপি। আদি মধ্য যুগের মৃৎশিল্পের ইতিহাসে পলাশবাড়ী নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পলাশবাড়ীর মৃৎশিল্প তার বিষয়বস্তু বা মূর্তি উপস্থাপনে সমকালীন ধ্রুপদী গুপ্ত ভাস্কর্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল, তবে তার আঙ্গিক বা দৈহিক বহিঃপ্রকাশে, মৌখিক অভিব্যক্তিতে, সরলীকরণে যথার্থই তার নিজস্বতা বা স্থানীয় চরিত্র অব্যাহত থেকেছে যা বঙ্গীয় শিল্প ইতিহাসে একে এক স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রদান করে। এই কেন্দ্রে প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বগুলি দীর্ঘকালব্যাপী বৌদ্ধধর্মের সাথে আদি মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্পের একচেটিয়া সম্পর্কের সমীকরণকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করায়। অদ্যাবধি প্রাপ্ত উপাদানের মধ্যে একমাত্র এখানেই এক ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগাত্রে বিপুল রূপে ব্রাহ্মণ্য উপাদান সম্পন্ন মৃৎফলকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিশেষ উল্লেখ্য একমাত্র ব্রাহ্মণ্য উপাদান ছাড়া এখানে অন্য বিষয়বস্তুর উপস্থিতি নেই। যা খুব স্বাভাবিক রূপেই এক ভিন্ন পরিসর এবং ভিন্ন পৃষ্ঠপোষকতার উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। যদিও এই অঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্বে দেখা গেছে, এত সমৃদ্ধ পোড়ামাটি ফলকের প্রাপ্তিস্থল কানাইধাপ বর্তমানে সম্পূর্ণই নিশ্চিহ্ন, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর অধিগ্রহণ না নেওয়ায় স্থানীয় মানুষের কৃষিজমি রূপে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে প্রাপ্ত পোড়ামাটি ফলকগুলি অতি সযত্নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত। এত বিস্তৃত রূপে মহাকাব্যের কাহিনীর নিখুঁত উপস্থাপন অন্য কোনও প্রত্নস্থলে লক্ষ করা যায়না। পাহাড়পুর,ময়নামতি বা পিলাক থেকে প্রাপ্ত কিছু ফলকে পৌরাণিক কাহিনী বা লোককাহিনীর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন অনুমান করা হলেও তা এগুলির সমগোত্রীয় নয় এবং সেখানে কোনও অনুক্রম নেই, সেগুলি প্রতিস্থাপনের সময় কাহিনীর প্রবহমানতা বজায়

রাখার কথা ভেবে সেগুলি লাগানো হয়নি। বলা ভালো প্রায় সর্বত্রই মৃৎফলকের কোনও বিষয়বস্তুই ধারাবাহিকভাবে প্রতিস্থাপিত নয়। পাশাপাশি পরিচিতি প্রদান স্বরূপ এতে উৎকীর্ণ লিপি এই পলাশবাড়ীর মৃৎফলকগুলিকে নিশ্চিত রূপে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করে যা বাংলার অন্য কোথাও লক্ষণীয় নয়। (চিত্র-৩৫,৩৬) শুধু রামায়ন কাহিনী সম্বলিত ফলক নয়, এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি অবয়বও একইভাবে লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগজ্জীবনপুরে আবার আশ্চর্যজনকভাবে কাহিনী সম্বলিত ফলক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, যা তাকে এই আলোচনার নিরিখে এক বিশেষত্ব প্রদান করে। কিন্তু পলাশবাড়ী থেকে কিন্তু সামাজিক উপাদান সম্বলিত মৃৎফলক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং বৌদ্ধ উপাদানও অনুপস্থিত। তাহলে কি বলা যায় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান তার শিল্পের বিষয়বস্তুতে যে ব্যপকতা প্রদান করেছিল এই প্রতিষ্ঠান সেই পরিসর প্রদানে সমর্থ হয়নি? যেহেতু খুব সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য মন্দির গাত্রে সেগুলি পাওয়া যায় ফলেই কি তার বিষয়বস্তু একান্তই সীমিত ছিল? এই দিকগুলি কিন্তু পলাশবাড়ী সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রটিকে আরও প্রসারিত করে বলা বাহুল্য।

চিত্র-৩৫

চিত্র-৩৫ রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ এবং লক্ষণ ও বিশ্বামিত্রের বিস্ময় প্রকাশ, পলাশবাড়ি, মহাস্থান, সৌজন্যে- বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

চিত্র-৩৬

চিত্র-৩৬ রামকে বনবাসে পাঠিয়ে দশরথের অসুস্থতা, পলাশবাড়ি, মহাস্থান, সৌজন্যে- বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর ২০২২

(২.২.২) আবার ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে জগজ্জীবনপুরের ফলকগুলি লক্ষ করলে দেখা যায় এখানে এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, বিবিধ যুদ্ধ ভঙ্গিমায় সৈন্য বা যোদ্ধাশ্রেণীর উপস্থাপনা রয়েছে, যা অন্য প্রত্নকেন্দ্রের অনুপাতে সর্বাধিক। তাঁদের উপস্থাপন ভঙ্গী থেকে মনে হয় তারা সাধারণত পদাতিক বাহিনী এবং দৈহিক বিন্যাশে কোমর বন্ধনী জাতীয় বেল্ট দিয়ে বাঁধা ছোট ধুতি জাতীয় নিম্নবস্ত্র, বিবিধ অলংকার ও কেশবিন্যাশ লক্ষণীয়। এক্ষেত্রেও একই কথা বলতে হয় অন্য প্রত্নকেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত রূপে অস্ত্রশস্ত্র সহযোগে যোদ্ধা শ্রেণীর উপস্থাপনা থাকলেও জগজ্জীবনপুরের ন্যায় সুস্পষ্ট ও এত বিপুল উপস্থাপন অন্যত্র নেই। বৌদ্ধ বিহারে এইরূপ বিপুল যোদ্ধার উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে কৌতূহল উদ্দীপক। কিন্তু বারংবার একটি প্রশ্নই উঠে আসে বৌদ্ধবিহারে এত যোদ্ধার উপস্থিতির প্রাসঙ্গিকতা কি? তাহলে কি বলা যেতে পারে জগজ্জীবনপুরের নির্মাতা পালরাজা মহেন্দ্রপালদেবের সেনাপতি বজ্রদেবের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে যেহেতু এই বিহার নির্মিত হয়েছিল, তার

ফলস্বরূপই কি বজ্রদেবের ব্যক্তিগত পেশার প্রতিফলন এত বিপুলভাবে পরিলক্ষিত হয় বিহারের গাত্রে? তবে এরূপও মনে করা হয় যে, তারা হয়তো উক্ত প্রতিষ্ঠানের রক্ষাকর্তা ছিল কিংবা কোনও স্থানীয় লোকগাথার যুদ্ধ রীতির ও প্রতিচ্ছবি হতে পারে এইরূপ উপস্থাপন।[289] ফলত এই বিষয়টি জগজ্জীবনপুরের মৃৎশিল্পকে এক অভিনবত্ব প্রদান করে সন্দেহ নেই।

(২.২.৩) বিষয়বস্তু ব্যতিরেকে যদি মৃৎঅবয়বের বাহ্যিক শৈল্পিক উপস্থাপনার কথা বলতে হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় জগজ্জীবনপুরের ফলকে অবয়বগুলি তার চারিপাশের ফ্রেম থেকে বেড়িয়ে খানিক উত্থিত ভঙ্গীতে দৃশ্যমান (চিত্র-৩৭) কিন্তু পাহাড়পুর, ময়নামতি বা মহাস্থানের ক্ষেত্রে সেগুলি কিছুটা ভারসাম্যযুক্ত এবং ফ্রেমের মধ্যেই উপস্থাপিত। (চিত্র-৩৮) তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টি আলোচনা করতেই হয় তা হল, মৃৎ অবয়বের মৌখিক অভিব্যাক্তি এবং ময়নামতির নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য। আপেক্ষিকভাবে দেখা যায় এখানে প্রাপ্ত মৃৎ অবয়বের বাহ্যিক অভিব্যক্তির সাথে বাংলার অন্য কেন্দ্রে প্রাপ্ত অবয়বের কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এক্ষেত্রে ময়নামতির সাথে পিলাক এর আলোচনা চলে আসে, কেননা এই দুই কেন্দ্রের মৃৎ অবয়বের বাহ্যিক উপস্থাপন বা মৌখিক অভিব্যক্তি বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা অন্যান্য অঞ্চলের উপস্থাপনা থেকে যে খানিক ভিন্ন তা উপলব্ধি করা যায়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পলাশবাড়ির সমতুল্য না হলেও রামায়ণের কাহিনী সম্বলিত ফলক পাওয়া যায় পিলাক এও , কিন্তু উভয় স্থানের বাহ্যিক উপস্থাপনায় পার্থক্য সুস্পষ্ট যা তাদের নিজ নিজ স্থানীয় শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে। (চিত্র-৩৯) ইতিপূর্বেই পলাশবাড়ী থেকে আবিষ্কৃত অবয়ব এর চিত্র প্রদান করা হয়েছে, ফলত এখানে পিলাক থেকে প্রাপ্ত রামায়ণ কাহিনী সম্বলিত চিত্রের উপস্থাপন দ্বারা বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়াস করা হল। পূর্ববর্তী অন্যান্য অধ্যায়ের আলোচনায় বোঝা যায় টেরাকোটা সমৃদ্ধ অন্যান্য কেন্দ্র অপেক্ষা ময়নামতি তথা সমতট অঞ্চল এক স্বতন্ত্র ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চরিত্রের অধিকারী ছিল। পাল অধ্যুষিত বরেন্দ্র অঞ্চল বা বিহারের সংস্কৃতি অপেক্ষা যা ছিল খানিক ভিন্ন। ফলত এক্ষেত্রে শিল্প ঐতিহ্যেও যে তার প্রভাব পড়বে তা যথেষ্টই কাম্য।

---

[289] সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম-২, ঢাকা,বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩৬৬-৩৬৮

ময়নামতী বা পিলাক সংলগ্ন অঞ্চলের অবয়বে স্থানীয় তথা লোকঐতিহ্যের ছাপ অধিক লক্ষণীয় বলে মনে করা হয়ে থাকে কিন্তু পাহাড়পুর, অ্যান্টিচক বা জগজ্জীবনপুর ইত্যাদি ক্ষেত্রে তা কিছুটা পাল ঐতিহ্যের শাস্ত্রীয় ছাপ লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা কালে যে বিষয়টি চোখে পড়েছে তা হল ময়নামতিতে মৌখিক প্রকাশ অনেক বেশী জোরালো, বিস্ফারিত চক্ষু, প্রসারিত মুখ, তেজময় প্রকাশ লক্ষণীয়। যা অন্য কেন্দ্রে কিছু শান্ত, মার্জিত ও পরিমিত ধাঁচের বলে মনে হয়। এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে প্রদত্ত ময়নামতি ও অন্যান্য কেন্দ্র থেকে আবিষ্কৃত একাধিক ফলকচিত্র থেকেই এই ধারা উপলব্ধি করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি সুচন্দ্রা ঘোষ এবং সায়ন্তনী পাল রচিত একটি প্রবন্ধে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য পর্বের অন্যতম টেরাকোটা সমৃদ্ধ কেন্দ্র সোমপুর মহাবিহারের প্রাপ্ত টেরাকোটা অবয়বগুলি কিছুটা গাঙ্গেয় উপত্যকীয় শৈলীর প্রতিফলন হলেও ময়নামতী(দক্ষিন-পূর্ব বাংলা) কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের অধিকারী, এখানে অবয়বের মৌখিক অভিব্যাক্তির উপস্থাপনা আপেক্ষিকভাবে কিছুটা ভিন্ন মনে হয়[290] যা তার স্থানীয় সত্তাকে পরিচয় প্রদান করে বলা যেতে পারে।

চিত্র-৩৭

চিত্র-৩৮

290 ঘোষ, পাল, ‘এভরি ডে লাইফ ইন আর্লি বেঙ্গল’, পৃষ্ঠা- ৩৩

চিত্র-৩৭ জগজ্জীবনপুরে ফ্রেম থেকে উত্থিত অবয়ব, জগজ্জীবনপুর, সৌজন্যে- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, ডিসেম্বর, ২০২৪

চিত্র-৩৮ পাহাড়পুরে ফ্রেমের মধ্যে স্থিত অবয়ব,পাহাড়পুর, সৌজন্যে- সীমা রায় চৌধুরী; আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত "হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ", ভলিউম-২, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩৬৬

চিত্র- ৩৯ রাম ও লক্ষণের উপস্থাপন, পিলাক, জোলাইবাড়ি, ত্রিপুরা, সৌজন্যে- সুব্রত দে, 'টেরাকোটা প্লাকস অফ পিলাক ইন ত্রিপুরাঃ আ হিডেন কালচারাল হেরিটেজ', *হেরিটেজঃ জার্নাল অফ মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্টাডিস ইন আর্কিওলজি*, ৭, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৯৫০

অপর একটি বিষয় উল্লেখ করা চলে ময়নামতী বা ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি অঞ্চলের পিলাক এর সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রাপ্ত মৃৎশিল্পের মিল আছে বলে মনে করা হয়। আবু ইমাম তার গ্রন্থে ময়নামতির রূপবান মুড়া থেকে আবিষ্কৃত কয়েকটি অবয়বকে নির্দিষ্ট রূপে দক্ষিণ পূর্ব এশিয় প্রভাব সম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন একজন নারীকে হাতে

পতাকা নিয়ে সম্ভবত কোনও মন্দিরের দিকে যেতে দেখা যাচ্ছে, তার পোশাকে বৃত্তাকার ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে যা বর্তমানের জরিদার পোশাকের কথা মনে করায় তাকে আপাতভাবে বার্মা বা আরাকানের বাসিন্দা বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। (চিত্র-৪০) অপর নারী অবয়বে কানে পত্র কুণ্ডল, চুল মাথার ওপর খোপা বাঁধা রূপে দেখা যায় আধুনিক বার্মার নারীদের ন্যায়। যদিও নিশ্চিত রূপে এই ধরণের পরিচিতি প্রদান যথেষ্টই সংশয়াত্মক। আবার কীর্তিমুখ অবয়বকে তিনি জাভার কালো-মকর এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।[291] অর্থাৎ নানাভাবে কিন্তু বারংবার ময়নামতির মৃৎশিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কথা উঠে আসে।

চিত্র-৪০

চিত্র-৩৯ পতাকা হাতে বিদেশী রমণী (?), রূপবান মুড়া, ময়নামতি, সৌজন্যে- আবু ইমাম, *এক্সকাভেশন অ্যাট ময়নামতী: অ্যান এক্সপ্লোরেটারি স্টাডি,* ঢাকা,বাংলাদেশ,আই সি এস বি এ, ২০০০, প্লেট- xv,6

(২.২.৪) শেষে আরেকটি কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা চলে, অধুনা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মোগলমারি কেন্দ্রটির কথা। যেখানে দেখা যাচ্ছে পাহাড়পুর, অ্যান্টিচক, ময়নামতি, জগজ্জীবনপুর, মহাস্থানের সাথে প্রায় একই সময়কালে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ আনুমানিক সপ্তম –একাদশ/দ্বাদশ শতকীয় একটি বৌদ্ধ বিহারের নিদর্শন পাওয়া যায় আলোচ্য কেন্দ্রে অথচ বিহারের অলংকরণে উপস্থাপিত হয়েছে পোড়ামাটি শিল্পের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্প হিসেবে স্টাকো অবয়ব।

291 ইমাম, *এক্সকাভেশন অ্যাট ময়নামতী,* পৃষ্ঠা- ১৭০

যে সময়কালে বাংলার অন্য সকল কেন্দ্র এক ধারা অনুসরণ করে মৃৎশিল্পের উপর নির্ভর করেছে স্থাপত্যিক অলংকরণে সেখানে কিন্তু এই সম্পূর্ণ রূপে নিজস্বতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে এবং বলা বাহুল্য মোঘলমারি ব্যাতিত এইরূপ স্টাকো অলংকরণ বাংলার অন্যত্র কোথাও পরিলক্ষিত হয়না। এখানে কিছু পদ্ম, জ্যামিতিক আকার, পশু, কুবের, নৃত্যরত যুগল বা অন্য ধাঁচের মানবীয় উপস্থাপনা প্রভৃতি লক্ষণীয়।[292] যা আদতে বঙ্গীয় অন্য প্রত্নস্থল এর বৌদ্ধ বিহারের পোড়ামাটি প্যানেলের প্রায় অনুরূপ উপস্থাপন। ফলত উল্লেখ্য ভিন্ন শিল্প মাধ্যম হলেও তাকে কি বাংলার মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায়? সেটি অন্যতম প্রশ্ন। কেননা তার যে উপাদান বা তাঁদের নির্মাণ শৈলী বা বাহ্যিক উপস্থাপনাও প্রায় অনুরূপ যার বিস্তৃত উল্লেখ করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। ফলে যে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে গেলেই তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তা করা প্রয়োজন। তবে তা স্বত্তেও মোগলমারি যে এক স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছিল তথা বঙ্গীয় শিল্প ক্ষেত্রেও এক নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তা স্বত্তেও কেন এতটা ভিন্ন শিল্পধারার প্রসার ঘটল মোঘলমারিতে? তাঁর শিল্পী কারা বা কাঁচামালের সরবরাহ কিভাবে হল? আর তা মোঘলমারির মধ্যে সীমিতই বা হয়ে গেল কেন? এক্ষেত্রে তার ভৌগোলিক অবস্থান, পৃষ্ঠপোষকতা, প্রশাসনিক পরিকাঠামোর চরিত্রের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তা কতখানি অনুধাবন করা সম্ভব? এজাতীয় একাধিক প্রশ্ন কিন্তু জড়িয়ে রয়েছে এই কেন্দ্রটির সাথে।

সুতরাং বলা চলে বাংলায় বিকশিত সমৃদ্ধ মৃৎশিল্পের চরিত্রে একাধিক স্তর নিহিত ছিল, এককথায় যাদের বিশ্লেষণ কষ্টসাধ্য। তবে আঞ্চলিকতার নিরিখে বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের স্বতন্ত্রতার অনুসন্ধানের স্বপক্ষে বলা চলে উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই দেখা যায় বিষয়বস্তু হোক কিংবা শৈল্পিক উপস্থাপনা সূক্ষ বিশেষত্ব বা নিজস্বতা বয়ে নিয়ে চলেছে বাংলার বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রগুলি। কিন্তু তা স্বত্তেও সার্বিকরূপে আদি মধ্যযুগে বাংলায় মৃৎশিল্পের যে এক নির্দিষ্ট ঐতিহ্য নির্মিত হয়েছিল বা পৃষ্ঠপোষক এবং শিল্পীরা সার্বিকভাবে শিল্পক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট ধারা নির্মাণের প্রয়াস করেছিল সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

---

[292] রজত স্যান্যাল, মোঘলমারি, *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম-১, ঢাকা,বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২৮৮-৮৯

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মৃৎশিল্প, সমাজ ও ইতিহাসঃ একটি পর্যালোচনা

(আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতক)

যেকোনো শিল্পমাধ্যম সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, উক্ত সমাজের সার্বিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে শিল্পের চরিত্র বিন্যাশ। বর্তমানে আলোচ্য মৃৎশিল্পও নিঃসন্দেহে তার ব্যতিক্রম নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৃৎশিল্প এমন এক শিল্পমাধ্যম যার সাথে একাধিক প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত থাকতে পারে যার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক প্রেক্ষিত। কেননা মৃৎশিল্পই এমন এক শিল্প মাধ্যম ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যার দীর্ঘকালব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি লক্ষণীয় এবং তথাকথিত উচ্চ মার্গীয় শিল্পধারার পরিচিত ছকের শৈল্পিক জটিলতার বাইরে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আত্মপ্রকাশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম রূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ফলত সংশ্লিষ্ট সমাজ সংস্কৃতির খুঁটিনাটি অনুধাবনে বা সাধারণ মানুষের ইতিহাস অন্বেষণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে মৃৎশিল্পের অবদান কখনোই অস্বীকার্য নয়। আলোচনার সময়কাল হিসেবে মূলত আদি মধ্য যুগ তথা আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ কে বেছে নেওয়া হয়েছে বাংলায় মৃৎশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক প্রত্নউপাদানের বিপুল প্রাপ্তির কারণে, যা সার্বিক রূপে এই পর্বের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে কেবলমাত্র মৃৎফলকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর নিরিখে উক্ত দৃশ্যাবলী পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাংলার মৃৎশিল্পে উপস্থাপিত সামাজিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ের লক্ষ্য নয়। এজাতীয় বেশ কিছু গবেষণা ইতিপূর্বে সম্পাদিত হয়েছে। পাশাপাশি আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ বা তৎ মাধ্যমে প্রতিফলিত সামাজিক প্রতিচ্ছবির পশ্চাতে নিহিত সম্ভাব্য চিন্তন সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোচ্য গবেষণা পত্রের মূল লক্ষ্য আলোচিত 'মৃৎশিল্প'কে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা প্রক্রিয়া রূপে বিবেচনা করে তার সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ তথা যে সমাজের মধ্যে এই শিল্পের উপস্থিতি তার ইতিহাস অন্বেষণ। আর সেই সূত্রেই বলা চলে বর্তমান অধ্যায় মূলত আলোচ্য মৃৎশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সমাজ ইতিহাস অনুসন্ধানের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস। তবে এই

সমাজজীবন বা ইতিহাসকে অনুধাবন করতে হলে এক সার্বিক বৃহত্তর সমাজচিত্র কে অনুধাবন করা প্রয়োজন। আর সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র মৃৎশিল্পের বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, সমকালীন অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক উপাদানেরও অন্বেষণ করা প্রয়োজন। যার মধ্যে রয়েছে সমকালীন বিবিধ প্রাসঙ্গিক সাহিত্যাবলী, অভিলেখ সাক্ষ্য বা সমকালীন বাংলার অন্যান্য একাধিক ভাস্কর্য ইত্যাদি। তবে প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন এসকল বিবিধ উপাদানের পর্যালোচনার দ্বারা দেখা যায় সেগুলি কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প বা তার সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ কোনও তথ্য সেভাবে প্রদান করেনা। তা স্বত্তেও আলোচ্য পর্বে মৃৎশিল্পের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট অনুধাবনের লক্ষে আলোচনার প্রসঙ্গে এসকল সমকালীন অন্যান্য প্রাথমিক উপাদানের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

উপরিল্লিখিত আলোচনা সূত্রেই বলা চলে, বর্তমান অধ্যায়ে মূলত মৃৎশিল্প সম্পর্কিত তিনটি বৃহত্তর প্রেক্ষিত অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হবে। প্রথমত, এই শিল্প কিভাবে অনুমোদিত হচ্ছে তথা কাদের তৎপরতা, পৃষ্ঠপোষকতা বা অনুদানে নির্মিত হয়েছিল? অর্থাৎ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র এবং উক্ত পৃষ্ঠপোষকের সমাজ সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পাওয়া সম্ভব তৎসংক্রান্ত নানা আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে। দ্বিতীয়ত, সমকালীন এই শিল্পের অবলোকনকারী সমাজ তথা উক্ত পর্বের সাধারণ মানুষের সমাজ ইতিহাসের অন্বেষণ করা হবে। তৃতীয়ত, এই শিল্প নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত গোষ্ঠী বা শিল্পীসমাজ তথা তাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কে, অবস্থান সম্পর্কে কতখানি অনুমান করতে পারি উক্ত ইতিহাস অন্বেষণের প্রয়াস করা হবে। সুতরাং বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস বর্তমান লেখনী, আর সেই উদ্দেশ্যে উক্ত সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের আলোচনার প্রয়াস বর্তমান অধ্যায়। যার উল্লেখ বিভিন্ন শিল্প ঐতিহাসিক বা গবেষকদের আলোচনাতেও প্রায় ব্রাত্য। যদিও এসকল প্রসঙ্গ আলোচনা করলেও বা একাধিক প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও, তাঁদের যথাযথ উত্তর বা কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত এখানে তুলে ধরা মুশকিল। তা স্বত্ত্বেও বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে এজাতীয় আলোচনার যে প্রয়োজন, তা সন্দেহাতীত।

মৃৎশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজ ইতিহাসের অন্বেষণ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তার বৃহত্তর সমাজচিত্র বা প্রেক্ষাপটকে বোঝা। সেই উদ্দেশ্যে মৃৎশিল্পের সাথে সমকালীন কিছু সাহিত্য গ্রন্থকে পাশাপাশি রেখে উভয়ের মধ্য দিয়ে সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিত্র সম্পর্কে সার্বিক রূপে কতখানি ধারণা করা সম্ভব তা পর্যালোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় '*সুভাষিত*

রত্নকোষ', '*সদুক্তিকর্ণামৃত*, '*পবনদূত*', '*চর্যাপদ*', '*আর্যাসপ্তশতী* প্রভৃতি বঙ্গীয় পরিসরে রচিত সাহিত্য গ্রন্থের কথা, যেগুলি বাংলার সমকালীন বাংলার পরিবেশ, মানুষের অনুভূতি, প্রেম-বিরহ, বিশ্বাস, ধর্মীয় জীবন, সমাজ জীবন প্রভৃতি জীবনের বিবিধ দিকের ধারণা দেয়। তবে এসকল গ্রন্থের প্রসার বিস্তর ও গভীর, এবং পৃথকভাবে একেকটি গ্রন্থই আদি মধ্য যুগীয় বাংলার ইতিহাস বিশ্লেষণের অন্যতম আকর গ্রন্থ। কিন্তু আলোচ্য পরিসরে যেহেতু এগুলি মুখ্য উপাদান নয় এবং সীমিত পরিসরে সবকিছু একত্রে তুলে ধরাও সম্ভবপর নয় ফলে খানিক সংক্ষিপ্তরূপেই এগুলির পর্যালোচনা দ্বারা বাংলার মৃৎশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সমকালীন সমাজ জীবন সম্পর্কে ধারণা নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে। এসকল গ্রন্থের পর্যালোচনায় সমকালীন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের তথা আদি মধ্যযুগীয় বাংলার গ্রাম সমাজের একাধিক চিত্র প্রতিফলিত হয়, যার অন্যতম অংশ ছিল আবিষ্কৃত এই বিপুল মৃৎভাস্কর্য সমূহ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিপূর্বের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলার বিপুল মৃৎফলকেও সমকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবিধ প্রেক্ষিতের উপস্থাপন রয়েছে যার চরিত্র বা উপস্থাপনের উদ্দেশ্য জনিত বিবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করা গেলেও সমকালীন ধর্মীয় বিশ্বাস, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বা সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে যে ধারণা প্রদান করে সন্দেহ নেই এবং সেখান থেকেও সমকালীন বাংলার গ্রাম সমাজের এক সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। আদি মধ্যযুগের বিভিন্ন লেখমালাগুলিতেও সমকালীন পর্বে বিভিন্ন গ্রামের অস্তিত্ব, গ্রাম সমাজের প্রসার বা একাধিক গ্রামের নাম পাওয়া যায়। যদিও কেবল 'গ্রাম' নয়, বসতি বোঝাতে পল্লী বা পত্তন (বা পুর ও নগর) এর ন্যায় শব্দও প্রচলিত ছিল যাদের চরিত্র অপরিবর্তনীয় নয়। অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যেমন ঘটত, তেমনই সংলগ্ন উপজাতি বসতি এলাকা দখল বা অকৃষি অঞ্চল রূপান্তরকরণ করেও গ্রাম সমাজের সম্প্রসারণ ঘটত যা ছিল আদি মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক শক্তিগুলির উত্থান ও বিস্তারের।[293] ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগীয় ভারতে গ্রামসমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন সাধারণত 'কৃষিব্যবস্থা, 'কৃষিকাঠামো', 'ভূমির মালিকানা', 'কৃষি উৎপাদন', 'কৃষিসম্পর্ক' ইত্যাদির

[293] ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় , *আদি মধ্যযুগীয় ভারতে গ্রামীণ বসতি ও গ্রাম সমাজের কয়েকটি দিক* , (সায়ন্তনী পাল অনুদিত), কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২২ পৃষ্ঠা- ৩-৪

বিষয়ের আলোচনার ছায়ায় গ্রামগুলির সামাজিক গোষ্ঠী বা সমাজ সম্পর্কের আলোচনা ঢাকা পড়ে গেছে।[294] এছাড়া সমকালীন অভিলেখগুলিতেও দেখা যায় মূলত তা কৃষি বা কর্ষিত অঞ্চল অঞ্চলের সাথেই সম্পর্কিত,[295] সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত আভাষ থাকলেও গ্রামের বসতি বা মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন কিন্তু সেভাবে উপস্থিত নেই। আর এখানেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সাহিত্য গ্রন্থগুলি এবং অবশ্যই আলোচ্য মৃৎশিল্প। ফলত এই উভয় উপাদানকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে হয়তো সমকালীন সমাজ- সংস্কৃতির এক সার্বিক চিত্রের আভাষ পাওয়া সম্ভব।

এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য পালপর্বে বৌদ্ধ আচার্য বিদ্যাকরের *সুভাষিত রত্নকোষ*[296], যা বাংলার প্রথম সংকলিত কাব্য এবং আনুমানিক ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত শ্রীধরদাসের *সদুক্তিকর্ণামৃত* কাব্যগ্রন্থটির কথা, বাংলার সামাজিক জীবনযাত্রার অনুসন্ধানে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ। *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় শ্রীধরদাসের পিতা ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সামন্ত অধিপতি এবং তিনি নিজেকেও গ্রন্থের শেষে 'মহামাণ্ডলিক' হিসেবে পরিচয় দেন। সাধারণত মনে করা হয় ইতিপূর্বের সাহিত্য গ্রন্থগুলি অধিকাংশই শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মহলের চর্চার অন্তর্গত ছিল এবং সাধারণ মানুষ তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারতনা ফলে এগুলি সংকলিত হয় একাধিক কবির লেখনী নিয়ে যা সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রা কে বহুলাংশে উপস্থাপিত করে।[297] আবার এই পরিসরে অন্যতম গ্রন্থ সেন রাজা লক্ষণ সেনের সভাপতি গোবর্ধন আচার্যের *আর্যাসপ্তশতী*। এখানেও সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড চিত্র নিয়ে শ্লোকগুলি রচিত।[298] এছাড়াও লক্ষণ সেনের পৃষ্ঠপোষকতাতেই রচিত ধোয়ীর *পবনদূত* [299]কিংবা বৌদ্ধ *চর্যাপদ* এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম।

---

[294] তদেব, পৃষ্ঠা- ২

[295] তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬

[296] ড্যানিয়েল এইচ এইচ ইঙ্গলস্, *অ্যান অ্যান্থলজি অফ সংস্কৃত কোর্ট পোয়েট্রি*, হার্ভার্ট ইউনিভার্সিটি প্রেস, (১৯৬৫)

[297] সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, *সদুক্তিকর্ণামৃত অফ শ্রীধরদাস*, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৬৫

[298] জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , কলকাতা, স্যান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, ১৩৭৮

[299] ধোয়ী, *পবন্ দূত*, (অনুবাদ- শ্যামাপদ ভট্টাচার্য), সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার, খণ্ড- ১৭ , কলিকাতা, নবপত্র প্রকাশন

চর্যাপদের বিভিন্ন শ্লোকে সমাজের অত্যন্ত সাধারণ এবং তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর প্রান্তীয় মানুষদের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়।[300]

ইতিপূর্বের অধ্যায় সমূহের আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যায় আলোচ্য পর্বে বাংলা স্বকীয় আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে একাধিক উপাঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে আঞ্চলিকতার উত্থানকে ধরা হয়ে থাকে এবং গুপ্ত শাসনের পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতিতে একাধিক আঞ্চলিক রাজবংশের উত্থান ঘটে বাংলাও যার ব্যতিক্রম নয়। পাশাপাশি অঞ্চল নির্বিশেষে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তরায়ন দেখা যায়, শাসন প্রক্রিয়ায় নানা বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্থা এবং পদাধিকারী ব্যক্তির উপস্থিতি তৈরি হয়। অর্থাৎ এক জটিল, স্তরীভূত আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির নির্মাণ হয় যা শিল্প সংস্কৃতিকেও আবশ্যিক রূপে প্রভাবিত করে। আলোচ্য পর্বে বাংলার প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাজা এবং তাঁর অধীনে সামন্তরাজা, রাজন্যক, সামন্ত-মহাসামন্ত, মান্ডলিক ও মহামান্ডলিকদের স্থান। বিষয়পতি, অমাত্য সান্ধিবিগ্রহিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, দণ্ডনায়ক, রাজপণ্ডিত, কুমারামাত্য, মহাসেনাপতি ছিলেন তারপরের স্তরে।[301] *আর্যাসপ্তশতী* গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোকে মন্ত্রী, দৌঃসাধিক, কোষাভোগ, কটক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে যা থেকে বিভিন্ন রাজকার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত বিভিন্ন লোকের ধারণা মেলে।[302] এছাড়া আদি মধ্যযুগীয় জাতি বর্ণ কাঠামোয় ব্রাহ্মণ ছাড়াও একাধিক পেশাজীবী গোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যথা-কায়স্থ, বৈদ্য, স্থপতি, সূত্রধর, কুম্ভকার, কর্মকার, চিত্রকর, তৈলকার, রজক, আভীর, নট, বাদক প্রমুখ।[303] এছাড়া ছিল অন্ত্যজ ও আদিবাসী কৌমের মানুষ। সমাজ থেজে দূরে গ্রামান্তে বাস করত 'শ্বপচ' বা চণ্ডাল এবং ব্যাধ। এরা ছাড়া সমাজের বাইরে দূরে অরন্যে বাস করত 'বনেচর' পুলিন্দ ও শবর। সমাজে বর্ণমর্যাদা ছিল ব্রাহ্মণ্যবিধান অনুযায়ী এবং চণ্ডাল ও ব্যাধ ছিল অস্পৃশ্য। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন সম্ভবত আর্যা-পর্বে শবর ছিল বনের উপজাতি কিন্তু চণ্ডাল বরাবরই

---

[300] সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী,* বর্ধমান, সাহিত্য সভা, ১৯৫৬

[301] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, কলিকাতা, দেজ' পাবলিশিং, ১৪০২, পৃষ্ঠা- ৩১৬

[302] চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , পৃষ্ঠা- ৫৪

[303] রিওসুকে ফুরুই, 'সোশ্যাল লাইফঃ ইস্যুস অফ বর্ণ জাতি সিস্টেম', আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* খণ্ড ২, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৫৫-৬০

হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত অস্পৃশ্য এবং গ্রামের উপান্তবাসী।[304] আদি মধ্যযুগীয় একাধিক সাহিত্য ও লেখমালাতে শবর, পুলিন্দ, নিষাদ, আভীর প্রভৃতি একাধিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে অরণ্যবাসী বা প্রান্তীয় মানুষদের আলোচনা প্রসঙ্গে, সাধারণ কৃষকদের থেকে যাদের গ্রাম ছিল আলাদা।[305] তাঁরা গ্রামের যে অংশে বাস করত তা 'কুগ্রাম' রূপে বিবেচিত করা হত।[306] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় এই শিকারী কিংবা অরন্যবাসী শবর প্রমুখের প্রতিফলন রয়েছে বাংলার মৃৎশিল্পেও, অধুনা বাংলাদেশের সোমপুর মহাবিহার, ময়নামতী, মহাস্থানের ভাসু বিহার এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য নাম। যদিও বৌদ্ধ বিহারের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় স্থাপত্যের অলংকরণের অঙ্গরূপে এসকল মানুষদের উপস্থিতি জনিত সম্ভাব্য প্রেক্ষিত ও প্রশ্নগুলি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, তবুও বলা চলে আলোচ্য পরিসরে মৃৎশিল্পে তাদের উপস্থিতি কেবলই শিল্পীর পর্যবেক্ষনের প্রতিফলন নাকি আদি মধ্য যুগীয় রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার অংশ রূপে প্রান্তীয় মানুষদের মূল সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রক্রিয়ার অন্যতম ইঙ্গিত তা নিঃসন্দেহে ভেবে দেখা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যদিও মনে করা হয়ে থাকে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎফলকগুলি শিল্পীদের পর্যবেক্ষন দক্ষতা ও সাবলীল চিন্তনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন কিন্তু উক্ত মৃৎশিল্পী বা নির্মাণকারী গোষ্ঠীদের শিল্পের বিষয় নির্বাচন জনিত স্বাধীনতা আদতেই কতখানি ছিল সেদিকটিও নিশ্চিত রূপে বলা সমস্যাজনক।

এই আলোচনা সূত্রেই বলা যায় রিওসুকে ফুরুই উল্লেখ করেছেন, চর্যাপদের একাধিক শ্লোক আদিমধ্যযুগীয় পর্বে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি দিকের আভাস দেয় যথা, গ্রামীণ সমাজে প্রান্তীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি (Incorporation of Non-sedentary groups)। কিছু শ্লোকে, ডোম্ব মহিলাকে (ডোম্বী) গ্রামীণ সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী নিম্ন শ্রেণীর নারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা অন্যান্য বাসিন্দাদের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত, তাঁত এবং বাঁশের ঝুড়ির মতো পণ্য সরবরাহ করে এবং ফেরিওয়ালা হিসেবে কাজ করত। উল্লেখযোগ্যভাবে, কিছু শ্লোকে মাতঙ্গী এবং চণ্ডালী উভয়ই ডোম্বীর সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বর্ণনাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, ডোম্বী নামে চিহ্নিত প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলি কোনওভাবে গ্রামীণ সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যখন তাদের এসকল

[304] চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , পৃষ্ঠা- ৫৭

[305] চট্টোপাধ্যায়, *আদি মধ্যযুগীয় ভারতে গ্রামীণ বসতি ও গ্রাম সমাজের কয়েকটি দিক,* পৃষ্ঠা- ৩

[306] চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , পৃষ্ঠা- ৬১

নামগুলি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। অন্তর্ভুক্তির পরে, তারা সমাজের সর্বনিম্ন স্তর গঠন করতে পারে যা 'চণ্ডালে'র মতো পুরানো শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল কিংবা হয়তো 'পামার' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ কৃষি শ্রমিক হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পামাররা কৃষিক্ষেত্র এবং মাড়াইয়ের জমিতে যৌথ শ্রমের প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয়। সমকালীন বিভিন্ন উপাদানে তাদের অন্যান্য চাষীদের থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং 'হালিক'দের (লাঙলধারী) অধীনস্থ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যারা কৃষক গৃহকর্তা হিসেবে চিত্রিত হয়। এই পামারদের উপস্থিতি এবং অধীনস্থ অবস্থান চাষীদের মধ্যে এক স্তরীভূত সম্পর্কের আভাষ দেখায়,[307] যা ছিল আলোচ্য পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং সমাজের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে তা লক্ষণীয় ছিল।

সদুক্তিকর্ণামৃত এবং *আর্যাসপ্তশতীর* বিভিন্ন শ্লোকে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা বা দারিদ্র্যের উল্লেখ রয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রাম বা পল্লীর শাসনকর্তাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন যাপন মুশকিল হয়ে উঠত যার আভাষ দেয় আর্যাসপ্তশতী। পীড়নে-শোষণে ক্লিষ্ট গ্রামবাসী সেই গ্রাম ত্যাগ করতে কখনো কখনো বাধ্য হত। নিম্নলিখিত শ্লোকে যার আভাষ মেলে-

প্রতিদিনের শোষণে ক্ষীণ, অতি মাত্রায় করাকর্ষণে ক্লিষ্ট, জনবিরল কুগ্রামের মত-করকৃষ্ট জীর্ণ বিরলতত্ত্ব তোমার এই বসনাঞ্চল ইহাই প্রমাণ করে যে, তোমার নিজনায়ক অতি কৃপণ বা নিষ্ঠুর।[308]

আবার মানুষের দারিদ্র্যের করুন দৃশ্য প্রতিফলিত হয় সদুক্তিকর্ণামৃতের একাধিক শ্লোকে, যার মধ্যে একটিতে দেখা যায় স্বামী তার স্ত্রীর নিকট একাধারে একরাশ যন্ত্রনা এবং আশা নিয়ে বলছে - *আমার স্ত্রী, যেভাবেই হোক গ্রীষ্মকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখবে। তখন বৃষ্টি আসবে, ফলে প্রচুর লাউ এবং কুমড়ো জন্মাবে এবং আমরা রাজার মতো জীবনযাপন করব।*[309]

অনুরূপ ভাবে ভিক্ষাবৃত্তিরও উল্লেখ মেলে সমকালীন পর্বে বাংলায়, *আর্যাসপ্তশতীর* একটি শ্লোকে (৪৯৩) গৃহবধূ কর্তৃক ভিক্ষা প্রদানের উল্লেখ মেলে। শীর্ণ দেহে তাঁরা গ্রামে ভিক্ষা করে

---

[307] ফুরুই, 'সোশ্যাল লাইফঃ ইস্যুস অফ বর্ণ জাতি সিস্টেম', পৃষ্ঠা- ৪৪

[308] চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , পৃষ্ঠা- ৫৪

[309] ইঙ্গলস্, *অ্যান অ্যান্থলজি অফ সংস্কৃত কোর্ট পোয়েট্রি, (সেকশন -৩৯, শ্লোক ১৩০৬),* পৃষ্ঠা- ৩৫৯

দিনযাপন করতেন, বস্ত্র রূপে কেবল জঘনাংশুক ধারণ করতেন।[310] বলা বাহুল্য, আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় মৃৎশিল্পেও কিন্তু ভিক্ষুকের সুস্পষ্ট উপস্থিতি বিদ্যমান। পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত একটি ফলকে প্রায় অনুরূপ শীর্ণকায় কঙ্কালসার ন্যুব্জ দেহ, লম্বা দাঁড়ি সম্বলিত মানুষের উপস্থাপনা মেলে, যা দৈহিক ভঙ্গিমা এবং বিষয়বস্তুগত উভয় দিক থেকেই অতিশয় বাস্তবিক উপস্থাপনার প্রতিফলন। তবে ইনি খুব সম্ভবত শবর বা অরন্যবাসী কোনও বৃদ্ধ, যিনি তাঁর শিকার বা অন্নসংস্থান করে ফিরছেন। যার উপস্থাপন টেরাকোটা শিল্পীদের শিল্প দক্ষতা এবং পর্যবেক্ষন ক্ষমতাকে প্রস্ফুটিত করে সন্দেহ নেই। (চিত্র-১)

চিত্র-১ বৃদ্ধ উপস্থাপনা, পাহাড়পুর, সৌজন্যে- সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ*, খণ্ড ২, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩৬৬

310 চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , পৃষ্ঠা- ৬২

আবার মানুষের সমাজজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ধর্মীয় জীবন বা ধর্মাচরণ। আলোচ্য পর্বে বাংলায় ধর্ম-কর্ম- ভাবনা ও সংস্কারের বিচিত্র রূপ পরিলক্ষিত হয় যার প্রমাণ দেয় একাধিক প্রত্নবস্তু যথা বিবিধ মৃৎফলক, প্রস্তর ও ধাতব ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ দেবদেবী মূর্তি এবং বিবিধ ধর্মীয় স্থাপত্য কাঠামো। আলোচ্য পর্বে বাংলায় এক্ষেত্রে এক সংমিশ্রিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। এখানে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উপস্থিতি যেমন রয়েছে তেমনই বাংলার নিজস্ব লৌকিক ভাবধারাও সুস্পষ্ট। *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে বাংলায় ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাসের চিত্র ধরা পড়ে তৎকালীন কবিদের একাধিক শ্লোকে। যেমন একটি শ্লোকে লৌকিক পূজা অর্চনার বর্ণনা পাওয়া যায়:

অসংখ্য পশু বলি দিয়া গ্রাম্য লোকেরা পাথরের পূজা করে, রক্ত দিয়া কান্তার দুর্গার পূজা করে, বৃক্ষতলে ক্ষেতপালের পূজা করে এবং অন্তে তাহাদের যুবতী সহচরীদের লইয়া তুম্বীবীণা বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে বেলের খোলায় মদ্যপান করিয়া আনন্দ উপভোগ করে।[311] অর্থাৎ গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত পূজার্চনার আভাষ পাওয়া যায় আলোচ্য শ্লোকের মধ্য দিয়ে। কোনও কোনও বৃক্ষ বিশেষ দেবতা বা দানবের অধিষ্ঠানরূপে বিবেচিত হত যার মধ্যে অনার্য বা লৌকিক প্রভাব গুরুতর। এজাতীয় পূজা আচারাদি ব্রাহ্মণ্য অনুমোদন পেলেও তা ছিল মূলত প্রান্তীয় মানুষদের উৎসব। *আর্যাসপ্তশতীর* নিম্নলিখিত অংশে দেখা যায়, চণ্ডাল-গ্রামে যে বৃক্ষকে কুবের বা লক্ষ্মীর থান মনে করা হত, কিন্তু গ্রাম্য লোকের তার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না।

হে কুগ্রামের বটবৃক্ষ, তোমাতে কুবের যক্ষই বাস করুন, আর লক্ষ্মীই বাস করুন, মহিষ-মুণ্ডের জন্যই পামরজনের কুঠারাঘাত হইতে তোমার রক্ষা (২৬২)।[312]

অর্থাৎ লোকায়ত ধর্মসংস্কার সহজে উচ্চস্তরের স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নি। তবে বাংলার ধর্মসংস্কৃতিতে যে এক সংমিশ্রিত ধারা পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য পর্বে, লোকায়ত সংস্কৃতির পাশাপাশি দেখা যায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অসংখ্য দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠানের উপস্থিতি ছিল সমগ্র আদি মধ্যযুগীয় বাংলার ভিন্ন ভিন্ন পরিসর ও পর্যায়ে। অধুনা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও বিহারের

---

[311] রায়, *বাঙালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, পৃষ্ঠা- ৪৮২

ব্যানার্জী, *সদুক্তিকর্ণামৃত অফ শ্রীধরদাস,* পৃষ্ঠা- ৫৪৪, ৫.১.২

[312] চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , পৃষ্ঠা- ৬৬-৬৭

বিভিন্ন মিউজিয়ামগুলিতে সংরক্ষিত অসংখ্য প্রস্তর, ধাতব এবং মৃৎভাস্কর্যে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অসংখ্য দেবদেবী মূর্তি সমকালীন সমাজে তাঁদের প্রাসঙ্গিকতার ইঙ্গিত দেয়। সমকালীন সাহিত্য গ্রন্থ, লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার অন্যতম পণ্ডিত ধোয়ী রচিত *পবনদূত* কাব্যে ভগবান বিষ্ণুর সাথে তাঁকে অভিন্ন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে-

হে দেব, আপনি পাশে, পিছনে এবং সামনে নিজরূপে প্রকাশ কাছেন। আপনি যে জগতের প্রভু শ্রীহরি তা স্পষ্ট। আপনি বিষ্ণু থেকে ভিন্ন নন শরীরে যানা রূপে ধারণ করতে পারেন। আপনার প্রতি অশ্বিনম্র আমার চিত্ত। তবে কেন আমায় গ্রহণ করছেন না আপনি?[313]

লক্ষ্মণ সেন ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে একাধারে সমাজে বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা এবং কবির পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণ সেনকে তুষ্টি তথা তাকে যথাসম্ভব সর্বেসর্বা রূপে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষণীয়। আবার অন্য এক শ্লোকে মহাদেব- পার্বতীর উল্লেখ আছে এবং সেখানেই রাজা লক্ষ্মণ সেনকে কামদেব এর সমতুল্য রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[314] আবার *সুভাষিত রত্নকোষ* এবং *সদুক্তিকর্ণামৃতের* একাধিক শ্লোকে শিবের একাধিক রূপের বর্ণনা, তাঁর মাহাত্ম, পরিবার (শ্লোক নং- ৩০-১০৩) বিষ্ণু, (শ্লোক - ১০৪ ১৪৭) সূর্যের (১৪৮-১৫১) উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়।[315] পাশাপাশি *আর্যাসপ্তশতী*ও এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ্য গ্রন্থ, যার মধ্যে দেবায়ত প্রেম এর উপস্থাপন রয়েছে তথা হর পার্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, গোপী-প্রেম, রাধাভাব প্রভৃতি লক্ষণীয়।[316] ফলত বলা চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যথাযথ উপস্থাপনা রয়েছে সমকালীন বাংলার সাহিত্যিক উপাদানে।

এছাড়া আলোচ্য পরিসরে অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি কেননা আমরা জানি মুখ্যত বৌদ্ধবিহারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপেই মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটেছে আলোচ্য পর্বে যা সমকালীন সমাজে এর গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরে। এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ্য বৌদ্ধ আচার্য বিদ্যাকরের *সুভাষিত রত্নকোষ,* কবি স্বয়ং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রশস্তি অংশে বুদ্ধের স্তুতি

---

[313] ধোয়ী, *পবন্ দূত, (অনুবাদ- শ্যামাপদ ভট্টাচার্য),* শ্লোক নং- ৯৭

[314] তদেব, শ্লোক নং- ৯৯

[315] ইঙ্গলস্, *অ্যান অ্যান্থলজি অফ সংস্কৃত কোর্ট পোয়েট্রি,* পৃষ্ঠা- ৬৮-১০৯

[316] চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , পৃষ্ঠা- ৪৬-৫৩

করেছেন এবং একাধিক লেখকের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কিত শ্লোকের উপস্থাপনা করেছেন।[317] পাশাপাশি উল্লেখ করা চলে এই গ্রন্থটি পালরাজা রামপালের শাসনকালে অধুনা বাংলাদেশের জগদ্দল মহাবিহারেই সংকলিত হয়েছিল।[318] ফলত গ্রন্থটি একাধারে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং পালপর্বে বাংলার সার্বিক ইতিহাস প্রদানে যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান বলাবাহুল্য। এছাড়া বুদ্ধ,(শ্লোক-১-১৫) বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর, (শ্লোক-১৭-২৪) বোধিসত্ত্ব মঞ্জুঘোষ (শ্লোক-২৫-২৮) সম্পর্কিত শ্লোকের অবতারণা রয়েছে সুভাষিত রত্নকোষ বা সদুক্তিকর্ণামৃতের একাধিক শ্লোকে।[319] যা সেন পূর্ববর্তী বাংলা তো বটেই, তবে সেন পর্বেও বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি ও প্রাসঙ্গিকতার ইঙ্গিত দেয়।

আর উপরিল্লিখিত আলোচনার পাশাপাশি বাংলার মৃৎফলকে উপস্থাপিত বিষয়াদি লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে তা প্রায় অনুরূপ ধারণা প্রদান করে যথা, তাঁর মধ্য থেকে বৌদ্ধ ,ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় উপাদান বা দেবদেবী অবয়বের পাশাপাশি বেশ কিছু সংখ্যক নাগ উপস্থাপনা, কিছু অর্ধ ঐশ্বরিক উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে এমন কিছু অবয়ব মেলে যাদের ধর্মীয় পরিচিতি সুস্পষ্ট না হলেও তাঁদের বাহ্যিক উপস্থাপনায় এক ঐশ্বরিক ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। তেমনই বাংলার অজস্র প্রস্তর বা ধাতব ভাস্কর্যগুলি পর্যবেক্ষন করলেও দেখা যায় প্রায় অনুরূপ অসংখ্য মহাযান বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় অবয়বের উপস্থিতি। ফলত আলোচ্য পরিসরে সমাজে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে এক মিশ্র আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল তার আভাষ দেয় একাধারে সমকালীন সাহিত্য এবং বিপুল ভাস্কর্যসমূহ।

এই ধর্মাচরণের পাশাপাশি বাংলার প্রাকৃতিক রূপ সৌন্দর্য, ঋতুবৈশিষ্ট্য, গ্রামীণ জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, প্রেম, দুঃখ সবকিছুর বিস্তৃত প্রতিফলন রয়েছে সমকালীন এসকল সাহিত্যিক উপাদানে। *সদুক্তিকর্ণামৃত, আর্যাসপ্তশতীর* বিভিন্ন শ্লোক থেকে সমকালীন সমাজে কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই পর্বে বাংলা মুখ্যত গ্রামীণ সমাজের উপর ভিত্তি করে ছিল। কৃষি ছিল তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি। ভূমি ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন। এটি শুরু থেকেই আদি মধ্যযুগীয়

---

[317] ইঙ্গলস্, *অ্যান অ্যান্থলজি অফ সংস্কৃত কোর্ট পোয়েট্রি,* পৃষ্ঠা- ৫৭

[318] সুচন্দ্রা ঘোষ ও সায়ন্তনী পাল, 'এভরি ডে লাইফ ইন আর্লি বেঙ্গল', আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* খণ্ড ২, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা- ৮

[319] ইঙ্গলস্, *অ্যান অ্যান্থলজি অফ সংস্কৃত কোর্ট পোয়েট্রি,* পৃষ্ঠা- ৫৭-৬৭

বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে অতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ভূমি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পর্ক পরিবর্তিত এবং প্রসার লাভ করে। যদিও একাধিক উপাঞ্চলে বিভক্ত সমগ্র বাংলায় এই কৃষিসম্পর্ক ও ভূমি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যে অনুরূপ ছিলনা এবং তা পরিবর্তনশীল তাতে সন্দেহ নেই এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা সম্পর্কগুলিও আনুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়। তবু বলা চলে এসব গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোকে নানা শ্লোক থেকে সহজেই একাধারে খাদ্যাভ্যাস এবং কৃষি নির্ভর এক সুখী গ্রামীণ সমাজের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, কৃষকদের হালিক। আবহমান বাংলার খাদ্যশস্য হিসাবে ধান, ইক্ষু ইত্যাদির উল্লেখ আছে। ধানের একাধিক প্রকারভেদের উল্লেখ মেলে এসকল তথ্যে, যেমন *সদুক্তিকর্ণামৃতে* '*শালি*' ধানের উল্লেখ রয়েছে[320], এছাড়াও কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত নারী ও পুরুষদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন প্রেক্ষিতের উপস্থাপন রয়েছে এসব তথ্যে। পাশাপাশি কৃষি নির্ভর অর্থনীতির আভাষ দেয় এসকল উপাদানের পাশাপাশি স্থিত অসংখ্য তাম্রশাসনাদি। ফলত এক কৃষিনির্ভর সমাজজীবনের আভাষ দেয় এসকল উপাদান।

এছাড়াও সমাজের সাধারণ মানুষের বিনোদনের কিছু প্রতিফলন মেলে *আর্যাসপ্তশতীর* বিভিন্ন শ্লোকে। যেখানে দেখা যায় উক্ত পর্বে বাংলার গীতবাদ্য, নৃত্যগীত, বিভিন্ন ক্রীড়াকৌতুকে ব্যস্ত থাকত। এর মধ্যে একাধারে উচ্চাঙ্গের সংগীত ও অন্যদিকে গ্রামীণ গীতিও প্রচলিত ছিল। ঢোল, ঢাক, বাঁশি, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। অন্যদিকে ক্রীড়ার মধ্যে দাবা, পাশা, মল্লবিদ্যা প্রভৃতির উল্লেখ মেলে *আর্যাসপ্তশতীর* একাধিক শ্লোকে।[321] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় অনুরূপ দৃশ্যের অর্থাৎ নৃত্যরত, বাদ্যরত, ক্রীড়ারত একাধিক উপস্থাপন পাওয়া যায় বাংলার বিস্তীর্ণ পোড়ামাটির ফলকে। যা ইতিপূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে তৃতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরায় এখানে আর পুনরাবৃত্তি করা হলনা।

এছাড়া সমকালীন বাংলার প্রাকৃতিক চিত্রের বিস্তৃত উপস্থাপন পাওয়া যায় উপরিল্লিখিত প্রায় সমস্ত উপাদানেই। ধোয়ীর *পবনদূতে* পবনের যাত্রাপথের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিবিধ নগর, জনপদের বর্ণনা

---

[320] ব্যানার্জী, *সদুক্তিকর্ণামৃত অফ শ্রীধরদাস,* পৃষ্ঠা- ৩৬৩, (২.১৭৬.৩)
কৃষ্ণেন্দু রায়, আস্পেক্টস অফ রুরাল সোশ্যাল লাইফ ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ গ্লিমসেস ফ্রম দ্য সদুক্তিকর্ণামৃত অফ শ্রীধরদাস (আর্লি থার্টিন্থ সেঞ্চুরি), জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খন্ড ১৮,ঢাকা, আই সি এস বি এ, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৯৫

[321] চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , পৃষ্ঠা- ৯৪-১০১

মেলে তথা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী স্বরূপ বিজয়নগরের (বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী তে দেওপাড়া গ্রামের নিকটবর্তীতে এই নামে একটি গ্রাম আছে[322]) বিপুল সমৃদ্ধির আভাষ রয়েছে।[323] আবার *সুভাষিত রত্নকোষ* বা *সদুক্তিকর্ণামৃতের* ন্যায় গ্রন্থের বিবিধ শ্লোকে প্রকৃতির নানান উল্লেখ রয়েছে। যেকোনো সংস্কৃত কাব্যে ঋতুবৈচিত্র্য বিশেষ স্থান জুড়ে থাকে এগুলিও তাঁর ব্যতিক্রম নয়, *সুভাষিত রত্নকোষ* বা *সদুক্তিকর্ণামৃতের* গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত, শীত, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুতে প্রকৃতি পরিবেশের রূপের যে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে তা অনন্য সুন্দর।[324] বাংলা যে বিবিধ ফুল,ফল,শস্য পরিপূর্ণ ছিল তাঁরও আভাষ মেলে বিবিধ পোড়ামাটি ফলকের মধ্য দিয়ে যেখানে অজস্র ফলকে দেখা যায় বাংলার নানান পশু, পাখি, গাছপালার প্রতিচ্ছবি রয়েছে। পাশাপাশি এসকল বিবিধ সাহিত্যিক উপাদানের বিবিধ ছত্রেও তাঁর প্রমাণ মেলে।

উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বলা চলে সমকালীন পর্বে বাংলার সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার এক প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয় সমকালীন বাংলার নানান ঐতিহাসিক উপাদানে যার সাথে বাংলার মৃৎশিল্পে উপস্থাপিত বিষয়ের সামঞ্জস্য আছে। তবে উল্লিখিত বিষয়গুলি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের কেবল আভাষ মাত্র, এর একাধিক স্তর ও বৈচিত্র্য নিহিত রয়েছে, অধিক সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত অধ্যয়ন দ্বারা তাঁর নিখুঁত পর্যালোচনা সম্ভব। যদিও অধিকাংশ গ্রন্থগুলি আলোচ্য কালপর্যায়ের একদম শেষের দিকের সংকলন এবং তৎকালীন টেরাকোটা শিল্পীরা আদতেই উক্ত কবিতা বা শ্লোকগুলির সাথে কতখানি পরিচিত ছিলেন তা সংশয়াত্মক। কেননা উক্ত গ্রন্থ লেখনী বা গ্রন্থগুলির রচয়িতা এবং মৃৎভাস্কর্য নির্মানকারী গোষ্ঠী নিঃসন্দেহে সমাজের ভিন্ন স্তরের মানুষ ছিলেন এবং উভয় গোষ্ঠীর বৌদ্ধিক বা মনস্তাত্বিক পরিসরও ছিল ভিন্ন। তবে এটাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন পবনদূত ছাড়া আলোচ্য প্রায় সকল গ্রন্থই সাধারণ সমাজ জীবনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম দিকগুলিকে স্পর্শ করে যেখানে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা, অন্যদিকে আলোচ্য মৃৎশিল্পও ঠিক তাই। আর এক্ষেত্রে উভয় শিল্পধারার চরিত্র বিন্যাশে পৃষ্ঠপোষক এবং দর্শক বা পাঠক সমাজের ভূমিকাও যে প্রাধান্য পেতে পারে বলা বাহুল্য। আর সাহিত্য ও শিল্পে প্রায় অনুরূপ ধর্মীয় বা সামাজিক জীবনের উপস্থাপন নিঃসন্দেহে বাংলার মৃৎশিল্পে উপস্থাপিত বিষয়াদির বাস্তবিকতার ক্ষেত্রটিকে অধিক গ্রহণীয়

---

[322] নীহাররঞ্জন রায়, (১৪০২), পৃষ্ঠা- ৩০৩

[323] ধোয়ী, *পবন্ দূত, (অনুবাদ- শ্যামাপদ ভট্টাচার্য),* পৃষ্ঠা- ২০

[324] ড্যানিয়েল এইচ এইচ ইঙ্গলস্, (১৯৬৫), পৃষ্ঠা- ১১০-১৪৮

করে তোলে। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র এটি নয়, বরং এই সার্বিক সমাজচিত্রে মৃৎশিল্পের অবস্থান কিরূপ, তথা এই আলোচ্য প্রেক্ষাপটে মৃৎশিল্পের নির্মাণ ও তার সামাজিক ইতিহাস কতখানি বিশ্লেষণ সম্ভব সেটাই বর্তমানে মূল প্রতিপাদ্য।

১. মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস নির্মাণ ও সীমাবদ্ধতা:

আলোচ্য পর্বের মৃৎশিল্প সম্পর্কে যেকোনো আলোচনা করতে গেলেই যে বিষয়টি অতি সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হয় তা হল এর উপস্থাপনের চরিত্র। কেননা এই পর্বে মৃৎশিল্পকে স্বতন্ত্র একক শিল্প রূপে নির্ধারণ করা যায়না, তা বৃহৎ রূপে উপস্থাপিত ছিল বাংলার তৎকালীন বিবিধ প্রত্ন কাঠামোর দেওয়ালগাত্রে তথা বৌদ্ধ বিহার বা ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় স্থাপত্যের সঙ্গে এই শিল্প সম্পৃক্ত ছিল যা এর সার্বিক ইতিহাসকে অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রভাবিত করে। ফলে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চায় আবশ্যিকভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা স্থাপত্য কাঠামো সংক্রান্ত একাধিক পরিসর সংযুক্ত থাকে। আদি মধ্যযুগীয় বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের আলোচনার মূল অংশ জুড়ে রয়েছে একাধিক বৌদ্ধ বিহারের উপস্থিতি, ব্রাহ্মণ্য মন্দির গাত্রে মৃৎ ফলকের প্রাপ্তি যদিও একদমই সীমিত তবে অনুপস্থিত নয়। উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে দেখা যায় আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বিস্তীর্ণ মৃৎ ফলক এবং সমকালীন সাহিত্যাবলী সমরূপ সমাজচিত্রের প্রতিফলন ঘটায় এবং সমাজের অত্যন্ত সাধারণ মানুষেরও দিনযাপনের অতি সাধারণ মুহূর্তগুলিকেও সেখানে অসাধারণত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলত অধ্যায়ের শুরুতেই যে প্রশ্নগুলি তুলে ধরা হয়েছে অর্থাৎ কাদের উদ্যোগে, কাদের জন্য এবং কাদের দ্বারা এই শিল্পের রূপনির্মাণ হয়েছিল? তাঁদের ভূমিকা এবং তাঁদের সমাজ সম্পর্কে কি অনুধাবন করা যায় সেগুলির আলোচনা যে যথেষ্টই প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তা বলা চলে।

কিন্তু বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের এজাতীয় আলোচনায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। যথা-

প্রথমত, বঙ্গীয় মৃৎশিল্প নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও সেগুলি একান্তই শিল্প ইতিহাসের আঙ্গিক থেকে করা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলত শিল্পের বাহ্যিক শৈলী, আকার, বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বর্ণনামূলক আলোচনাতেই তা সীমিত। আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের আর্থসামাজিক প্রেরণা বা সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস প্রায় নেই বললেই চলে।

দ্বিতীয়ত, সমকালীন পর্বে বাংলায় ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা দানের নজির রূপে অসংখ্য প্রস্তর ভাস্কর্যের উপস্থিতি পাওয়া যায় যাদের গাত্রে ক্ষেত্র নির্বিশেষে অনুদানকারীর পরিচয়, সমকালীন শাসকের পরিচয়, দানের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয় খোদিত রূপে পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে উক্ত প্রস্তর ভাস্কর্যের সাথে সম্পর্কিত পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয়। কিন্তু পোড়ামাটি শিল্পের ক্ষেত্রে এজাতীয় কোনোরূপ উল্লেখ বা অনুশাসন কোথাও নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম রূপে বগুড়া জেলার পলাশবাড়ী কেন্দ্রের কথা বলা চলে, কেবলমাত্র এই কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত মৃৎফলকে লিপি উৎকীর্ণ আছে। যদিও তা কেবলই তার উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর পরিচিতি প্রদান করে মাত্র। ফলে তার নির্মাণকারী বা পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কিত কোনোরূপ ধারনাই কিন্তু প্রত্যক্ষ রূপে পাওয়া সম্ভব হয়না। একইভাবে তার দর্শক বা অবলোকনকারী সমাজও কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে সমকালীন তথ্য উপাদানে সম্পূর্ণই অনুপস্থিত।

তৃতীয়ত, আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় পৃষ্ঠপোষকতার প্রধান নজির হিসেবে উপস্থিত রয়েছে একাধিক ভূমিদান পট্ট, তাম্রশাসন, প্রস্তর লিপি, পোড়ামাটির সিল ইত্যাদি। বিবিধ তাম্রশাসনগুলি পর্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করা যায় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই বাংলায় বৌদ্ধবিহারগুলি বিপুল পরিমাণ জমির অধিকার ভোগ করত যা বিবিধ পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রে প্রাপ্ত, এবং সমগ্র আদি মধ্যযুগ জুড়েই বাংলায় এই চিত্র অব্যাহত ছিল। যদিও সমগ্র সময় জুড়ে কিংবা বাংলার সমস্ত অংশে এই পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র কিংবা এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত সার্বিক আর্থসামাজিক বা রাজনৈতিক পরিসর একরৈখিক বা অভিন্ন ছিল তা নয়, বাংলার তাম্রশাসনের সার্বিক পর্যালোচনায় সেই সূক্ষ্ম দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[325] তবে দানের ধারা অব্যাহত ছিল এবং এর পশ্চাতে নিহিত উদ্দেশ্য রূপে বলা যায় দানের মাধ্যমে অগাধ পুণ্য অর্জনের ধারণা জড়িত ছিল এর সাথে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় পরিসরে দানের মাধ্যমে সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও যে সংযুক্ত ছিল বলা বাহুল্য। তবে কেবল বৌদ্ধবিহার নয়, বিবিধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও বিপুল দানের প্রমাণ স্বরূপ একাধিক তাম্রশাসনের উল্লেখ মেলে। কিন্তু কোনও উপাদানে সমকালীন মৃৎশিল্পের আর্থসামাজিক ইতিহাস সম্পর্কিত কোনরূপ আভাষ বিন্দুমাত্রও উল্লিখিত নেই।

[325] রিওসুকে ফুরুই, 'বুদ্ধিস্ট বিহারাস ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অর্গাআইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল কন্টেক্সট', *বুদ্ধিসম, ল্য অ্যান্ড সোসাইটি,* (২০২৩), ৭, পৃষ্ঠা- ১০১, hal- 04100180

তা স্বত্বেও বর্তমানের পরিসরের আলোচনায় এই তাম্রশাসনগুলির গুরুত্ব যে অসামান্য তা বলা বাহুল্য।

চতুর্থত, বাংলার মৃৎশিল্পের আর্থ সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম অঙ্গ অর্থাৎ তাঁর নির্মাতা গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানই নয়, প্রাচীন ভারতের বিবিধ সাহিত্য গ্রন্থে সমাজের অন্যান্য শিল্প বা পেশাজীবী জাতিগোষ্ঠীর উল্লেখ থাকলেও পোড়ামাটি শিল্পী তথা নির্দিষ্টরূপে মৃৎ-ভাস্করদের উল্লেখ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাঁদের পরিচয়, কারিগরী তথা নির্ধারিত নির্মাণ বিধি, কারা বানাচ্ছে, কারা রক্ষণাবেক্ষণ বা তদারকি করছে, কারা চূড়ান্ত শৈল্পিক দক্ষতার মাপকাঠি প্রদান করছে এজাতীয় কোনও তথ্য কিন্তু উপস্থিত নেই যা এই সংক্রান্ত আলোচনার অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা।

ফলত স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় বাংলার মৃৎশিল্পের আর্থসামাজিক ইতিহাস নির্ধারণের প্রক্রিয়া বহুলাংশেই জটিল এবং আপেক্ষিক। এই আলোচনায় প্রবেশ করতে হলে উপরিউক্ত এসকল সীমাবদ্ধতাগুলিকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হয়।

১.১ বাংলায় মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষক অন্বেষণ

ক্ষেত্র বিশেষে ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যিক অলংকরণে মৃৎশিল্পের উপস্থিতি পাওয়া গেলেও আলোচ্য পরিসরে বাংলায় মূখ্যত বৌদ্ধ বিহারের অলংকরণের অঙ্গ রূপেই মৃৎভাস্কর্যের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র আদি মধ্যযুগীয় পর্বে বাংলা-বিহারের এই বৃহৎ অঞ্চলে একাধিক মহাবিহার, বিহার এবং বিহারিকার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, জুয়ান জাং তাঁর ভারত পরিভ্রমণ কালে স্থিত এসকল অধিকাংশ বৌদ্ধবিহারের সাথে গবেষকদের পরিচয় ঘটান।[326] এই পর্বে বৌদ্ধবিহারগুলি শিক্ষাচর্চা এবং ধর্মচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। কিন্তু তাদের যথাযথ পরিকাঠামো নির্মাণ, উপযুক্ত পরিচর্যা, বিবিধ আচার বিধি পালন, বিহারের আবাসিকদের জীবিকা নির্বাহ সংক্রান্ত প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সবকিছুর

[326] সুচন্দ্রা ঘোষ, "নেচার অফ রয়্যাল পেট্রোনেজ ইন সাউথ- ইস্টার্ন বেঙ্গলঃ ৫০৭ এডি – ১২৫০ এডি", *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট*, খণ্ড -১৩-১৪, (ঢাকা,বাংলাদেশ,আই সি এস বি এ, ২০০৮-২০০৯) , পৃষ্ঠা- ১-২

জন্য একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রয়োজন। ঠিক একইভাবে এই বিহারগুলির সাথে সম্পর্কিত পোড়ামাটি শিল্পের উপস্থিতি বা বিকাশের পশ্চাতেও অনুরূপ ভিত্তির অনুসন্ধান প্রয়োজন। বস্তুত পৃষ্ঠপোষকতা এক ধরণের সমর্থন, উৎসাহ ও ভিত্তি প্রদান করে যেকোনো শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ বিকাশ ও সমৃদ্ধির পশ্চাতে, ফলে উক্ত ইতিহাস অন্বেষণ নিঃসন্দেহে আলোচ্য পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ।

অদ্যাবধি আলোচনার নিরিখে সহজেই ধারণা করা যায় বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র অনুসন্ধান করতে হলে একক ভাবে তা সম্ভব নয়। কিন্তু সমকালীন সমাজে মৃৎশিল্পের অবস্থানকে বুঝতে হলে, সম্পৃক্ত ধর্মীয়,সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়াকে বুঝতে হলে মৃৎশিল্পের সাথে সম্পর্কিত পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলীকে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যেহেতু মৃৎ ফলকগুলি মূলত নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্থাপত্য সমূহকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং উক্ত শিল্প সম্পর্কে কোনও প্রত্যক্ষ তথ্য উপস্থিত নেই তাহলে প্রশ্ন করাই যায় যে কেবল উক্ত ধর্মীয় স্থাপত্য নয় তার সাথে সম্পৃক্ত মৃৎশিল্পও কি একাধারে উক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতারই অন্তর্গত ছিল? তবে কি সার্বিক রূপে সমকালীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পর্কিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বা পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্রকে অনুসন্ধান করলে মৃৎশিল্প সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা করা যথার্থ হবে? এই প্রসঙ্গেই বলা যায় ইতিপূর্বের অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃতভাবে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের প্রাপ্তিস্থলগুলি সম্পর্কে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে সেকারণে এক্ষেত্রে সতর্কভাবেই উক্ত আলোচনার পুনরাবৃত্তি করা হলনা। যেহেতু বাংলার বৌদ্ধবিহারগুলিতেই প্রধানত মৃৎশিল্পের উপস্থিতি লক্ষণীয় ফলত প্রথমেই বৌদ্ধবিহারগুলির সমৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে যুক্ত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট তথা পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র বিশ্লেষণ দিয়েই এই অন্বেষণ শুরু করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রধানত যে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে তা হল বৌদ্ধবিহারগুলিতে দান বা পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র অনুসন্ধান। যদিও প্রত্যক্ষ রূপে কোনও উপাদানে স্পষ্টত মৃৎ ভাস্কর্যের উদ্দেশ্যে অনুদানের উল্লেখ নেই, কিংবা আলোচ্য সকল মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলিতেও যে অনুদান সম্পর্কিত অভিলেখর উপস্থিতি রয়েছে এমন নয়, তা স্বত্তেও এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট অনুধাবনের উদ্দেশ্যে এই পন্থা প্রয়োগ করা হয়েছে।

১.১.১ ভূমিদান সাক্ষ্য ও পৃষ্ঠপোষকতার অনুসন্ধানঃ

আলোচ্য পর্বে বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল বিপুল পরিমাণ ভূমিদান প্রক্রিয়া এবং তাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার সম্পর্কের সমীকরণ। আধ্যাত্মিক পুণ্য অর্জন হোক বা সামাজিক পরিচিতি অর্জন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মের প্রতি বিপুল পৃষ্ঠপোষকতার নজির অদ্যাবধি আলোচনার মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। এই পৃষ্ঠপোষকতার সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ধাপ ছিল বিপুল পরিমাণ ভূমিদান যার প্রমাণ রূপে উপস্থিত রয়েছে বিবিধ তাম্রশাসন তথা অভিলেখ ভিত্তিক সাক্ষ্য। বাংলার বিভিন্ন উপঅঞ্চল যথা বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সমতট সর্বত্রই এই ধারা লক্ষনীয়, যদিও সর্ব ক্ষেত্রে সবসময় এই প্রক্রিয়া সম চরিত্রের ছিল এমন বলা যায়না। যেমন- বাংলার উত্তরের উপাঞ্চল তথা পুণ্ড্র অঞ্চল গুপ্ত শাসনের অধীনে একটি ভুক্তি ছিল এবং রাজা কর্তৃক নিযুক্ত উপরিক দ্বারা তা শাসিত হত। আবার দক্ষিণ পূর্বের বিভাগ তথা সমতট ও গুপ্ত শাসনের অধীনে থাকলেও অধীনস্ত শাসক দ্বারা শাসিত হত, এবং ক্রমেই আধা স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই প্রশাসনিক পার্থক্যের ফলে তাম্রশাসনের চরিত্রও ছিল অঞ্চল ভেদে ভিন্ন। পুন্ড্রতে স্থানীয় শাখা 'অধিকরণ' ভূমিদানপত্র বা তাম্রশাসন জারি করত কিন্তু সমতট অঞ্চলে তা সরাসরি করত স্থানীয় শাসক।[327] ফলত উভয় ক্ষেত্রে অঞ্চল ভেদে পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র যে ভিন্ন তা অনুধাবন করাই যায়। এছাড়াও ইতিপূর্বেই উল্লিখিত আলোচ্য পর্ব ছিল আঞ্চলিকতার যুগ, এবং বলা বাহুল্য সমতট অঞ্চল সর্বদাই বাংলার অন্য অঞ্চল অপেক্ষা নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি বজায় রেখেছে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকেই। বাংলায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ কেন্দ্রে পৃষ্ঠপোষকতার সাক্ষ্য স্বরূপ যে সকল তাম্রশাসন উপস্থিত রয়েছে ছকের মাধ্যমে তাঁদের তথ্যাবলী উল্লেখ করা হল এবং অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসন গুলি আলোচনা দ্বারা বাংলায় বৌদ্ধ পরিসরে পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র অনুধাবনের প্রয়াস করা হল।

---

[327] ফুরুই, 'বুদ্ধিস্ট বিহারাস ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল কন্টেক্সট', পৃষ্ঠা- ১০৩

ভূমিদান সাক্ষ্য সমূহঃ

তাম্রশাসন/লিপি	*কেন্দ্র*	*দাতা*	*গ্রহীতা*
বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসন[328]	সমতট	মহারাজা বৈন্যগুপ্ত	মহযানী সম্প্রদায়ের বৈভর্তিকা শাখার একটি বিহার
বৈন্যগুপ্তের শালবন বিহার তাম্রশাসন (অপ্রকাশিত)			
শ্রী ধারণরাতের কৈলান তাম্রশাসণ[329]	সমতট	মহাসন্ধিবিগ্রহিকা জয়নাথ এর উদ্যোগে রাজা শ্রী ধারণরাত	রত্নত্রয়, ১৩ জন ব্রাহ্মণ, জয়নাথ

[328] দীনেশ চন্দ্র সরকার, *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* খন্ড -১, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২) পৃষ্ঠা- ৩৩১-৩৩৫

[329] ডি সি সরকার, 'দ্য কৈলান কপারপ্লেট ইন্সক্রিপশন অফ কিং শ্রীধারণররাত অফ সমতট', *ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি*, ভলিউম-২৩, (১৯৪৭), পৃষ্ঠা- ২৩৯

দেবখর্গের আশরাফুর তাম্রশাসন[330] (ক)	সমতট	রাজা দেবখর্গ	সংঘমিত্র এবং ৪টি বিহার ও বিহারিকা
দেবখর্গের আশরাফুর তাম্রশাসন[331] (খ)	সমতট	রাজপুত্র রাজরাজ ভট্ট	সঙ্ঘমিত্রের একটি বিহার
ভবদেবের এশিয়াটিক সোসাইটি তাম্রশাসন[332]	সমতট	রাজকর্মচারী বিভূতিদাস এর অনুরোধে রাজা ভবদেব	একটি বিহারিকার রত্নত্রয়
গোপচন্দ্রের জয়রামপুর তাম্রশাসন[333]	রাঢ় বঙ্গ	মহাসামন্ত মহারাজা অচ্যুত	অবলোকিতেশ্বর এর বিহার নির্মাণ

[330] জি এম লস্কর, 'আশরাফুর কপারপ্লেট গ্রান্টস অফ দেবখর্গ', মেময়ার্স অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১(৬), (১৯০৬), পৃষ্ঠা- ৮৫

[331] জি এম লস্কর, 'আশরাফুর কপারপ্লেট গ্রান্টস অফ দেবখর্গ', পৃষ্ঠা- ৮৫

[332] দীনেশচন্দ্র সরকার, 'কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ কিং ভবদেব অফ দেবপর্বত', *জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, লেটারস,* খন্ড- XVII, নং-২, (১৯৫১) পৃষ্ঠা- ৮৩-৯৪

[333] ফুরুই, 'বুদ্ধিস্ট বিহারাস ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল কন্টেক্সট', পৃষ্ঠা- ১০৮-১১১

জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন[334]	বরেন্দ্র	সেনাপতি বজ্রদেবের অনুরোধে পালরাজা মহেন্দ্রপাল	তাঁর সেনাপতি বজ্রদেবের প্রতিষ্ঠিত বিহার
ধর্মপালের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম তাম্রশাসন[335]	বরেন্দ্র	পালরাজা ধর্মপাল	মহাসামন্ত ভদ্রনাগ কর্তৃক বিহার নির্মাণ ও তার জন্য ভূমিদান গ্রহণ
দ্বিতীয় গোপালের মহীপুর শাসন[336]	বরেন্দ্র	পাল রাজা দ্বিতীয় গোপাল	মহাসৈন্যপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহার
সামলবর্মনের বজ্রযোগিনী তাম্রশাসন[337]	বঙ্গ (বিক্রমপুর অঞ্চল)	রাজা	প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দির এ ভূমিদান
দেবাতিদেব এর তাম্র ফুলদানীর শাসন[338]	হরিকেল	মন্ত্রী সহ গোষ্ঠী বা যৌথ অনুদান	হরিতক ধর্মসভা বিহার

[334] অমল রায়, *'জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিসেম্বর ২০১২

[335] রিওসুকে ফুরুই, 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ ধর্মপাল, ইয়ার ২৬: টেন্টেটিভ রিডিং অ্যান্ড স্টাডি', *সাউথ এশিয়ান স্টাডিস*, ২৭(২),(২০১১), পৃষ্ঠা- ১৫০-১৫১

[336] রিওসুকে ফুরুই, 'রি-রিডিং টু কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ গোপাল ২, ইয়ার ৪', *প্রাগধারা*, নিউ দিল্লী, কাবেরী বুকস, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৩১৯-৩৩০

[337] বীরেন্দ্র নাথ প্রসাদ, *আর্কিওলজি অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ এশিয়া*, নিউ ইয়র্ক, রাটলেজ,২০২১ পৃষ্ঠা – ৪০৯

[338] গৌরীস্বর ভট্টাচার্য, 'এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অন দ্য ইন্সক্রাইবড মেটাল ভাস ফ্রম দ্য ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ বাংলাদেশ', *এক্সপ্লোরেশনস ইন দ্য আর্ট অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ সাউথ এশিয়াঃ এসেস ডেডিকেটেড টু*

দেবপালদেব এর নালন্দা তাম্রশাসন[339]	নালন্দা (অধুনা বিহার)	রাজা	সুবর্ণভূমির শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজা বালপুত্রদেবের নির্মিত বৌদ্ধ বিহার

বাংলায় বৌদ্ধ বিহারে পৃষ্ঠপোষকতার নজির স্বরূপ কি ধরণের তাম্রশাসন উপস্থিত রয়েছে মোটামুটিভাবে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হল। উল্লিখিত শাসনগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসন (৫০৭ খ্রিস্টাব্দ)। যেখানে দেখা যায় মহারাজা বৈন্যগুপ্ত অধীনস্ত শাসক মহারাজা রুদ্রদত্তের আবেদনে এই তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করেছেন বৌদ্ধভিক্ষু শান্তিদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাযানী শাখার ভৈভর্তিকা সম্প্রদায়ের একটি বৌদ্ধবিহারে যা শান্তিদেব এর নামে মহারাজা রুদ্রদত্ত নির্মান করেছিলেন। এই অনুদান অবলোকিতেশ্বরের উদ্দেশ্যে অগ্রহার রূপে প্রদান করা হয়েছিল এবং পাঁচটি খণ্ডে এগারো পতাকা খিলা জমি দান করা হয়েছিল।[340] সম্ভবত রুদ্রদত্তের সাথে শান্তিদেব এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যার ফলেই রুদ্রদত্ত এই বিহার নির্মান করেছিলেন।[341] অর্থাৎ শাসকের সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। পাশাপাশি এই অনুদান ক্ষমতার সম্পর্কের জটিলতার দিকটিকেও প্রকাশিত করে; উক্ত বিহার নির্মাণ স্থানীয় পরিসরে রুদ্রদত্তের ক্ষমতা বা প্রভাবের দিকটি সুস্পষ্ট হয় এবং তার বিহারের অধীনে যে প্রাপ্ত বিস্তৃত ভূমি সেখানে কৃষিকার্য দ্বারা জনগণের মধ্যে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে আরও আরও দৃঢ় করে। অর্থাৎ ধর্মীয় অনুদানের মোড়কে রুদ্রদত্ত রাজকীয় অনুমোদনেই নিজের স্বতন্ত্র ক্ষমতাকে বৈধতা প্রদান করতে চেয়েছিল।[342] ফলে স্পষ্টতই ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার

এন.জি.মজুমদার, দেবলা মিত্র(সম্পাদিত), (ক্যালকাটা, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা- ২৩৭-২৪৭

[339] হীরানন্দ শাস্ত্রী, 'দ্য নালন্দা কপার প্লেট ইন্সক্রিপশন অফ দেবপালদেব', *এপিগ্রাপিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড ১৭, (*নিউ দিল্লী, এ আস আই, ১৯২৩-২৪), পৃষ্ঠা- ৩১০-৩২৭

[340] দীনেশ চন্দ্র সরকার, *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* খন্ড -১, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২) পৃষ্ঠা- ৩৩১-৩৩৫

[341] ফুরুই, 'বুদ্ধিস্ট বিহারাস ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল কন্টেক্সট', পৃষ্ঠা- ১০৫

[342] তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৭

পশ্চাতের নিহিত উদ্দেশ্য কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস কখনোই নয়, বরং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত দৃঢ়রূপে প্রথিত ছিল এর সাথে তা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি স্থানীয় অঞ্চলে ক্ষমতা প্রসারের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল বলে রিওসুকে ফুরুই উল্লেখ করেছেন।[343]

প্রায় অনুরূপ উদাহরণ লক্ষ করা যায় রাঢ় বঙ্গের দণ্ডভুক্তি তে গোপচন্দ্রের জয়রামপুর তাম্রশাসন (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) এও। বোধিপদ্রক মহাবিহার এ দান ও উক্ত কেন্দ্রেই নতুন বিহার নির্মাণের উদ্দেশ্যে। তাঁর অধীনস্ত শাসক মহাসামন্ত মহারাজা অচ্যুত সংশ্লিষ্ট অধিকরণ এর কাছে জমি ক্রয়ের আবেদন করেন এবং অধিকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে বার্ষিক ১০০ অরিপিন্ডকচূর্ণিকা মূল্য প্রদানের শর্তে উক্ত ভূমি লাভ করেন। আর এর মাধ্যমে মহাসামন্ত মহারাজা অচ্যুত উক্ত অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে নিজ প্রতিপত্তি সম্প্রসারন করতে অগ্রসর হন।[344] অর্থাৎ ষষ্ঠ শতকে বাংলার দুই ভিন্ন উপাঞ্চলে প্রায় সমরূপ বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায় যারা উভয়ই রাজনৈতিক পরিচিতি সম্বলিত ছিলেন।

এরপর সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগে আধা স্বাধীন শাসকদের আবির্ভাব ঘটে যথা- লোকনাথ, শ্রীধারণরাত প্রমুখ যারা নিজেরাই তাম্রশাসন জারি করেছিলেন এবং সাধারণত যে অঞ্চল কৃষির দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল সেক্ষেত্রেই তাঁদের উপস্থিতি লক্ষণীয়, যথা, বঙ্গ- সমতট এলাকায় খর্গ রাজবংশের উত্থান।[345] বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ বা পৃষ্ঠপোষকতার নজির পরিলক্ষিত হয় বিবিধ তাম্রশাসন থেকে।

এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় শ্রীধারণরাতের কৈলান তাম্রশাসন[346](৬৬৫-৬৭৫ খ্রিস্টাব্দ) এর কথা। শ্রীধারনরাতের মন্ত্রী মহাসন্ধিবিগ্রহিক (যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক মন্ত্রী) জয়নাথ ২৫ পতাকা ভূমি ১৩জন ব্রাহ্মণ, রত্নত্রয় (বৌদ্ধ কেন্দ্র), এবং নিজের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য

---

[343] তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৭-১০৮

[344] তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৮-১১১

[345] রিওসোকে ফুরুই, *ল্যান্ড অ্যান্ড সোসাইটি ইন আর্লি সাউথ এশিয়া, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ৪০০-১২৫০ এ ডি,* (নিউ ইয়র্ক, রাটলেজ পাবলিকেশন, ২০২০) পৃষ্ঠা- ১০৫-১১৩

[346] ডি সি সরকার, ‘দ্য কৈলান কপারপ্লেট ইন্সক্রিপশন অফ কিং শ্রীধারণররাত অফ সমতট’, *ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি,* ভলিউম-২৩, (১৯৪৭), পৃষ্ঠা- ২৩৯

বি.এন.প্রসাদ উল্লেখ করেছেন জয়নাথ এর স্পষ্ট বৌদ্ধ পরিচিতি (পরমসৌগত ইত্যাদি) ছিলনা কিন্তু তিনি একত্রে বৌদ্ধ কেন্দ্র রত্নত্রয় এবং ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পাশাপাশি উক্ত বৌদ্ধকেন্দ্রও অবৌদ্ধ ব্যক্তির দান গ্রহণ করেছে যা থেকে অনুমিত হয় উক্ত অঞ্চল হয়তো একাধিক ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমন্বিত ছিল। প্রদত্ত জমির সীমানা হিসেবেও এক দিকে বিহার এবং অন্য দিকে দেবী মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে। ফলত এই পরিসরে উভয় কেন্দ্রে দান খুব অস্বাভাবিক হয়তো নয়। এই তাম্রশাসন অন্যভাবে ইঙ্গিত দেয় যে বৌদ্ধ কেন্দ্রের এই ক্ষমতা ছিল যে তারা অবৌদ্ধ দাতার কাছ থেকেও দান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।[347] যদিও জয়নাথ নিঃসন্দেহেই নিজ ব্যক্তিগত সুবিধা বা সামাজিক প্রতিপত্তির দিকটি বিবেচনা করেই এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বলাবাহুল্য।

এই পর্বের অন্যতম তাম্রশাসন হিসেবে পরিচিত বৌদ্ধ শাসক দেব খর্গের রাজত্বের সপ্তম ও একাদশ বছরে প্রদত্ত দুটি আশরাফুর তাম্রশাসন।[348] প্রথম শাসনে পুত্র রাজরাজ এর দীর্ঘায়ু কামনায় ৯ পতাকা ও ১০ দ্রোণ জমি দান করেছিলেন আচার্য সঙ্ঘমিত্রের অধীন ৪টি বিহার এবং বিহারিকা তে। আর দ্বিতীয় শাসনে ৬ পতাকা এবং ১০ দ্রোণ আচার্য সঙ্ঘমিত্রের এক বিহারে রাজরাজ ভট্ট দান করেছিলেন। উভয় শাসনেই জটিল ভূমিসম্পর্কের আভাষ পাওয়া যায় যেখানে উক্ত প্রদেয় জমির পূর্ব উপভোগকারীর উল্লেখ মেলে যাদের থেকে শাসক উক্ত ভূমির উপভোগের (জমির রাজস্ব প্রাপ্তি) অধিকার বিহার ও বিহারিকা গুলিকে প্রদান করেছে। সুতরাং সঙ্ঘমিত্রের অধীন বৌদ্ধ বিহারগুলির গুরুত্ব বা জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায় এই তাম্রশাসন থেকে।[349]

একই রাজবংশের বালভট্ট এর একটি ভূমিদানপত্র পাওয়া যায় ময়নামতীর শালবন বিহার থেকে যেখানে দেখা যায় মহাসন্ধিবিগ্রহধিকর্তা শ্রী যজ্ঞবর্মন এর আবেদনে বিহার, স্তূপ, আশ্রমের মেরামত, ধর্ম, সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ২৫ পতাকা ভূমি দান করা হয়েছে। এই লিপি গুলি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে খর্গ রাজবংশীয়রা লালমাই ময়নামতী অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং

---

[347] প্রসাদ, *আর্কিওলজি অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ এশিয়া,* পৃষ্ঠা – ৪১১-৪১৩

[348] লস্কর, 'আশরাফুর কপারপ্লেট গ্রান্টস অফ দেবখর্গ', পৃষ্ঠা- ৮৫

[349] প্রসাদ, *আর্কিওলজি অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ এশিয়া,* পৃষ্ঠা –৪১৩-৪১৪

বিহারগুলিতে সম্পদ অনুদান দিয়েছে। এমনকি ইৎ-সিং ও সমতট অঞ্চলে ৪০০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বসবাসের এবং রাজভট্টের (খর্গ বংশীয় রাজরাজ) পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তির উল্লেখ করেছেন।[350]

দেব বংশীয় রাও বৌদ্ধ অনুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতার নজির রূপে উপস্থিত রয়েছে ময়নামতীর শালবন বিহারে দেব তাম্রশাসন (অপ্রকাশিত) এবং একটি পোড়ামাটির সিল যেখানে উল্লিখিত রয়েছে 'শ্রী ভবদেবের বৌদ্ধ মঠের পণ্ডিত সন্ন্যাসীদের আদেশে', যা থেকে ইঙ্গিত মেলে যে উক্ত বিহার খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শ্রী ভবদেব মহাবিহার নামে পরিচিত ছিল।[351] খর্গ দের পর তারা এই বৌদ্ধকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে। অর্থাৎ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এক্ষেত্রে এতটাই দৃঢ় ছিল যে বৌদ্ধকেন্দ্রটিই স্বয়ং পৃষ্ঠপোষকের নামে অভিহিত হত। এছাড়া অষ্টম শতকে ভবদেবের দেবপর্বত অনুদান এক্ষেত্রে অন্যতম, যেখানে দেখা যায় রাজার এক আধিকারিক বিভূতিদাস এর আবেদনে ভেন্দমতী বিহারিকার রত্ন-ত্রয় এ ৭.৫ পতাকা ভূমি দান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রত্নত্রয় বলতে বোঝায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠানে ত্রিতত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এর উপাসনা।[352] রাত, খর্গ এবং দেব রাজাদের তাম্রশাসন এ এই রত্নত্রয় এর উল্লেখ মেলে। ময়নামতীর কুটিলামুড়ায় প্রাপ্ত ৩টি স্তূপের অস্তিত্ব সম্ভবত এই রত্নত্রয়।

হরিকেল এর সার্বভৌম শাসক দেবাতিদেব এর রাজত্বকালে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন ও একটি ধাতব ফুলদানির অভিলেখ থেকে উক্ত অঞ্চলে বৌদ্ধবিহারের উপস্থিতি মেলে। প্রথম ফলকে একটি বৌদ্ধ বিহারে ৭ খণ্ড ভূমি, বৃহৎ বাসস্থান যোগ্য অট্টালিকা, পোশাকাদি ইত্যাদি দানের সাক্ষ্য মেলে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হরিকেলের ধর্মসভা বিহারে দান হেতু জমি ক্রয় ও অনুদানের পাঁচটি ঘটনা নথীবদ্ধ আছে।[353] এই দ্বিতীয় অভিলেখটি আলোচ্য পরিসরে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কেননা অদ্যাবধি দেখা গেছে কেবল রাজা বা তাঁর অধিনস্ত শাসক বা মন্ত্রী প্রমুখ বৌদ্ধ ক্ষেত্রে দান করছেন কিন্তু এই অভিলেখ থেকে দেখা যায় প্রশাসনিক পরিচিতির বাইরেও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ এক্ষেত্রে

---

[350] সুচন্দ্রা ঘোষ, 'নেচার অফ রয়্যাল পেট্রোনেজ ইন সাউথ- ইস্টার্ন বেঙ্গল', পৃষ্ঠা- ১১০-১১১

[351] এ.বি.এম হোসেন (সম্পাদিত), *ময়নামতী-দেবপর্বত,* এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, (ঢাকা, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা-২১৮

[352] সরকার, 'কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ কিং ভবদেব অফ দেবপর্বত', পৃষ্ঠা- ৮৩-৯৪

[353] ফুরুই, 'বুদ্ধিস্ট বিহারাস ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল কন্টেক্সট', পৃষ্ঠা- ১১৬-১১৭

অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন- কুলচন্দ্র ও রত্নচন্দ্র নামক দুজন স্বর্ণকার, মঠাধ্যক্ষ শান্তিভদ্র, করণিক হস্তীরূদ্র প্রমুখ আরও কিছু ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দানের উদাহরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে আলোচ্য অভিলেখ তে।[354]

এরপর যদি নবম দশম শতাব্দীতে দেখা যায় সেক্ষেত্রেও বৌদ্ধ পরিসরে পৃষ্ঠপোষকতার সাক্ষ্য মেলে। এই পর্বে একদিকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর বঙ্গে পাল বংশের আবির্ভাব ঘটে যারা পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বিহার পর্যন্ত তাঁদের ক্ষমতা প্রসার ঘটিয়েছিল। অন্যদিকে দশম শতাব্দীতে নিম্ন বঙ্গ অঞ্চলে চন্দ্রদের আবির্ভাব ঘটে। এই দুই রাজবংশের আমলে ভূমিদান বা তাম্রশাসন জারির প্রক্রিয়ায় রাজার একাধিপত্য তৈরি হয়। উভয় বংশের রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ অনুরাগী এবং তাঁদের আমলে একাধিক মহাবিহার সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ পালরাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার এর উল্লেখ করা চলে, যা এই কেন্দ্রে প্রাপ্ত পোড়ামাটির সিল এ তা খোদিত রয়েছে। অর্থাৎ এই মহাবিহারের সার্বিক নির্মাণ, সমৃদ্ধি বা বিকাশের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষক রূপে ধর্মপালের কথা সহজেই উল্লেখ করা যায়। তাহলে প্রশ্ন হল আদতেই কি তাঁর মধ্যে থেকে পোড়ামাটি শিল্পকে পৃথক করা সম্ভব? এই পর্বেই অবশ্য উল্লেখ্য দেবপালদেবের নালন্দা তাম্রশাসন যা উক্ত কেন্দ্রের সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগের ক্ষেত্রটিকে প্রতিফলিত করে। এখানে সুবর্ণদ্বীপের (জাভা) শাসক বালপুত্রদেবের অনুরোধে তার প্রতিষ্ঠিত একটি বিহারের উদ্দেশ্যে ৫টি গ্রাম দান করেছিলেন দেবপাল।[355] এই শাসন পূর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ পরিসরে পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসে এক অনন্য নজির। যদিও এই পর্বে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্য পরিসরে প্রদত্ত এবং বৌদ্ধ পরিসরে তা ক্রমে সীমিত হয়। যা খুব স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। দেখা যায় এগারটি চন্দ্র শাসনে কেবল একটি রত্নত্রয়ে পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনও বৌদ্ধ বিহারে দানের উল্লেখ নেই, এমনকি ধর্মপাল স্বয়ং সোমপুর মহাবিহার এবং বিহারের বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণ করলেও পালদের চব্বিশটি তাম্রশাসনের মধ্যে মাত্র ৫টি ক্ষেত্রে বৌদ্ধ বিহারে দানের উল্লেখ মেলে। তার মধ্যে বাংলায় মাত্র তিনটি, যথা- ধর্মপালের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম

[354] ভট্টাচার্য, 'এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অন দ্য ইন্সক্রাইবড মেটাল ভাস ফ্রম দ্য ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ বাংলাদেশ', পৃষ্ঠা- ২৩৭-২৪৭

[355] শাস্ত্রী, 'দ্য নালন্দা কপার প্লেট ইন্সক্রিপশন অফ দেবপালদেব', পৃষ্ঠা- ৩১০-৩২৭

তাম্রশাসন, মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন[356] এবং দ্বিতীয় গোপালের মহীপুর শাসন। পরিসরের স্বল্পতায় সকল তাম্রশাসনের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয় তবে আলোচ্য গবেষণা পত্রে জগজ্জীবনপুর এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্র কেননা এখানে বিপুল পরিমাণ পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া গেছে। ফলত এর পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্রটি নিঃসন্দেহে আলোচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেখা যায় রাজা মহেন্দ্রপালের মহাসেনাপতি বজ্রদেব একই এলাকায় পূণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি বৌদ্ধবিহারের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নন্দদির্ঘীকউদ্রঙ্গ নামক প্রশাসনিক একক বা অধিবসতি দানের জন্য রাজার নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। মহেন্দ্রপাল তা অনুমোদন ও করেন, ফলত এই বিহারের ক্ষেত্রে আদতে দুই ভিন্ন ধরণের পৃষ্ঠপোষকতার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, একজন নির্মাতা এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক।[357] অনুরূপ উদাহরণ দেখা যায় মহীপুর তাম্রশাসনেও যা ইতিপূর্বের তাম্রশাসনের চরিত্র থেকে কিছুটা আলাদা।[358] এই বিহার স্থাপন বা দানপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে উক্ত স্থানীয় অঞ্চলে তাঁদের নিয়ন্ত্রন বা ক্ষমতা বৃদ্ধি, উক্ত প্রদত্ত সম্পদের পরিচালনার অধিকার এবং তা থেকে অর্জিত পুঁজির অধিকার প্রাপ্তির ইঙ্গিতবাহী। ফলত নিঃসন্দেহে এই বিহার এর সাথে সম্পর্কিত শিল্পের ওপরও এর প্রভাব থাকবে বা তাঁর মূল পৃষ্ঠপোষক আদতে মহেন্দ্রপাল হলেও সেক্ষেত্রে বজ্রদেবের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলা বাহুল্য।

নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ক্রমেই পাল শাসকরা তাঁদের অধীনস্ত শাসকদের আবেদনে বৌদ্ধ বিহারে এইরূপ দানের প্রক্রিয়া সীমিত করে দেন। সম্ভবত তাঁদের অধস্তন দের বর্ধিত ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যেই এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এই সময় থেকে তারা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিরিখে ব্রাহ্মণ্য পৃষ্ঠপোষকতায় অধিক গুরুত্ব দেন। যদিও অন্য কিছু উপাদান থেকে পাল শাসকদের বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ মেলে এই পর্বে। যেমন সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’ এ পালরাজা মহীপাল কর্তৃক একাদশ শতকে জগদ্দল মহাবিহার নির্মাণের উল্লেখ মেলে

---

[356] অমল রায়, *‘জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিসেম্বর ২০১২

[357] ঘোষ, ‘পেট্রোনেজ অফ বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া’, পৃষ্ঠা-১৩

[358] ফুরুই, ‘বুদ্ধিস্ট বিহারাস ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল কন্টেক্সট’, পৃষ্ঠা- ১২১-১২৩

যার অস্তিত্ব আজও পরিলক্ষিত বাংলাদেশের বগুড়া জেলায়। (চিত্র-২ক,২খ,২গ) এর পরবর্তীতেও আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধ ধর্মে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার কিছু নজির পরিলক্ষিত হয় সামলবর্মনের বজ্রযোগিনী শাসন কিংবা ১২২০ খ্রিস্টাব্দের ময়নামতী শাসনের ভিত্তিতে।[359]

২ক- জগদ্দল মহাবিহার, রাজশাহী, বাংলাদেশ। সৌজন্যে- সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর, ২০২২

[359] তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৭-১২৮

২খ- জগদ্দল মহাবিহার, রাজশাহী, বাংলাদেশ। সৌজন্যে- সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর, ২০২২

চিত্র- ২গ জগদ্দল মহাবিহার, রাজশাহী, বাংলাদেশ, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর, ২০২২

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সার্বিক রূপে আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যেখানে দেখা যায় আলোচ্য পর্বে বাংলায় বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধবিহারের উপস্থিতি ছিল এবং কমবেশী তারা সকলেই প্রচুর পরিমাণ ভূমিদান লাভ করেছিল। যার মাধ্যমে উক্ত বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলি একাধিক সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত বা বলা বাহুল্য বিহার গুলির আর্থ-সামাজিক ভিত্তিই ছিল বিপুল জমির অধিকার প্রাপ্তি। বর্তমানে যেহেতু আমাদের প্রধান আলোচনা পৃষ্ঠপোষক কেন্দ্রিক ফলে উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখা যায় আলোচ্য কালপর্বে বাংলার সর্বত্র ভূমিদানের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে রাজকীয় অনুদান। রাজা প্রত্যক্ষ রূপে সবক্ষেত্রে দাতা না হলেও রাজস্ব বিহীন ধর্মীয় অনুদানের ক্ষেত্রে আবশ্যিক রূপে রাজা তথা রাষ্ট্রই উক্ত দানের অনুমোদন দিয়েছে।[360] উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় এই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে মূলত ছিলেন সার্বভৌম রাজা, অধীনস্ত শাসক যথা- মহারাজা, মহাসামন্ত প্রমুখ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদস্থ কর্মচারী যথা- মন্ত্রী, সেনাপতি, বিষয়পতি প্রমুখ। প্রাপ্ত তাম্রশাসনের ভিত্তিতে দেখা যায় মূলত এদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই বাংলায় বৌদ্ধবিহারগুলি সার্বিকভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। তাহলে কি এই পরিস্থিতিকে রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক ধরণের পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রক্রিয়া বলা যায়, যেখানে একদিকে বৌদ্ধবিহারগুলি যেমন অনুদান প্রাপ্তির ফলে সমৃদ্ধশালী হচ্ছিল, জনমানসে অধিক মাত্রায় প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছিল তেমনই শাসক সুদৃঢ় রূপে তাঁর জনপ্রিয়তা, ক্ষমতা, প্রতিপত্তির প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল? বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণ্য পরিসরেও এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায় যদিও সেখানে ব্রাহ্মণ্য মন্দির বা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা ব্যাক্তিগতরূপে ব্রাহ্মণদের অধিক অনুদান দেওয়া হত এবং পরিবর্তে রাজার প্রতি তাঁদের সমর্থন তথা বৈধতা প্রাপ্তি দ্বারা ক্ষমতার প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হত এই পৃষ্ঠপোষকতা। তাহলে কি বলা যায় আদতে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য উভয় পরিসরেই পৃষ্ঠপোষকতার ছিল বহুলাংশে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার? নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের উপর শাসকের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা এমনকি কখনো প্রান্তীয় জঙ্গল এলাকাতেও প্রতিপত্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁদের ব্রাহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠান কিংবা

---

[360] সায়ন্তনী পাল, 'রিলিজিয়াস পেট্রোনেজ ইন দ্য ল্যান্ড গ্রান্ট চার্টার্স অফ আর্লি বেঙ্গল (ফিফথ – থার্টিন্থ সেঞ্চুরি)', *ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রিভিউ*, ৪১(২), (সেজ পাবলিকেশনস, ২০১৪) , পৃষ্ঠা- ১৮৬

বৌদ্ধ বিহারের সংস্পর্শে আনা হত নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর জন্য, ব্রাহ্মণ্য ধারায় জাতি বর্ণ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং সর্বোপরি রাজাকে সম্মান বা মান্য করার জন্য। আর যেহেতু ব্রাহ্মণরা এই কাজে অধিক উপযুক্ত ছিলেন সেকারণেই সম্ভবত পরের দিকে ক্রমে তারা প্রাতিষ্ঠানিক প্রাপ্তির বাইরেও অধিক মাত্রায় ব্যক্তিগত অনুদান পেতে শুরু করেন।[361]

১.১.২ ভূমিদান ব্যতীত অন্যান্য সাক্ষ্য ও পৃষ্ঠপোষকতার অনুসন্ধানঃ

রাজকীয় অনুদান তথা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অনুদান এর পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য মানুষদের ও অংশগ্রহন পরিলক্ষিত হয় পৃষ্ঠপোষক রূপে। তাম্রশাসন ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের দানের ক্ষেত্রে দেখলে কিন্তু এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইতিপূর্বেও উল্লিখিত হরিকেল এর ধাতব ফুলদানি তে দাতা হিসেবে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সুবর্ণকারের পরিচয় মেলে। এক্ষেত্রে সোমপুর মহাবিহার এর উল্লেখ করা চলে যেখানে ক্রুসিফর্ম কেন্দ্রীয় মন্দির থেকে প্রাপ্ত লিপিতে দুজন বৌদ্ধভিক্ষু কর্তৃক অনুদান প্রদান এর উল্লেখ আছে।[362] আবার পাহাড়পুরে ৩৫ টি পোড়ামাটির সিল আবিষ্কৃত হয় যার মধ্যে মাত্র ৬টি তে বিহারের প্রতীক উৎকীর্ণ রয়েছে। দুটি তে সীহসেন নামক ব্যক্তির নাম খোদিত আছে আর বাকি সবগুলিতে ধর্মসেন নামক এক ব্যক্তির নাম খোদিত আছে এবং উভয়কেই বিশিষ্টজন রূপে উল্লেখ করা হয়েছ। কিন্তু এই উভয় ব্যক্তি পাল প্রশাসনের সাথে যুক্ত ছিলেন না কিংবা মঠের সাথে তাঁদের সম্পর্ক বা কোনও সুস্পষ্ট বৌদ্ধ পরিচিতিও প্রকাশিত নয়।[363] ফলত রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিচিতির বাইরে তাঁদের সামাজিক পরিচিতি অনুমান করা যেতে পারে। আবার পাহাড়পুরেই ৪টি স্তম্ভ লিপি পাওয়া যায় যার মধ্যে ৩টি বৌদ্ধভিক্ষু দের দ্বারা প্রদত্ত। চতুর্থটি এতটাই ভগ্নপ্রায় যে স্পষ্টরূপে কিছু জানা যায়না তবে কেবল লিপির শেষ শব্দটি অনুমান করা হয় 'অর্কনন্দীন' নামক কোনও ব্যক্তির নাম।[364] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাহাড়পুরের নিকটবর্তী জগদ্দল বৌদ্ধবিহারেও একটি

---

[361] তদেব , পৃষ্ঠা- ১৯৪

[362]প্রসাদ, *আর্কিওলজি অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ এশিয়া,* পৃষ্ঠা – ৪২৯
রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর, বেঙ্গল,* মেমোয়ার্স অফ দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, নং- ৫৫ , (জনপথ, নিউ দিল্লী, দ্য ডিরেক্টর জেনারেল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯৯) পৃষ্ঠা- ৭৪

[363] দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর,* পৃষ্ঠা – ৯০

[364] তদেব, পৃষ্ঠা – ৭৫

স্তম্ভলিপিতে 'মক্কানন্দী' নামক ব্যক্তির উল্লেখ মেলে যিনি ছিলেন কায়স্থ এবং সম্ভবত এই উভয় ব্যক্তি একই পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন।[365] ফলত বৌদ্ধ বিহারে পৃষ্ঠপোষকতায় লেখক বা কায়স্থ শ্রেণীর ভূমিকার দিকটিও উঠে আসে এই উদাহরণ দ্বারা।

পাহাড়পুরের সাথেই প্রায় অনুরূপ এবং সমপর্যায়ের যে বৌদ্ধ বিহারটির নাম উঠে আসে তা হল অ্যান্টিচকের বিক্রমশীলা মহাবিহার। স্থাপত্যিক কিংবা শৈল্পিক পরিকাঠামোগত বিপুল সাদৃশ্য বিদ্যমান উভয়ের মধ্যে এবং টেরাকোটাও তার অন্তর্ভুক্ত। পাহাড়পুর বা বিক্রমশীলা উভয়ই যেহেতু ধর্মপালের তত্ত্বাবধানে নির্মিত ফলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা যে লাভ করবে বলা বাহুল্য। কিন্তু বিক্রমশীলায় কোনও ভূমিদান সাক্ষ্য পাওয়া যায়না, কিন্তু একাধিক সিল (Seals and sealings) থেকে বেশ কিছু অভিলেখ মেলে যার মধ্যে বহু ক্ষেত্রে নামের সাথে শ্রী অভিধা যুক্ত, যা তাঁদের সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তিরূপে প্রতিফলিত করে। বেশ কিছু লিপি সম্বলিত ভাস্কর্য মেলে, যার মধ্যে দাতা হিসেবে স্বর্ণকার এর উপস্থিতি মেলে। আবার একটি স্তম্ভলিপি থেকে 'সহুর' নামক স্থানীয় প্রশাসকের পৃষ্ঠপোষকতার ইঙ্গিতও মেলে।[366]

বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা পৃষ্ঠপোষকতার পরিসরে বোধগয়া অন্যতম নাম, যদিও প্রত্যক্ষরূপে বৌদ্ধ মহাবিহার বা মৃৎশিল্পের উপস্থিতি সেভাবে লক্ষণীয় নয়। কিন্তু বোধগয়ার মহাবোধি মন্দির থেকে অসংখ্য ভাস্কর্য ও নিবেদন স্তূপের অস্তিত্ব মেলে। যার মধ্যে দাতা রূপে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভমিকার কথা পাওয়া যায়। পাশাপাশি মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, তিব্বত, চীনের থেকেও বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিল এই কেন্দ্র।[367]

আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় নালন্দা মহাবিহার এর কথা। প্রত্যক্ষরূপে টেরাকোটা ভাস্কর্য না হলেও প্রায় অনুরূপ ষ্টাকো শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যতম কেন্দ্র নালন্দা। কেবল তাই নয়, সার্বিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং শিল্প স্থাপত্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল এই কেন্দ্র। জুয়ান জাং এর আলোচনায় দেখা যায় নালন্দার নিকটবর্তী প্রায় ১০০ টি গ্রামের রাজস্বের দ্বারা এই কেন্দ্র সমর্থিত

---

365 মোহম্মদ আবুল হাশেম মিয়াঁ, 'আর্কিওলজিক্যাল এক্সকাভেশনস অ্যাট জগদ্দল বিহারঃ আ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট*, খণ্ড -৮, (ঢাকা, বাংলাদেশ, আই সি এস বি এ, ২০০৩), পৃষ্ঠা- ১৫৪-১৫৫

366 ঘোষ, 'পেট্রোনেজ অফ বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া', পৃষ্ঠা- ৭-৮

367 তদেব, পৃষ্ঠা- ৯-১০

ছিল। সাধারণ মানুষরাও চাল, মাখন এবং দুধ অনুদান স্বরূপ দিত সন্ন্যাসীদের দিনযাপনের উদ্দেশ্যে। একাধিক সিলিং (Sealing) থেকে বিভিন্ন শাসক যথা, হর্ষবর্ধন, ভাস্করবর্মন, ধ্রুবভট্ট কিংবা নানা পদাধিকারী ব্যক্তিত্বদের বিপুল পৃষ্ঠপোষকতার কথা জানা যায়। পাশাপাশি বণিক, বা শিক্ষকদের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। দ্বিতীয় নাগার্জুন নামক এক শিক্ষক সপ্তম শতকে তার সম্পদ থেকে ৫০০ মহাযানী শিক্ষকদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেন। এছাড়াও নালন্দার পৃষ্ঠপোষকতার আলোচনায় অবশ্যই আসে বৌদ্ধ ভিক্ষু বিপুলশ্রীমিত্রের বিহার নির্মাণ এবং অন্যান্য অনুদান।[368]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দানের পরিসরে ভূমিদানের পরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে ছিল লিপি সম্বলিত প্রস্তর ও ধাতব ঐশ্বরিক ভাস্কর্য প্রদান। বিহারের নালন্দা, কুর্কিহার, মহাবোধি, বাংলার ময়নামতি কিংবা বাংলার রাঢ় অঞ্চলে কুর্কিহার অঞ্চল এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাম।[369] অসংখ্য লিপি সম্বলিত অবয়ব থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বৌদ্ধ পরিসরের দানকর্মে অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। যেখানে কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের নাম, শাসকের সময়কাল, এবং মুখ্যত দাতার পেশাগত পরিচয় উল্লিখিত থাকত। ফলত বৌদ্ধ পরিসরে সার্বিক দানের ইতিহাসে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উপস্থিতির আভাষ পাওয়া যায় এসকল বিভিন্ন উপাদান থেকে। লিপি সম্বলিত ভাস্কর্য সংক্রান্ত একাধিক আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে ভারতের বিশেষত পূর্ব ভারতীয় শিল্প ইতিহাস চর্চায়। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা প্রয়োজনে এই লিপি সম্বলিত ভাস্কর্যের আলোচনা খানিক বিস্তৃত রূপে উপস্থাপিত হবে। তবে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলা বা বিহারের বিস্তীর্ণ অংশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সার্বিক পৃষ্ঠপোষক রূপে যেমন বিপুল রাজকীয় বা তৎ সম্পর্কিত অনুদান এর অস্তিত্ব ছিল, তেমন ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ আর মৃৎশিল্প ছিল উক্ত সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিচিতির ঊর্ধ্বে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে

---

[368] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩-৬

[369] দ্রষ্টব্যঃ এই সংক্রান্ত একাধিক আলোচনা বাংলা বা ভারতীয় শিল্প ইতিহাস চর্চায় বিদ্যমান, কিন্তু সমস্ত কিছু একত্রে আলোচনা সম্ভব নয়। বিশদ বিবরণের জন্য আরও দেখুন- রজত সান্যাল, ইন্সক্রাইবড স্কাল্পচার, গৌতম সেনগুপ্ত, শর্মিলা সাহা (সম্পাদিত), *ভাইব্রান্ট রক,* (কলকাতা, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ২০১৪), পৃষ্ঠা- ২৫৩-৭৬

সরসী কুমার সরস্বতী, ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার, ষ্টেলা ক্র্যামরিশ, কুর্কিহার, গয়া অ্যান্ড বোধগয়া, রাজশাহী, ১৯৩৬

বি এন প্রসাদ, *রিথিংকিং বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার,* নিউ দিল্লী, মনোহর পাবলিকেশনস, ২০২২

বীরেন্দ্র নাথ প্রসাদ, *আর্কিওলজি অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ এশিয়া,* নিউ ইয়র্ক, রাটলেজ,২০২১

সম্ভবত পুণ্য অর্জনের বাসনা তাঁদের এই ধরণের অনুদানে উদ্বুদ্ধ করে। যদিও এক্ষেত্রে মর্যাদা, বা প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা জনিত সম্ভাবনাগুলিও অস্বীকার্য নয়। অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা ঘোষ যথার্থই উল্লেখ করেছেন, শাসকরা প্রধানত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা স্থাপত্য নির্মাণ করে যেমন নিজেদের বিশেষ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তেমনই সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ নিজেদের পুণ্য বা পরিচিতি সুপ্রতিষ্ঠিতকরন করেছিলেন নিজ নাম পরিচিতি সম্বলিত ভাস্কর্য প্রদান করে।[370] ফলে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এই পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসে বাংলার মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষক অনুসন্ধানের প্রয়াস যে একেবারে যুক্তিহীন নয় তা সহজেই অনুমান করা চলে।

কিন্তু এখানে খুব স্বাভাবিক রূপেই প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে এই আলোচনার সাথে মৃৎশিল্পের সম্পর্ক কি? কোনও তাম্রশাসনে মৃৎশিল্প বা মৃৎশিল্পীর উল্লেখ নেই, এমনকি পোড়ামাটির সিল ছাড়া মৃৎফলক বা মৃৎ ভাস্কর্যেরও কোনও উল্লেখ আলোচ্য পরিসরে পাওয়া যায়না। অথচ সমকালীন বাংলায় আবিষ্কৃত প্রায় সকল বৌদ্ধ বিহারে কমবেশী পোড়ামাটি ভাস্কর্যের উপস্থিতি লক্ষণীয় এবং একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে তা লক্ষণীয়। কিছু আঞ্চলিক বৈচিত্র্য থাকলেও বাহ্যিক ভাবে তাঁদের শৈল্পিক উপস্থাপনা, বিষয়বস্তু, উপস্থাপনার ভঙ্গিমা সবকিছুই এক নির্দিষ্ট ভাস্কর্যের ধারা বা শৈল্পিক ঘরানার উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয় এবং এই বিপুল প্রাপ্তি তাঁর সমৃদ্ধি বা জনপ্রিয়তারই ইঙ্গিত দেয়। অথচ কোনও লিপি বা সাহিত্যিক উপাদানে এই ধারা সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত। ফলত এরূপ পরিস্থিতিতে মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষকের অনুসন্ধান এর উদ্দেশ্যে সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ ধর্ম বা প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতার অনুসন্ধান এর প্রয়াস করা হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা চলে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেছে বাংলায় আলোচ্য পর্বে কেউ নতুন বিহার নির্মাণ করছেন, কেউ জনপ্রিয় কোনও বিহার বা বৌদ্ধ কেন্দ্রে অনুদান দিচ্ছেন, এবং প্রায় সকল তাম্রশাসনেই দানের উদ্দেশ্য হিসেবে স্পষ্টতই উল্লিখিত হয়েছে বিহারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আচার অনুষ্ঠান পালন, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা পূরণ, বিহারের মেরামতি ও সংস্কার প্রভৃতি। আমরা জানি আদি মধ্য যুগে মৃৎফলকগুলি মূলত বৌদ্ধবিহারের দেওয়াল গাত্রের অংশ রূপে পাওয়া যায়, তাহলে যেখানে নতুন বিহার নির্মাণ করা হচ্ছে কিংবা বিহারের সংস্কার হচ্ছে বা কোনও বিহারের সার্বিক সমৃদ্ধির স্বার্থেই দান করা হচ্ছে তার মধ্য থেকে কি মৃৎশিল্পকে পৃথক করা সম্ভব?

---

[370] ঘোষ, 'পেট্রোনেজ অফ বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া', পৃষ্ঠা- ২০

আদতেই হয়তো নয়। আর যেহেতু মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষক রূপে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অদ্যাবধি অনুপস্থিত ফলে এই সকল পৃষ্ঠপোষকদেরই মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষক রূপে অনুমান করা যেতে পারে। যার মধ্যে মূলতই পাওয়া যাচ্ছে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা, ফলত তাঁদের অনুমোদন বা পছন্দই যে মৃৎশিল্পের নির্মাণ বা চরিত্র নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলা বাহুল্য। তবে সব ক্ষেত্রে হয়তো এক ধারা প্রচলিত ছিলনা ক্ষেত্র বিশেষে হয়তো বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অন্যান্য শ্রেণীর মানুষও এক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে পারে তা সহজেই অনুমান যোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অদ্যাবধি আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের মাধ্যমে যতখানি তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লিখিত বৌদ্ধ বিহারে অনুদানের কথা সহজেই জানা যায় কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে বাংলায় আরও একাধিক বৌদ্ধ বিহার বা কেন্দ্রের উপস্থিতি রয়েছে যাদের কোনও লিপিতাত্ত্বিক সাক্ষ্য নেই। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক কারা ছিলেন? রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে থাকলে নিশ্চয়ই তার কিছু প্রমাণ থাকত, বা হয়তো ভবিষ্যতে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনওভাবে কি এরূপ সম্ভব যে অন্য কোনও পেশার সাথে যুক্ত অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কেউ বা কারা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করে থাকতে পারেন? কেননা বগুড়ায় মহাস্থান গড় এলাকার নিকটবর্তী পরিসরে কিংবা কুমিল্লায় ময়নামতীর চতুর্দিকে এরূপ অসংখ্য ছোট বড় স্থাপত্যিক কাঠামোর অস্তিত্ব পাওয়া যায় যথা- মহাস্থানের বিহার ধাপ, (চিত্র-৩) ভাসু বিহার, বৈরাগীর ভিটা আবার ময়নামতীর ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়া (চিত্র-৪) ইত্যাদি যাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপে পরিগণিত হয় এবং পোড়ামাটি ফলকেরও সন্ধান পাওয়া যায় কিন্ত স্পষ্টরূপে তাদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকের কথা জানা যায়না। ফলত সেক্ষেত্রে হয়তো অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকের কথা অনুমান করাই যায় যারা স্থানীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অধ্যাপিকা সায়ন্তনী পাল আলোচ্য প্রসঙ্গে গুপ্ত পর্বে পৃষ্ঠপোষক রূপে নগরশ্রেষ্ঠীর ন্যায় বণিক সম্প্রদায়, গ্রামিক,মহত্তর, কুটুম্বিন, পুস্তপাল, কায়স্থ, কুলিক প্রমুখ শ্রেণীর উপস্থিতির কথা বলেছেন[371], ফলে এই ধারা যে পরবর্তীতেও ক্ষেত্র বিশেষে অব্যাহত থাকতে পারে এরূপ অনুমান করাই চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিহারের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন সময় দূর থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের অনুদান বা পৃষ্ঠপোষকতার নজির পাওয়া যায়, যেমন – স্থবির বীরেন্দ্র বা বিপুলশ্রীমিত্র মগধের ধর্মীয়

---

[371] পাল, 'রিলিজিয়াস পেট্রোনেজ ইন দ্য ল্যান্ড গ্রান্ট চার্টার্স অফ আর্লি বেঙ্গল', পৃষ্ঠা- ১৮৬-১৮৭

স্থান পর্যবেক্ষণ করেন এবং মগধে অনুদান প্রদান করেন। কিন্তু বাংলায় এই ধরণের তীর্থযাত্রী কর্তৃক অনুদানের কোনও সাক্ষ্য উপস্থিত নেই।[372] এমনকি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে সমকালীন বাংলা বিশেষত দক্ষিণ পূর্ব বাংলা তথা সমতট হরিকেল অঞ্চলের নিবিড় সংযোগ থাকলেও সেরম কোনও অনুদান বা পৃষ্ঠপোষকতার নজির বাংলায় পাওয়া যায়না।

চিত্র-৩ বিহার ধাপ, বগুড়া, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর, ২০২২

[372] প্রসাদ, *আর্কিওলজি অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ এশিয়া,* পৃষ্ঠা – ৪৬৭

চিত্র-৪ রূপবান মুড়া বিহার, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ, সায়নী রায়,ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত, সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আলোচ্য পর্বে বাংলার মৃৎশিল্পে বিশেষ স্বতন্ত্রতার পরিচয় দেয় মহাস্থানের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত পলাশবাড়ি কেন্দ্রটি। যেখানে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে উত্তর ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত[373] আয়তাকার ফলকে উৎকীর্ণ আছে রামায়নের দৃশ্যাবলী, (চিত্র-৫) এগুলির নিম্নাংশে প্রায়ই অশুদ্ধ বানানে সমকালীন অক্ষরে চরিত্রদের নাম বা ঘটনার সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা। এছাড়াও কিছু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী যথা ব্রহ্মা, গনেশ উপস্থাপিত রয়েছে। (চিত্র-৬) পূর্ববর্তী অধ্যায়েও উল্লিখিত যে এই কেন্দ্রে প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বগুলি দীর্ঘকালব্যাপী বৌদ্ধধর্মের সাথে আদি মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্পের একচেটিয়া সম্পর্কের সমীকরণকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করায়। অদ্যাবধি প্রাপ্ত উপাদানের মধ্যে একমাত্র এখানেই বিপুল রূপে ব্রাহ্মণ্য উপাদান সম্পন্ন মৃৎফলকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিশেষ উল্লেখ্য একমাত্র ব্রাহ্মণ্য উপাদান ছাড়া এখানে অন্য বিষয়বস্তুর উপস্থিতি নেই। পাশাপাশি এই প্রথম মৃৎফলকে লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে এই কেন্দ্রের উপস্থাপনা খুব স্বাভাবিক রূপেই এক ভিন্ন

[373] গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য, 'আর্লি রামায়ণা ইলাস্ট্রেশন ফ্রম বাংলাদেশ', *সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজি*, ১৯৮৭, পার্ট-২, (রোম, ১৯৯০), পৃষ্ঠা- ১০৫২

পরিসর এবং ভিন্ন পৃষ্ঠপোষকতার উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। তাহলে প্রশ্ন আসে এর পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র কিরূপ ছিল? সমগ্র আদি মধ্য যুগ জুড়েই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য পরিসরেও বিপুল রাজকীয় দান করা হয়েছে তাহলে এটাও কি অনুরূপ কোনও দানপুষ্ট? নাকি এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকাও গ্রহন করেছিলেন লোকসমাজের সাধারণ মানুষরাই? যেখানে তাঁদের পছন্দ বা ভালোলাগার বিষয়ের ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে মৃৎফলকের মধ্য দিয়ে? তাঁরা কি তাহলে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারাপুষ্ট কোনও গোষ্ঠী ছিলেন নাকি দর্শকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য অনুরাগী? এরূপ একাধিক প্রশ্ন কিন্তু উঠে আসে আলোচ্য পরিসরে। ফলত কেন্দ্র নির্বিশেষে, অঞ্চল ভেদে আদি মধ্য যুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্রও যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পলাশবাড়ী থেকে প্রাপ্ত বিপুল ফলক নিঃসন্দেহেই তার ব্রাহ্মণ্য চরিত্রকে পরিস্ফুট করে এবং মনে করা হয় তা উক্ত অঞ্চলেরই কোনও বৈষ্ণব মন্দিরের স্তম্ভমূলের সাথে সংযুক্ত ছিল।[374] একাধিক গুপ্ত তাম্রশাসন থেকে অনুধাবন করা যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে প্রধানত বৈষ্ণব ধর্মই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল[375] পাশাপাশি বিবিধ গুপ্ত উপাদানে শাসক কর্তৃক 'পরমভাগবত' উপাধির ব্যবহার ভাগবত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগকে স্পষ্ট করে তোলে। এসময় সম্ভবত নিজধর্ম প্রচার তথা ধর্মীয় পুণ্য অর্জন এবং জনমানসে নিজেদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিতকরণের উদ্দেশ্যে একাধিক বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ্য মন্দির নির্মাণের প্রবণতা, ব্রাহ্মণ্য পরিসরে দানের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। তবে সবক্ষেত্রে শাসক যে প্রত্যক্ষ্যভাবে সকল মন্দির পৃষ্ঠপোষকতা বা সংস্কার করেছেন এমন বলা যথোপযুক্ত নয় কেননা পুণ্ড্র অঞ্চল গুপ্ত শাসনের অধীনে একটি ভুক্তি ছিল এবং রাজা কর্তৃক নিযুক্ত উপরিক দ্বারা তা শাসিত হত।[376] ফলে এই শিল্পের চরিত্র নির্ধারণে এই ধরণের শ্রেণীর উপস্থিতি বা ভূমিকার দিকটিও অগ্রাহ্য করা যথার্থ নয়।

---

374 তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৪৯

375 আফরোজ আকমাম, *মহাস্থান,* (ঢাকা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ২০০৬) পৃষ্ঠা- ৯৪-৯৫

376 ফুরুই, 'বুদ্ধিস্ট বিহারাস ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল কন্টেক্সট', পৃষ্ঠা- ১০৩

চিত্র-৫ রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ, পলাশবাড়ী, বগুড়া, বাংলাদেশ, সৌজন্যে- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সায়নী রায়, ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্তেম্বর,২০২২

চিত্র- ৬ গনেশ, গজলক্ষ্মী ও কার্তিক/কুবের(?), পলাশবাড়ী, বগুড়া, বাংলাদেশ, সৌজন্যে- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সায়নী রায়, ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্তেম্বর,২০২২

বিষয়বস্তু হিসেবে রামায়ণের প্রাধান্যের কথা যদি বলতে হয় সেক্ষেত্রে বলা চলে এত বিস্তৃত রূপে রামায়ণ কাহিনীর উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে উক্ত অঞ্চলে সমকালীন জনমানসে এর জনপ্রিয়তা বা গ্রহণযোগ্যতার দিকটিকে ইঙ্গিতবাহী করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুপ্ত শাসকরা যেহেতু দৈব রাজতন্ত্রের ধারণার সমর্থক ছিল এবং নিজেদের ‘পরমদৈবত’ রূপে উল্লেখ করত ফলে সম্ভবত নিজেদের তারা রামায়ণের নায়ক রামের প্রতিভূ রূপে প্রকাশ করতে চাইত। পাশাপাশি রাম গুপ্ত শাসকদের প্রধান উপাস্য বিষ্ণুর অবতার রূপেও পরিচিত ছিল। আর সেকারণেই সম্ভবত এই পর্বে বাংলা তথা ভারতীয় পরিসরে বৈষ্ণব মন্দির এবং তার অনুষঙ্গ হিসেবে রামায়ণের উপস্থাপন প্রচলিত হয়।[377] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একই সময়কালে বাংলার পলাশবাড়ী ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রান্তে ক্ষেত্র বিশেষে এইরূপ রামায়ণ কাহিনী উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি পারুল পান্ড্য ধর আদি মধ্যযুগ জুড়ে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন শিল্পমাধ্যমে রামায়ণের উপস্থাপনার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ করা যায় বিহারের গয়া জেলার অপ্সরে সপ্তম শতকীয় বৈষ্ণব মন্দিরগাত্রে রামায়ণ কাহিনীসম্বলিত লিপিযুক্ত স্টাকো ফলক, হরিয়ানার নাচর খেরাতে অনুরূপ ধাঁচের লিপি যুক্ত রামায়ণ কাহিনীনির্ভর মৃৎফলক প্রভৃতি ও অন্যান্য[378]। ফলত এরূপ বলা চলে যে আলোচ্য পর্বে ভারতে এক নির্দিষ্ট ধাঁচের শিল্পধারার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল যা উপযুক্ত পরিসরে, যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে প্রসার লাভ করেছিল এবং বাংলায় পরবর্তীতে ময়নামতী, পাহাড়পুর, জগজ্জীবনপুর বা অ্যান্টিচক এর ন্যায় কেন্দ্রে যে সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পঘরানার প্রসার ঘটেছিল তার সূচনা হয়েছিল এই পর্বে পলাশবাড়ীর মধ্য দিয়ে। একইভাবে পৃষ্ঠপোষকের পরিবর্তনে তথা পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতে পরবর্তীতে আবার পাল-চন্দ্র আমলে এই শিল্পের চরিত্রে পরিবর্তন আসে ও বৌদ্ধ পরিসরে তা বিকাশ লাভ করে।

১.২ বাংলার মৃৎশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ মানুষ বা দর্শক সমাজ অনুসন্ধানঃ

---

377 ভট্টাচার্য, ‘আর্লি রামায়ণা ইলাস্ট্রেশন ফ্রম বাংলাদেশ’, পৃষ্ঠা- ১০৪৪

378 পারুল পান্ড্য ধর, ‘এপিক ভিসনস ইন টেরাকোটা, স্টোন অ্যান্ড স্টাকো, রামায়না ইন ইন্ডিয়ান’, পারুল পান্ড্য ধর (সম্পা.) *কানেক্টেড হিস্টরিস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া,* সেজ পাবলিকেশনস, ২০২৩, পৃষ্ঠা- ১৩১-১৫৮

যেকোনো সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকে সাধারণ মানুষ। তাঁদের কেন্দ্র করেই সংশ্লিষ্ট সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি পরিচালিত হয়। আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম অংশ জুড়ে থাকে অবশ্যই উক্ত শিল্পের অবলোকনকারী সমাজ বা দর্শক সমাজ। আর তাঁদের অনুসন্ধানের অর্থই হল সমকালীন পর্বে সাধারণ মানুষের সমাজ ইতিহাস অন্বেষণ। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন আসে এই ইতিহাস অনুসন্ধানের মাধ্যম কি? কেননা কোনও লিখিত তথ্য প্রত্যক্ষরূপে মৃৎশিল্পের দর্শক সমাজের কথা বলেনা। আর এখানেই আবারও নির্ভর করতে হয় বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনে। কেননা আলোচ্য মৃৎশিল্প কিংবা যেসকল প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্যে এই শিল্পের উপস্থিতি তা উক্ত সমাজেরই অংশ এবং ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে সম্মিলিতভাবে একাধিক উপাদান পর্যালোচনা তথা মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করলে বহুলাংশে এই শিল্পের অবলোকনকারী সমাজ বা সমকালীন সাধারণ মানুষের সমাজ সম্পর্কে হয়তো কিছু অংশে অনুমান করা সম্ভব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমকালীন সাধারণ মানুষের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রত্যক্ষ তথ্য রূপে কাজ করে আলোচ্য মৃৎফলকগুলি। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে কিভাবে এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে। পাশাপাশি অন্যান্য তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে সমকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব। এই অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচিত বিভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থেও সাধারণ মানুষের ইতিহাসের আভাষ মেলে। যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত প্রকাশিত হয়, যার মধ্য দিয়ে আলোচ্য পর্বে বাংলার সমাজে বিভিন্ন পেশাভুক্ত মানুষের উপস্থিতি তাঁদের সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় আচার বিধি প্রভৃতি বিবিধ দিক সম্পর্কে ধারণা মেলে। এই শিল্পের অবলোকনকারী সমাজ বিশ্লেষণ করতে হলেও কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার প্রেক্ষিতটি আবারও উঠে আসে। ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপোষকতার অনুসন্ধান সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা যায় বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য পরিসরে ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রধানত রাজকীয় উদ্যোগে, যদিও তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। পাশাপাশি অন্যান্য কিছু উপাদানের ভিত্তিতে অন্যান্য সমাজের শ্রেণীর সক্রিয় উপস্থিতিও পরিলক্ষিত হয় অনুদানকারী রূপে। তাহলে এই যে সার্বিক রূপে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিপুল পরিমাণ অনুদান এবং মানুষের অংশগ্রহণ, তাঁদের যেমন পৃষ্ঠপোষক রূপে পরিগণিত করছি তেমনই দর্শকের অভিধা

থেকেও কি তাঁদের বিচ্ছিন্ন করা যায়? সমাজের সাধারণ মানুষ যারা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন সেই কেন্দ্রেরই স্থাপত্যের দেওয়ালগাত্রে উপস্থাপিত টেরাকোটার অবলোকনকারী সমাজের মধ্যেই নিঃসন্দেহেই এসকল মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে অনুমান করতে পারি।

এই অবলোকনকারী সমাজ তথা সমকালীন সাধারণ মানুষের অবস্থান বা সমাজকে অন্বেষণ করতে হলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এসকল কেন্দ্রে দান হিসেবে প্রদত্ত বিপুল পরিমাণ লিপি সম্বলিত মহাযান বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী মূর্তি বা ভাস্কর্য। এই মূর্তিগুলির অনুদানকারীদের পর্যালোচনা করলে সমকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের উপস্থিতি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া সম্ভব। এই প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় বাংলার বিবিধ প্রত্নস্থল থেকে কিংবা প্রত্নস্থল ব্যতীত অন্যান্য কেন্দ্র থেকেও বিভিন্ন সময়ে আকস্মিকভাবে এরূপ লিপি সম্বলিত একাধিক দেবদেবী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং বাংলাদেশের বিবিধ মিউজিয়ামগুলিতে সেগুলি অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষিত। এই মূর্তি প্রদানকারীদের সামাজিক পরিচিতি সম্পর্কে বহু ক্ষেত্রেই আলোচনা হয়েছে।

এই শ্রেণীর দানের মধ্য দিয়ে দেখা যায় বিবিধ শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয় এই প্রক্রিয়ায়। অধ্যাপক বি.এন.প্রসাদ এই বৌদ্ধ মূর্তি বা ভাস্কর্য প্রদানকারীদের কয়েকটি শ্রেণী বিভাজন করে আলোচনা করেছেন যথা- বৌদ্ধভিক্ষু, বৌদ্ধ ভিক্ষুণী, মঠ এর বাইরে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী পুরুষ, মঠ এর বাইরে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী নারী, মঠের বাইরের দাতা পুরুষ যাদের বৌদ্ধ পরিচিতি সুস্পষ্ট নয়, মঠের বাইরের দাতা নারী যাদের বৌদ্ধ পরিচিতি সুস্পষ্ট নয় এবং শেষে অপরিচিত দাতা যাদের ধর্মীয় বা সামাজিক কোনও পরিচিতিই প্রকাশিত নয়।[379] এই বৃহৎ শ্রেণীবিভাজন থেকে খুব সহজেই ধারণা করা যায় এর ছত্রছায়ায় বিবিধ অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, বিবিধ লিঙ্গ, তথা সমাজের বিবিধ শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি কিন্তু অনুমান করা যায় যারা বৌদ্ধ বিহারে দান বা পৃষ্ঠপোষকতার সাথে সম্পর্কিত ছিল। চিত্রলেখা মুখোপাধ্যায় বৌদ্ধবিহারে দাতাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন পেশা গোষ্ঠী মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায় দানকারী হিসেবে, এমনকি সমাজের প্রান্তীয় গোষ্ঠীও এক্ষেত্রে অংশগ্রহন করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বিহারের আপনক মহাবিহারে থিসাভি নামক এক চর্মকার কর্তৃক বিষ্ণু মূর্তি দান

---

[379] প্রসাদ, *আর্কিওলজি অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ এশিয়া*, পৃষ্ঠা – ২৩৭-২৩৮

করার উল্লেখ করেছেন। আবার এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য দেবপালের রাজত্বকালে রাজগৃহতে এক নারী সগুক এবং উজক নামক এক পুরুষ কর্তৃক ধাতব উপাদান দানের কথা জানা যায় এবং উক্ত পুরুষটি ছিলেন পেশায় কুম্ভকার।[380] উক্ত কালপর্বে কুম্ভকার এবং মৃৎশিল্পীর মধ্যেকার পার্থক্যকে কতটা সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব বলা মুশকিল, এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে এই সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই ব্যক্তির উপস্থিতি তাঁর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং তাঁর পেশাগোষ্ঠীর প্রতিভূ রূপে তাকে তুলে ধরে যা নিঃসন্দেহে আলোচ্য পরিসরে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। একইভাবে স্বর্ণকার, স্থপতি প্রমুখ কর্তৃক দানের উদাহরণও তুলে ধরেছেন লেখিকা।

বাংলার সমতট অঞ্চলে বিশেষ রূপে পাওয়া যায় বণিকদের উপস্থিতি দান প্রদানকারী রূপে। যেহেতু আলোচ্য পর্বে বাণিজ্যিক দিক থেকে সমতট সমৃদ্ধ ছিল, এই অঞ্চলের বণিকরাও স্বাভাবিক রূপেই প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। ফলে যে কারণেই হোক, পুণ্য অর্জন হোক কিংবা সমাজে নিজেদের সম্মান বা প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা তাঁরা হয়তো নিজেদের দাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। যার মধ্যে তৈলক, সুরা ব্যবসায়ী প্রমুখের উপস্থিতি পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের সাথে বাণিজ্যের ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা সকলের জানা, আদি ঐতিহাসিক পর্বে যে শ্রেষ্ঠী-গহপতি রা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা সামাজিক স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সেই ধারাই হয়তো আদি মধ্যযুগীয় পর্বে বিভিন্ন পেশাজীবী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে অব্যাহত ছিল।[381] সমতটে এইরূপ লিপিযুক্ত তিনটি অবয়ব (৯৫৪-৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) পাওয়া যায় যার মধ্যে দাতা হিসেবে দুজন বৌদ্ধ অনুরাগীর (জম্ভলমিত্র ও বুধমিত্র) উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁদের প্রদত্ত অবয়বটি ছিল ব্রাহ্মণ্য গনেশ মূর্তি। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অধ্যাপক গৌতম সেনগুপ্ত যথার্থই প্রশ্ন করেছেন তাহলে এই বিপুল দানের প্রক্রিয়ার সামাজিক ভিত্তি কি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে?[382] ইতিপূর্বেও উল্লিখিত অধ্যাপক বি.এন.প্রসাদও তাঁর আলোচনায় এমন শ্রেণীর দাতার উল্লেখ করেছেন যাদের বৌদ্ধ পরিচিতি সুস্পষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য, অবলোকিতেশ্বর, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ

---

380 চিত্রলেখা মুখোপাধ্যায়, 'সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ডোনার্স ইন আর্লি মিডিএভাল বিহার অ্যান্ড বেঙ্গল', *প্রসেডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস*, খণ্ড- ৬৯ , (২০০৮), পৃষ্ঠা - ১৫০

381 তদেব, পৃষ্ঠা – ১৫০

382 গৌতম সেনগুপ্ত, 'ডোনার্স অফ ইমেজেস ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া (সি.৮০০ – ১৩০০ এডি.)", *প্রসেডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস*, খণ্ড- ৪৩(১৯৮২)পৃষ্ঠা- ১৬২

তে পাওয়া তারা মূর্তি প্রভৃতির দাতা ছিলেন এমন ব্যক্তিগন যারা ভিক্ষু বা প্রশাসনিক ব্যক্তি নন এবং তাঁদের বৌদ্ধ পরিচিতিও প্রকাশিত নয়।[383] পাশাপাশি তিনি এও উল্লেখ করেছেন বাংলা ও বিহারের এই বৃহৎ অংশ ছিল বহু ধর্মমতের অঞ্চল। জনগণের এক বৃহৎ অংশের কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচিতি ছিলনা। একই গ্রামের যেসকল মানুষ নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে কোনও দেবতার মূর্তি উপাসনা করছে তারাই আবার একত্রে বৌদ্ধ দেবতার অবয়বে শ্রদ্ধা অর্পন করছে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারাই প্রয়োজনীয় আচারাদি পালন করছে। ফলে এরম পরিস্থিতিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী না হয়েও বৌদ্ধ পরিসরে দান বা পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রটি হয়তো সাধারণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[384] তাহলে কি যথার্থই ধর্মীয় অনুদান বা পুণ্য অর্জন অপেক্ষাও সামাজিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠা, জনমানসে গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ক্ষেত্র বিশেষে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল? বৌদ্ধ বিহারগুলিতে ক্ষেত্র বিশেষে ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের উপস্থাপনা কিংবা বৌদ্ধবিহারের দেওয়ালগাত্রে উপস্থাপিত মৃৎশিল্পে বৌদ্ধ দেবদেবী উপস্থাপনার পাশাপাশি অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য তথা অবৌদ্ধ দেবদেবীর উপস্থাপনাও পরোক্ষভাবে এই চেতনারই ফল? এজাতীয় প্রশ্ন কিন্তু ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এছাড়াও বিবিধ প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ যথা- শাসক, বিচারক, মন্ত্রী প্রমুখ কর্তৃক প্রস্তর ভাস্কর্য প্রদানের সাক্ষ্য মেলে মহাস্থান তথা বাংলাদেশের উত্তরাংশে প্রাপ্ত বেশ কিছু ভাস্কর্যে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দান প্রদানকারী রূপে নারীদের উপস্থিতিও পরিলক্ষিত হয়, যদিও তাঁরা কোনও পেশাগোষ্ঠী হিসেবে উপস্থিত নেই। সাধারণত তাঁদের পুরুষ সঙ্গীর সাথে উল্লিখিত অথবা রাজপরিবারের কোনও নারীর দাতা হিসেবে একক উল্লেখ পাওয়া যায়।[385]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আদি মধ্য যুগীয় বাংলার একাধিক গোষ্ঠীর মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে। উদাহরণ স্বরূপ শ্রী চন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন এ (আনুমানিক ৯৩০ খ্রি) দেখা যায় ভূমিদান প্রাপক রূপে শিক্ষক, উপাধ্যায়, মহত্তর ব্রাহ্মণ, গণক,কায়স্থ, মালাকার, কুম্ভকার, তৈলিক, রজক, শঙ্খবাদক, চর্ম্মকার, সূত্রধার, কর্মকার, স্থপতি প্রভৃতি পেশাজীবী গোষ্ঠীর উল্লেখ

---

[383] প্রসাদ, *আর্কিওলজি অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ এশিয়া,* পৃষ্ঠা – ৩১০, টেবিল- ৫.১৪

[384] তদেব, পৃষ্ঠা – ২৩৯

[385] চিত্রলেখা মুখোপাধ্যায়, 'সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ডোনার্স ইন আর্লি মিডিএভাল বিহার অ্যান্ড বেঙ্গল', পৃষ্ঠা – ১৫২-১৫৩

রয়েছে যারা আদতে জাতিবর্ণ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলত সমকালীন বাংলার সাধারণ মানুষের সমাজ সম্পর্কে কিন্তু ধারণা দেয় এজাতীয় একাধিক উপাদান।[386] এর বিস্তৃত পরিচয় মেলে রিওসুকে ফুরুই এর বিস্তীর্ণ গবেষণায়, যিনি মুখ্যত অভিলেখ কেন্দ্রিক আলোচনা দ্বারা সমকালীন আর্থসামাজিক ইতিহাসের নব দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। দেখা যায় আলোচ্য পর্বে বাংলার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো একমাত্রিক ছিলনা, বিভিন্ন স্তরে তা বিভক্ত ছিল, বিভিন্ন পৃথক শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে নানাভাবে যুক্ত ছিল। কুটুম্বিন, মহত্তর এর ন্যায় ভূমিকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর পাশাপাশি সমাজে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক একাধিক জাতিগোষ্ঠীর (কুলিক বা কারিগর, কায়স্থ বা লিপিকার প্রভৃতি) উপস্থিতি ছিল, যারা আবার ক্ষেত্র বিশেষে ভূমি অর্থনীতি বা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথেও যুক্ত থাকত। এরই সাথে আরও একাধিক শ্রেণীর উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে যথা পামার, চন্ডাল যারা জাতিবর্ণ কাঠামোর খানিক নিচের দিকের স্তরে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলত বিভিন্ন স্তরের মানুষ যখন সম্মিলিতভাবে নির্দিষ্ট কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সেক্ষেত্রে উক্ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের চরিত্রে এক সংমিশ্রিত প্রভাবের উপস্থিতির সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। হয়তো তারই ফলশ্রুতি বৌদ্ধ বিহারের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় স্থাপত্যের শিল্পের বিষয়বস্তু রূপে অধিক মাত্রায় স্থান পেয়েছে সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বা সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের নানান উপাদান। সুতরাং সার্বিকরূপে বিচার করলে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার সাথে কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংযোগ স্পষ্টতই লক্ষ করা যাচ্ছে উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে, যারা নিঃসন্দেহে আলোচ্য মৃৎশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অবলোকনকারী সমাজের প্রতিভূ।

তবে এই বৌদ্ধ দেবদেবী মূর্তি দানের চরিত্র যে সর্বদা সমরূপ ছিল তা নয়। দানকারী ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেই অনুদান প্রদান করলেও এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। বহুক্ষেত্রেই দাতা সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে দানের পরিবর্তে কারও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে প্রদান করতেন কিংবা কখনো তিনি নিজেই সম্পূর্ণ নতুন বিহার বা মন্দির নির্মাণ করে সেখানে দান করেছেন। যখন নিজে বিহার বা মন্দির নির্মান করছেন তখন কি বলা যায় না যে বিহারের অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি দেওয়াল গাত্রে উপস্থাপিত মৃৎফলক নির্মাণের অবদানও তাঁর? উদাহরণ স্বরূপ

[386] ডি.সি.সরকার, ‘পশ্চিমভাগ প্লেট অফ শ্রীচন্দ্র’, ইয়ার ৫, *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা,* ভলিউম- ৩৭, খণ্ড- ৭, দিল্লী এ এস আই, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা - ২৮৯-৩০৪

অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার সোমপুর মহাবিহার যেমন পালরাজা ধর্মপালের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নির্মিত, ফলত উক্ত কেন্দ্রে প্রাপ্ত মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার সাথে বহুলাংশেই তাঁর নাম জড়িত বলে অনুমান করা যেতে পারে এবং ফলস্বরূপ পাহাড়পুরের মৃৎশিল্পে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবী, সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক দিনযাপন, প্রাকৃতিক ও প্রাণীজগৎ, প্রান্তীয় মানুষদের উপস্থিতি প্রভৃতি সবকিছুকে একত্রে তুলে ধরা হয়েছে। যেন জীবন ও সমাজের সবকিছুকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছায়ায়। পাশাপাশি অপর একটি বিষয় নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের আয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস থাকে সাধারণ মানুষের থেকে যথাযথ রাজস্ব আদায়, ফলত তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যতম পন্থাও যে তাঁদের জীবনযাত্রার উপস্থাপন, এও অসম্ভব নয়। আর বৌদ্ধধর্ম সর্বদাই জাতি বর্ণের উর্ধ্বে সাধারণ মানুষের আশ্রয়ের ক্ষেত্র, ফলত সেখানে এজাতীয় মিশ্রিত ঐতিহ্যের সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই কাম্য। পূর্বভারতের দেবদেবী মূর্তির দাতার আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক গৌতম সেনগুপ্ত অপর একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে জনপ্রিয় সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে স্থানীয় মানুষের অনুদানের পাশাপাশি তীর্থযাত্রী এবং নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এলাকার বাইরে থেকেও অনুদান আসত। কিন্তু যেসব কেন্দ্র বিশেষ জনপ্রিয় ছিলনা সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্থানীয় অনুদান এর উপরই তারা নির্ভরশীল ছিল।[387] অর্থাৎ আলোচ্য পর্বে সার্বিকভাবে বৌদ্ধ পরিসরে অনুদান, অনুদানকারীর বিস্তৃত অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় মৃৎশিল্প যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এই বিস্তৃত অনুদানকারীর আলোচনা থেকে হয়তো আমরা মৃৎশিল্পের অবলোকনকারী সমাজ বা সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষের সমাজ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারি।

আলোচনা প্রসঙ্গেই অপর একটি কথা বলা যায়, এইযে ভাস্কর্য প্রদানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন বা সামাজিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া সেক্ষেত্রে মুখ্যত প্রস্তর ভাস্কর্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে ধাতব ভাস্কর্যের উপস্থিতি থাকলেও মৃৎ ভাস্কর্য ব্রাত্য রইল কেন? তাহলে কি উক্ত সময়ে মৃৎশিল্পের সেই সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান প্রতিষ্ঠিত ছিলনা যা প্রদানে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত পুণ্য এবং পরিচিতি অর্জন করতে পারে বা বলা বাহুল্য সমাজে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে? যদিও উক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই প্রক্রিয়ার অংশ ছিল, কিন্তু পাশাপাশি প্রাপ্ত এক বিপুল সংখ্যক ভাস্কর্যে কিন্তু দানকারীর নাম বা পরিচয় সেভাবে পাওয়া যায়না ফলে সেগুলি

---

[387] সেনগুপ্ত, 'ডোনর্স অফ ইমেজেস ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া', পৃষ্ঠা- ১৬৩-১৬৪

কারা প্রদান করছে সেটি বহুলাংশেই অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু সকলের পক্ষে এই ব্যয়বহুল প্রস্তর মূর্তি অনুদান আদতেই কতখানি সম্ভবপর ছিল সেটি একটি প্রশ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেবল বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নয়, ব্রাহ্মণ্য পরিসরেও এই দানের পরিমাণ অজস্র এবং সেক্ষেত্রেও মৃৎ অবয়ব অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গেই অধুনা বাংলাদেশের মহাস্থান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মহাস্থান থেকে প্রাপ্ত একটি মৃৎ নির্মিত সূর্য মূর্তির (চিত্র-৭) উল্লেখ করা চলে, পূর্ববর্তী অধ্যায়েও যার আলোচনা করা হয়েছে। এর বাহ্যিক রূপায়ন বাংলার সাধারণ মৃৎফলক থেকে ভিন্ন এবং অনুমান করা চলে এর সাথে সম্ভবত ধর্মীয় উপাসনা জনিত চেতনা সম্পর্কিত ছিল। তাহলে এই মূর্তির উপাসনার চরিত্রকে কিভাবে দেখব? এরূপ কি অনুমান করা যায়, যেসকল ব্যাক্তি উক্ত প্রস্তর ভাস্কর্য প্রদানে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম ছিলেন না তারা পুণ্য অর্জনের আকাঙ্খায় বা মনস্কামনা পূরণে কি এজাতীয় মৃৎভাস্কর্য প্রদানে অগ্রসর হয়েছিলেন? কেননা মন্দিরে উপাসনার উদ্দেশ্যে নির্মিত মাটির মূর্তি কিন্তু এই পর্বে সেভাবে লক্ষণীয় নয়। তা সর্বদাই প্রস্তর বা ধাতু নির্মিত। আর এই প্রেক্ষিতটি বারংবারই সমকালীন সমাজে মৃৎশিল্পের সামাজিক অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। অর্থাৎ ধর্মীয় আচার বিধি কিংবা উপাস্য মূর্তি রূপে তা প্রচলিত নয়, কেবল মাত্র বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের বাহ্যিক দেওয়ালে অলংকরণের উদ্দ্যেশ্যে তার উপস্থাপন। এই ধারা সামগ্রীকরূপে সাংস্কৃতিক স্তরের কোন পর্যায়ে আলোচ্য মৃৎশিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করে তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখা প্রয়োজন। তাহলে বর্তমানে এই অবয়বটির গুরুত্ব কি? এরূপ অবয়ব আর সেভাবে লক্ষণীয় নয় কেন? এজাতীয় একাধিক প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায় আলোচ্য পরিসরে।

চিত্র- ৭ সূর্য অবয়ব, মহাস্থান – বগুড়া, বাংলাদেশ। সৌজন্যে- মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, মহাস্থান, বগুড়া, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত , সেপ্টেম্বর ২০২২

১.৩ বঙ্গীয় পরিসরে মৃৎশিল্পীর অনুসন্ধানঃ

যেকোনো শিল্পের আর্থসামাজিক ইতিহাস চর্চায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তাঁর নির্মাতা বা শিল্পী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'মৃৎশিল্পী' শব্দটি নিঃসন্দেহে এক বিস্তৃত পরিসরকে প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে মৃৎপাত্র, মৃৎ-অবয়ব, মাটির পুঁতি বা অলংকার নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি একাধিক আঙ্গিক যুক্ত থাকে কিন্তু বর্তমান লেখনীতে মৃৎশিল্পী বলতে নির্দিষ্ট রূপে আদি-মধ্যযুগে বাংলায় 'মৃৎভাস্কর'দের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হবে, যারা মূলত বাংলার পোড়ামাটি অবয়ব বা ভাস্কর্য নির্মাণের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পৃষ্ঠপোষক বা দর্শকের চরিত্র কিছু অংশে অনুমান করা গেলেও এই শিল্পীদের পরিচয় বা ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রটি অধিক সংশয়াত্মক। কেননা পৃষ্ঠপোষকের ন্যায় এক্ষেত্রেও সমরূপ সীমাবদ্ধতা

রয়েছে। এত বিপুল পরিসরে প্রসারিত মৃৎ ভাস্কর্যের নির্মাতাদের পৃথক স্পষ্ট উল্লেখ কোনও ঐতিহাসিক সূত্রে নেই, কোনও লিপি বা সাহিত্য ভাস্কর্য নির্মাণকারী রূপে মৃৎশিল্পীদের উল্লেখ করেনি। এমনকি ইতিহাসবিদরাও বাংলার পোড়ামাটি শিল্পীদের সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ উদ্যোগ দেখাননি, ফলে সমকালীন সমাজে তাঁদের উপস্থিতি বা অবস্থান অনুসন্ধানের প্রয়াস নিঃসন্দেহে আলোচ্য পরিসরে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রেক্ষিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যদিও গবেষণাপত্রটির প্রধান আলোচ্য সময়কাল আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ কিন্তু অদ্যাবধি আলোচনা থেকে স্পষ্টতই অনুমান করা যায় বাংলায় তাঁর বহু পূর্ব থেকেই মৃৎভাস্কর্যের উপস্থিতি ছিল যা স্বাভাবিক রূপেই তাঁর নির্মাতাদের সম্পর্কেও আগ্রহের উন্মেষ ঘটায়। আদি ঐতিহাসিক পর্বের গাঙ্গেয় উপত্যকার বিবিধ নগরকেন্দ্রগুলি থেকে সমৃদ্ধ পোড়ামাটি ভাস্কর্যের বিপুল সম্ভার মেলে; এগুলি তুলনামূলক ভাবে ছোট আকৃতির স্বাধীন ফলক যা মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ব্যবহারের সাথে জড়িত ছিল। অর্থাৎ আদি মধ্যযুগীয় মৃৎভাস্কর্য অপেক্ষা যার চরিত্র ভিন্ন কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন আসে তাঁর নির্মাতাই বা কারা ছিলেন? তাঁদের সূত্র অনুসরণ করে কি আদি মধ্যযুগীয় শিল্পীদের ইতিহাস অন্বেষণ সম্ভব? বাংলার আদি মৃৎশিল্পের শৈলীতে রপ্ত শিল্পীরাই কি ক্রমে সময়ের সাথে নিজ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে আদি মধ্যযুগীয় শৈলীর ভাস্কর্য বানিয়েছে? আর উভয় পর্যায়ের নির্মাতার চরিত্র বা সামাজিক অবস্থানের মধ্যে কি সুস্পষ্ট চারিত্রিক পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব? কিন্তু এক্ষেত্রেও নিশ্চিত তথ্য আমাদের হাতে নেই। এ প্রসঙ্গে একমাত্র উল্লেখ করা যায় এনামুল হকের কথা, আদি ঐতিহাসিক পর্বের বাংলার মৃৎশিল্প সম্পর্কিত আলোচনায় এনামুল হক তৎকালীন পোড়ামাটি শিল্পের সঙ্গে জড়িত পেশাজীবি সম্প্রদায় সম্পর্কে উল্লেখ করেন, শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত এসকল মানুষ সমাজে পুরোহিত বা বণিক সম্প্রদায়ের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শ্রেণীভুক্ত ছিলনা ঠিকই কিন্তু সমকালীন সামাজিক নানান খুঁটিনাটি ও বাস্তবিক দিকগুলির অনুধাবনে তারা অত্যন্ত দক্ষ ও সচেতন ছিলেন যা তাদের কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হত, যার দ্বারা তারা সমাজে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শিল্পীদের মধ্যেকার বিভাজনগত দিকের প্রতিও ইঙ্গিত দেন এবং রাজকুম্ভকারের উপস্থিতির সম্ভাবনার কথা বলেন। যারা সাধারণ বাজারের জন্য নয় বরং কিছু নির্দিষ্ট পৃষ্ঠপোষক যথা রাজপরিবার বা কোন শ্রেষ্ঠী পরিবারের স্বার্থে কাজ করতেন। ফলে তাদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে অধিক। তিনি আরও বলেন শিল্পীরা ছিল স্বাধীন,

সমকালীন রীতি প্রযুক্তি বা পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন অবয়বগুলিকে নিজের মত করে বর্ণনা করতেন।[388] যদিও এই মন্তব্যটি পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসের সকল পর্যায়ে এবং সার্বিক পরিসরে প্রযোজ্য না হওয়ার সম্ভাবনাই সর্বাধিক। যাইহোক, তার এই বক্তব্য দ্বারা তৎকালীন বঙ্গীয় মৃৎশিল্প ও শিল্পীদের সামাজিক গুরুত্ব সংক্রান্ত কিছু ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয় বলা বাহুল্য এবং সেক্ষেত্রে স্তরায়নেরও মেলে। এনামুল হকের এই আলোচনাটি ছাড়া মৃৎ ভাস্কর্য শিল্পীদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট আলোচনা কোনও পর্বেই সেভাবে লক্ষণীয় নয় বললেই চলে। কিন্তু তিনি কুম্ভকারদের উল্লেখ করলেও 'মৃৎ-ভাস্কর'দের উল্লেখ কিন্তু স্পষ্টরূপে করেননি। তাহলে কি অনুমান করা যায় সেসময় কুম্ভকারদের এক অংশই ক্রমে ভাস্কর্য নির্মাণে যুক্ত হয়েছিলেন যা পরবর্তী পর্বেও অব্যাহত ছিল? কিন্তু এরূপ অনুমান করা আদৌ কতখানি যুক্তিযুক্ত যে, মাটির কাজের সাথে যুক্ত এক বৃহৎ কারিগর গোষ্ঠী ছিল যাদের কেউ হয়তো মৃৎপাত্র বানাচ্ছে, কেউ খেলনা বানাচ্ছে আর তাঁদেরই একটা অংশ হয়তো মূর্তি বা ভাস্কর্য বানাচ্ছে? কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মৃৎপাত্র এবং মৃৎভাস্কর্য নির্মাণ প্রযুক্তিতে বিস্তর ফারাক। বাংলায় সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বিস্তৃত এই সমৃদ্ধ মৃৎভাস্কর্য কেবলই স্থানীয় কুম্ভকাররা নির্মাণ করতেন এ বিষয়টিও যথেষ্ট সংশয়াত্মক। যদিও বা ধরে নিই আদি ঐতিহাসিক পর্বের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নির্মিত মৃৎ-ভাস্কর্যগুলি প্রয়োজনানুসারে সাধারণ মানুষ কিংবা স্থানীয় কুম্ভকাররাই প্রাথমিকভাবে বানাতেন কিন্তু আদি মধ্যযুগীয় পর্বে যখন মৃৎ-ভাস্কর্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সেক্ষেত্রে তাঁর নির্মাতা গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে কি ততখানি বিমূর্ত রূপে নির্ধারণ করা যুক্তিপূর্ণ? এই ক্ষেত্রটি কিন্তু যথেষ্টই দ্বিধান্বিত থেকে যায়।

আলোচনা প্রসঙ্গে বলা চলে, বর্তমান লেখনীতে বাংলা ভাষায় 'শিল্পী' শব্দটি মৃৎ অবয়সমূহের নির্মাতা রূপে বারংবার উল্লিখিত হলেও প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে এর সংজ্ঞা ঠিক তেমন সহজ নয়। আর.এন.মিশ্র এই সম্পর্কিত তাঁর বিস্তৃত আলোচনায় দেখিয়েছেন গুপ্ত পরবর্তী পর্যায়ের একাধিক ভারতীয় লিপিসাক্ষ্যে মূলত কারিগর বা 'Artist' শ্রেণীর মধ্যে চার প্রকারের স্তরায়ন বা শ্রেণীবিভাজন রয়েছে। যার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে 'সূত্রধর' অর্থাৎ ক্ষোদক বা লেখক। এরপর ক্রমে রয়েছে 'বিজ্ঞানিক' অর্থাৎ যারা শিল্পশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন, এরপর রয়েছে 'শিল্পী' অর্থাৎ যারা বিবিধ কারুশিল্প

[388] এনামুল হক, *চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরাকোটাস,* স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, (ঢাকা,আই সি এস বি এ, ২০০১) পৃষ্ঠা- ৭৯-৮০

নির্মাণে সুদক্ষ ছিলেন। শেষে রয়েছে 'রূপকার' অর্থাৎ যারা মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণের সাথে যুক্ত ছিলেন তথা ভাস্কর,[389] যারা আদতে বর্তমান প্রবন্ধে মূল আলোচনার সাথে সম্পর্কিত বলা যায়। আমাদের অনুসন্ধান মৃৎভাস্করদের নিয়ে, এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কি মৃৎ ভাস্কর্য নির্মাতাদের উপরিল্লিখিত 'ভাস্কর' গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত? প্রসঙ্গত বলা চলে বিষয়টি ততখানি একরৈখিক নয়। শিল্পশাস্ত্রে মূলত প্রস্তর ভাস্কর্য নির্মাতাদের এই অভিধায় ভূষিত করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা ভাস্কর্য নির্মাণ ছাড়াও মন্দির নির্মাণের সাথেও যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে ধাতব মূর্তি নির্মাণকারীদের পরিচিতি প্রসঙ্গে 'পিতলকার' শব্দের উপস্থিতি রয়েছে যারা রূপকার এর সমকক্ষ ছিলেন এবং পার্থক্য ছিল কেবল তাঁদের শিল্পমাধ্যমে। উল্লেখ রয়েছে 'স্থপতি'র ও, যারা বিবিধ স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণের সাথে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও শিল্প ও স্থাপত্যকলায় যুক্ত একাধিক শ্রেণীর পরিচয় মেলে যথা- বর্ধকী, তক্ষক, রূপদক্ষ ইত্যাদি।[390] এছাড়াও আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিবিধ লিপিসাক্ষ্যে একাধিক কারিগর শ্রেণীর উল্লেখ মেলে যথা- সুগন্ধী শিল্পী, বয়নশিল্পী, রং শিল্পী, উদ্যানপালক প্রমুখ যারা মূলত অনুদানকারী রূপে উল্লিখিত হয়েছে। আর.এন.মিশ্র উল্লেখ করেছেন আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের লিপিসাক্ষ্যে অত্যন্ত নিম্ন পেশাগোষ্ঠীরও উল্লেখ ছিল কিন্তু আদি মধ্য যুগে তা পরিবর্তিত হয়। ইতিপূর্বের উল্লিখিত বহু কারিগর গোষ্ঠীকে আদি মধ্যযুগীয় অভিলেখ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ব্রাহ্মণ্য বর্ণ ব্যবস্থার প্রভাবে[391]। অর্থাৎ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় শিল্পী বা ভাস্করের পরিচিতির মধ্যে মৃৎকারিগর এর কিন্তু নির্দিষ্ট পরিচিতির উল্লেখ নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা সহ আদি মধ্য যুগের সামগ্রিক ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায় বিবিধ পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী বা কারিগর বা ভাস্কর শ্রেণী উপস্থিত থাকলেও নিশ্চিত রূপে মৃৎ কারিগর অনুপস্থিত। বিবিধ সূত্রে এসকল পেশাভিত্তিক জাতিগোষ্ঠীর উপস্থিতি, বিবিধ পরিসরে দানকারী রূপে এসকল শ্রেণীর উপস্থিতি যা অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে সমাজে

---

389 আর.এন.মিশ্র, *শিল্প ইন ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন,* নিউ দিল্লী, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি অ্যান্ড আরিয়ান বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৯০-৯৭

390 তদেব, পৃষ্ঠা- ৯০-৯৭

391 আর.এন.মিশ্র, *এনসিয়েন্ট আর্টিস্টস অ্যান্ড আর্ট অ্যাক্টিভিটিস* ,ইন্ডিয়ান (ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডি, সিমলা, ১৯৭৫)

তাদের অর্থনৈতিক পরিচিতির দিকটিকে প্রতিষ্ঠিত করে। অথচ সুদূর প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে বাংলায় এত সুপ্রসারিত মৃৎশিল্পের উপস্থিতি থাকা স্বত্ত্বেও উক্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মৃৎশিল্পীর উল্লেখ নেই। কিন্তু প্রশ্ন আসে কেন? তাহলে কি বলতে হয় উপরিল্লিখিত পেশাজীবী গোষ্ঠীর ন্যায় মৃৎ ভাস্কর্য শিল্পীরা তাঁদের পরিচিতি নিয়ে সুস্পষ্টভাবে তখনও সমাজে পেশাজীবী গোষ্ঠী রূপে আকার ধারণ করতে পারেনি, বা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিচিতি লাভ করতে পারেনি যার ফলে তথাকথিত জাতি বর্ণ কাঠামোর বাইরে অবস্থান করছিল তাঁরা? যে বর্ণ কাঠামোয় চণ্ডাল এর ন্যায় ঘোষিত নিম্নবর্ণ কিংবা চর্মকার, মালাকার এর ন্যায় অত্যন্ত সাধারণ পেশাভুক্ত গোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল অথচ দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্রমপ্রবহমান এক শিল্পের নির্মাতারা তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি? কুম্ভকার গোষ্ঠীর সার্বিক পরিচিতির আড়ালে মৃৎ ভাস্কররা কি অন্তর্হিত হয়ে পড়েছিল? আর সেকারণেই কি কোনও লিখিত উপাদানে তাঁরা অনুপস্থিত? পাশাপাশি এরূপ অনুমান কি যুক্তিযুক্ত যে, উপস্থাপিত মৃৎশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত কোনও গোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে এধরণের শিল্প নির্মাণে ভূমিকা পালন করত? যদিও এই শিল্পের ব্যাপকতা ও সমৃদ্ধি দেখে তা প্রায় অসম্ভবই মনে হয়। ফলত সুদীর্ঘ কালব্যাপী বাংলায় চলে আসা পোড়ামাটি শিল্প এবং মৃৎ-ভাস্করদের সামাজিক অবস্থান বা উপস্থিতির ক্ষেত্রটিকে কোথায় দাঁড় করায় তা একটি অন্যতম প্রশ্ন।

এই সূত্রেই বলা চলে তাহলে কি সত্যিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সুদূর প্রায় ঐতিহাসিক পর্ব থেকে বাংলা তথা ভারতীয় পরিসরে মৃৎ ভাস্কর্য শিল্পের জনপ্রিয়তা থাকলেও মৃৎ ভাস্কর রূপে কোনও সুসংবদ্ধ পরিচিতি আদি মধ্য যুগীয় কালপর্বেও উপস্থিত ছিলনা? কিন্তু নির্দিষ্ট পেশাজীবী রূপে পরিচিতি বা পদের অনুসন্ধান না থাকলেও উক্ত ভাস্করের যে অস্তিত্ব ছিলনা এমন ধারণা করে নেওয়া হয়তো যথেষ্টই সরলীকরণ সিদ্ধান্ত। কেননা যে সমৃদ্ধ শৈল্পিক উপস্থাপনা, দৈহিক বিন্যাশ, গভীর চিন্তন, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ক্রমপ্রবাহমানতা বাংলার মৃৎশিল্পে লক্ষ্য করা যায় তা মৃৎ ভাস্করদের অনুপস্থিতির ধারণাটিকে বহুলাংশেই নস্বাৎ করে।

এই সূত্রেই উল্লেখ করা চলে সমকালীন বাংলার অন্যান্য কিছু ভাস্কর্য শিল্প ও তাঁদের নির্মাণ প্রক্রিয়ার কথা। আলোচ্য কালপর্বে বাংলার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় একাধিক উপাঞ্চলের উপস্থিতি রয়েছে, যেখানে একাধিক মাধ্যম ও শৈলীর ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটেছে যারা ক্ষেত্রবিশেষে স্বকীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও তারা যখন প্রায় সমজাতীয় সামাজিক-

সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক পরিসরে বিকাশ লাভ করে সেগুলিকে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রূপে আলোচনা করা হয়তো আদতেই সম্ভবপর নয়। আদি মধ্যযুগীয় বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে মৃৎভাস্কর্যের পাশাপাশি যে নামগুলি উঠে আসে মূলত প্রস্তর ভাস্কর্য, স্টাকো ভাস্কর্য এবং ধাতব ভাস্কর্য। এদের সকলের মধ্যে সংযোগের প্রধান ক্ষেত্র হল আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় এগুলি সবই উপস্থাপন ক্ষেত্র বা উপাদানের নিরিখে সমকালীন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল তথা মূলগত রূপে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। যদি উদ্দেশ্য বা উপস্থাপনাগতভাবে দেখা হয় প্রস্তরভাস্কর্য এবং ধাতব ভাস্কর্যগুলি মূলত ধর্মীয় রীতিনীতি বা উপাস্য অবয়ব হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে ধারণা করা হয়। অপরদিকে বাংলা তথা পূর্ব ভারতীয় বিবিধ প্রত্নস্থল লক্ষ্য করলে দেখা যায় স্টাকো এবং মৃৎভাস্কর্যগুলি মূলত বিহারের চতুর্দিকের বহির্দেওয়ালে উৎকীর্ণ ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমানে প্রস্তর ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবেনা, কেননা বাকিগুলি অপেক্ষা তার বাহ্যিক উপস্থাপনা, নির্মাণ প্রযুক্তি, বা কারিগরি তুলনামূলকভাবে পৃথক। বাংলার শিল্প ইতিহাস চর্চায় প্রস্তর শিল্প এক বিশেষ মর্যাদায় আসীন। পাল-সেন ভাস্কর্য ঘরানার কেন্দ্রেই রয়েছে মূলত প্রস্তর ভাস্কর্য। যাইহোক, এক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক রূপেই প্রশ্ন আসে মাটির মূর্তি নির্মাতাদের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে অন্যান্য এই শিল্পের উল্লেখ কেন? এর উত্তরে শুরুতেই বলা যায় এদের কারিগরি বা নির্মাণ প্রযুক্তির বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথমেই স্টাকো অবয়ব প্রসঙ্গে বলা যায় অবিভক্ত বাংলা তথা অধুনা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ এর অন্তর্গত বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্রে আনুমানিক পঞ্চম-ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শতকে এই শিল্পের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে বাংলায় বিশেষত কর্ণসুবর্ণ এবং মোগলমারি এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এই দুই কেন্দ্র থেকে বিপুল পরিমাণ স্টাকো ভাস্কর্য পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাড়িডাঙা থেকে এক শ্রেণীর স্টাকো নির্মিত বেশ কিছু মস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। (চিত্র-৮) অমিতা রায় এগুলি সম্পর্কে বলেছেন অবয়বগুলির আনুমানিক সময়কাল পঞ্চম ষষ্ঠ থেকে অষ্টম-নবম শতাব্দী এবং এগুলি আদতে মনুষ্য প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট এবং রয়েছে বুদ্ধ মুখাবয়ব যাদের মৌখিক উপস্থাপন ভঙ্গীতে হেলেনীয় চরিত্র সুস্পষ্ট।[392] অধুনা বাংলাদেশের পাহাড়পুর, ময়নামতীতেও এধরনের স্টাকো মস্তকের অস্তিত্ব

[392] অমিতা রায়, 'সাম স্টাকো স্কাল্পচার ফ্রম রাজবাড়িডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ', *জার্নাল অফ দ্য বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম*, রাজশাহী বাংলাদেশ: ইউনিভার্সিটি অফ রাজশাহী, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা- ৩৫

মেলে।[393] আবার ময়নামতীতে ইটাখোলা মুড়া থেকে ধ্যানী তথাগত অক্ষোভ্যের অবয়ব আবিষ্কৃত হয়েছে।[394] (চিত্র-৯) এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ করা চলে সাম্প্রতিক পর্বে বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টাকো কেন্দ্র বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মোগলমারি শ্রী বন্দক মহাবিহারের কথা। বিবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই বৌদ্ধ বিহারটিকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সময়সীমার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়।[395] এই বৌদ্ধবিহারের পূর্বদিকের প্রাচীরগাত্রে বিস্তৃত অংশ জুড়ে উপস্থাপিত স্টাকো অলংকরণ, যেখানে মূলত প্রস্ফুটিত পদ্ম, পিরামিডের আকৃতি, জ্যামিতিক নকশার প্রভৃতি উপস্থিতি লক্ষণীয়। মোগলমারির স্টাকো অলংকরণের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হল ঢিবির কেন্দ্রের পশ্চিমমুখী দেওয়ালে গ্রন্থিত বৃহদাকার স্টাকো নির্মিত মূর্তিগুলি। যার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য দেবতা কুবের(যিনি আদি মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ ধর্মেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন), বোধিসত্ত্ব, সর্পদেবী, নৃত্যরত যুগলমুর্তি, গনমূর্তি প্রভৃতি বিবিধ অবয়ব পরিলক্ষিত হয়।[396] (চিত্র-১০)

---

393 তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬

394 অর্ণব চ্যাটার্জী, 'পূর্ব ভারতের স্টাকো শিল্প' , *ইতিহাস অনুসন্ধান,* (সম্পা. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়) কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০২৩, পৃষ্ঠা-১৩২

395 অশোক দত্ত, রজত স্যান্যাল, 'মোগলমারি উৎখনন: একটি প্রতিবেদন', *মোগলমারির বৌদ্ধমহাবিহার বিবিধ প্রসঙ্গ,* (সম্পা. সূর্য নন্দী), কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১৬ পৃষ্ঠা- ৪২

396 তদেব, পৃষ্ঠা-৪২

চিত্র- ৮ স্টাকো অবয়ব, রাজবাড়িডাঙা, সৌজন্যে- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

চিত্র-৯ স্টাকো অক্ষোভ্য, ইটাখোলা মুড়া, ময়নামতী, বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত, সায়নী রায়, সেপ্টেম্বর, ২০২২

চিত্র-১০ স্টাকো প্যানেল, মোগলমারি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ,

সায়নী রায়,ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত, ফেব্রুয়ারি, ২০২০

এছাড়া সাম্প্রতিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আদি মধ্যযুগীয় পুরাকেন্দ্র কঙ্কণদিঘি অঞ্চলে উৎখননের ফলে কিছু স্থাপত্যগাত্র স্টাকো যৌগ দ্বারা প্লাস্টার করা এবং স্টাকোর প্রলেপ দেওয়া ইট পাওয়া গেছে।[397] অর্থাৎ আলোচ্য পর্বে বাংলায় এই শিল্পের সমৃদ্ধ উপস্থিতির ইঙ্গিত পাই এসকল পুরাতাত্ত্বিক প্রাপ্তি থেকে। নালন্দায় বিবিধ ভঙ্গীতে বোধিস্বত্ত্ব যথা মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, তারা, অবলোকিতেশ্বর, জাতকের কাহিনী, বুদ্ধের জীবনীর বিভিন্ন কাহিনী সম্বলিত একাধিক অবয়বের

[397] দুর্গা বসু, 'আর্লি মেডিএভাল মেটেরিয়াল কালচার অফ কোস্টাল বেঙ্গল উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দ্য সাইট অফ কঙ্কণদিঘি', *রিলিজিয়ন, ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড মেটেরিয়াল কালচার ইন প্রি- মডার্ন সাউথ এশিয়া* (সম্পা. তিলোত্তমা মুখার্জী ও নূপুর দাশগুপ্ত) লন্ডন অ্যান্ড নিউইয়র্ক: রাটলেজ ২০২৩, পৃষ্ঠা- ২৬২-২৬৩

উপস্থাপনা রয়েছে।[398] অন্যদিকে বোধগয়া, অন্সর, মনিয়র মঠ প্রভৃতি বিহারের কেন্দ্রগুলিও এই শিল্পের জন্য সুপরিচিত।[399] কিন্তু স্বল্প পরিসরে সবকিছু উল্লেখ করা সম্ভব নয়।[400]

কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বাধিক যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল 'স্টাকো' বলতে আদতে কি বোঝায়? আলোচ্য পরিসরে তাঁর প্রাসঙ্গিকতাই বা কি? স্টাকো শিল্পে সাধারণত চুনের সাথে মার্বেলের গুঁড়ো (কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিপসাম),বালি, আঠা ও জল মিশিয়ে মণ্ড আকারে তৈরি করা হত। তারপর অর্ধকঠিন অবস্থায় এই মন্ডকে প্রয়োজনীয় আকার ও আকৃতির ছাঁচে ঢেলে অথবা হস্তনৈপুণ্যে বিভিন্ন ধরণের ভাস্কর্য নির্মাণে অথবা অলংকরণে ব্যবহার করা হত।[401] এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়, গুপ্ত পর্বে কাদা ও কংক্রিটের মূল ভিত্তি তৈরি করে তার ওপর চুনের প্লাস্টার ব্যবহৃত হত বিভিন্ন বাহ্যিক আকৃতি যথা অবয়ব, ফুল, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি প্রস্তুতকরণের জন্য। আর পরবর্তীকালে পাল পর্বে ভেতরের মূল অবয়বের ভিত্তিটি প্রস্তুত হত মাটি বা পোড়ামাটি, গোবর ও শস্যের তুষ প্রভৃতির সমন্বয়ে এবং শেষে চুনের প্লাস্টারের প্রলেপ দেওয়া হত।[402] অর্থাৎ লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে স্টাকো অবয়ব নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে পাল -সেন যুগে প্রথমে মাটির অবয়ব বানানোর প্রবণতা প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ নালন্দার সরাই ঢিবি কেন্দ্রে একটি বৃহৎ মৃৎ নির্মিত বুদ্ধ অবয়ব মেলে যার ওপর চুনের মোটা প্রলেপ দেওয়া রয়েছে।[403]

---

[398] শচীন কুমার তিওয়ারি, 'স্টাকো আর্ট অফ নালন্দা, এক্সকাভেটেড সাইট, ডিসট্রিক্ট নালন্দা, বিহারঃ অ্যান আর্কিওলজিক্যাল ওভারভিউ', *অ্যানালস অফ আর্কিওলজি,* প্রথম খন্ড, প্রথম সংস্করণ, নিউ দিল্লী গ্র্যাহওয়া পাবলিকেশন, ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৭-১৮

[399]গৌতম সেনগুপ্ত, 'স্টাকো স্ট্যাচুয়ারি ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া', *অক্ষয়নীভী,* (সম্পা. গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য),নিউ দিল্লী: শ্রী সতগুরু পাবলিকেশনস,১৯৯১ পৃষ্ঠা-২৮৮

[400] দ্রষ্টব্য: এই সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনার জন্য আরও দেখুন- গৌতম সেনগুপ্ত, 'স্টাকো স্ট্যাচুয়ারি ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া', *অক্ষয়নীভী,* (সম্পা. গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য),নিউ দিল্লী: শ্রী সতগুরু পাবলিকেশনস,১৯৯১
সায়নী রায়, 'প্রাচীন বঙ্গীয় স্টাকো শিল্প: একটি পর্যালোচনা', অধ্যাপক ড. সামিনা সুলতানা সম্পাদিত ইতিহাস প্রবন্ধমালা, ঢাকা, ইতিহাস একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০২৪

[401] অশোক দত্ত, রজত স্যান্যাল, 'মোগলমারি উৎখনন: একটি প্রতিবেদন', *মোগলমারির বৌদ্ধমহাবিহার বিবিধ প্রসঙ্গ,* (সম্পা. সূর্য নন্দী), কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১৬ পৃষ্ঠা- ৪১

[402] তিওয়ারি, 'স্টাকো আর্ট অফ নালন্দা, পৃষ্ঠা- ১৬-১৭

[403] তদেব, পৃষ্ঠা-১৭

অন্যদিকে উল্লেখ করা চলে ধাতব ভাস্কর্যের কথা। বাংলায় অতি প্রাচীন কাল থেকেই গ্রামীন ও উপজাতিক পরিসরে ধাতব কারিগরির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যে এর উপস্থিতি পাই আদি মধ্য যুগ থেকে। যেখানে পাল-সেন ভাস্কর্য ঘরানায় এক উল্লেখযোগ্য নাম ব্রোঞ্জ তথা ধাতব মূর্তি এবং আদি মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ধাতব ভাস্কর্য নির্মাণকারী সম্প্রদায় পেশাজীবী জাতিগোষ্ঠী রূপে যথেষ্ট সুস্পষ্ট রূপে উল্লিখিত।[404] যা সমাজে তাঁদের সুপরিচিতি এবং মর্যাদার দিকটিকে যথার্থই প্রকাশিত করে। ভারতের বিহার সংগ্রহালয়, অধুনা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহালয়, ভারতীয় যাদুঘর, বাংলাদেশের ন্যাশনাল মিউজিয়াম সহ বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রের মিউজিয়ামে অজস্র ধাতব বা ব্রোঞ্জ এর মূর্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যা সমকালীন সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তার কথা তুলে ধরে এবং তাঁদের বিষয়বস্তু মূলত ছিল বৌদ্ধ(মৈত্রেয়, ধ্যানীবুদ্ধ, তারা, অবলোকিতেশ্বর ও অন্যান্য), ব্রাহ্মণ্য(শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, চামুণ্ডা ও অন্যান্য) ও জৈন ধর্মের বিবিধ দেবদেবীর উপস্থাপনা। ধাতব মূর্তি প্রাপ্তির কেন্দ্র রূপে বিহারের নালন্দা, কুরকিহার, অ্যান্টিচক ইত্যাদি, পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুর, (চিত্র-১১) সাগরদিঘী, এবং অধুনা বাংলাদেশের পাহাড়পুর, মহাস্থান, রংপুর এবং বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশ তথা সমতট-হরিকেল অঞ্চল যথা ময়নামতি, (চিত্র-১২) এবং চিটাগাং এর ঝিওয়ারি অঞ্চল। ঝিওয়ারির গুরুত্বই তাঁর ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের জন্য, এই অঞ্চল থেকে বাংলায় প্রাপ্ত সবচেয়ে বৃহৎ ধাতব ভাস্কর্যের ভাণ্ডার পাওয়া যায় যার মধ্যে আদি মধ্যযুগীয় প্রায় ৬১ টি ব্রোঞ্জ নির্মিত মহাযান বৌদ্ধ অবয়ব পাওয়া যায়।[405] বিপুল ধাতব মূর্তি প্রাপ্তির পাশাপাশি শিল্পসাস্ত্রে 'পিতলকার' শ্রেণীর উপস্থিতি এর সামাজিক গুরুত্বকে যথার্থই প্রতিফলিত করে।

---

[404] নূপুর দাশগুপ্ত, 'আ সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ মাইনর টেকনলজিস' ইন রতন লাল হাংলু সম্পাদিত *হিস্ট্রি অফ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি,* (নিউ দিল্লী, রাওয়াত পাবলিকেশন, ২০১১), পৃষ্ঠা- ৬৩

[405] রমা চ্যাটার্জী, 'ইম্পরট্যান্ট হোর্ডস অ্যান্ড ফাইন্ডস', শিশির কুমার মিত্র সম্পাদিত, *ইষ্ট ইন্ডিয়ান ব্রোঞ্জেস,* (কলকাতা, সেন্টার অফ অ্যাডভানস স্টাডি ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার,১৯৭৯) পৃষ্ঠা- ১২৫-১২৯

চিত্র-১১ ব্রোঞ্চ নির্মিত মারিচী অবয়ব, জগজ্জীবনপুর, ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ডিসেম্বর ২০২৪

চিত্র-১২ ময়নামতী জাদুঘরে প্রদর্শিত ব্রোঞ্চ নির্মিত তারা ও প্রজ্ঞাপারমিতা অবয়ব, ময়নামতী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ

সৌজন্যে- ময়নামতী জাদুঘর, সায়নী রায়, ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্তেম্বর,২০২২

এক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল তাঁর নির্মাণ পদ্ধতি। এই ধাতব মূর্তি নির্মাণের রীতি পদ্ধতি কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে অতি সুস্পষ্ট যার বাহ্যিক প্রকাশ বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হয় পাল-সেন ধারার ভাস্কর্য রীতির মধ্যে। অধিকাংশ মূর্তি নির্মিত হয়েছে Cire perdue বা Lost Wax পদ্ধতিতে যার উল্লেখ বিবিধ সংস্কৃত সাহিত্যে রয়েছে যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য মানসার, বিষ্ণু সংহিতা, মানসোল্লাস, শিল্পরত্ন প্রভৃতি গ্রন্থ। তবে এক্ষেত্রে প্রথম এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ কল্যাণের চালুক্য রাজা সোমেশ্বরের *মানসোল্লাস* (১১৩১ খ্রিস্টাব্দ)। এই গ্রন্থে ধাতব মূর্তি নির্মাণ প্রযুক্তির বিস্তৃত উল্লেখ বর্ণিত রয়েছে। আদি মধ্যযুগীয় শাস্ত্রসমূহে সাধারণত দেখা যায় ধাতব মূর্তি নির্মাণে দুই ধরণের পদ্ধতি ব্যবহৃত হত, solid casting এবং hollow casting. মানসোল্লাসে মূলত solid casting এর উল্লেখ রয়েছে যার সারমর্ম করলে দেখা যায় যথাযথ রূপে প্রতিমা লক্ষ্মণ শাস্ত্রের মূর্তি নির্মাণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রথমে মোমের মূর্তি কাঠামো বানিয়ে তাঁর পেছন দিকে কাঁধ বরাবর একটি নালীপথ বানানো হত। এরপর মাটি, ধানের তুষ, ছোট কাপড়ের অংশ, লবণ ইত্যাদি সহযোগে কাদার মিশ্রন প্রস্তুত করা হত এবং মোমের কাঠামোর উপর ক্রমে তিনবার মাটির প্রলেপ দিয়ে তা শুকনো করা হত। মাটির প্রথম স্তর হত অত্যন্ত পাতলা এবং তা ছায়াতে শুকনো করা হত, তার কিছুদিন পরপর ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মৃৎ প্রলেপ দেওয়া হত। তারপর উক্ত মৃৎ অবয়বটি পোড়ানো হত এবং নালীপথ দিয়ে মোম গলে বেরিয়ে এলে উক্ত পথে তরল ধাতু প্রবেশ করানো হত এবং ঠাণ্ডা করা হত। পরবর্তীতে অতি সতর্কতার সাথে মাটির ছাঁচ ভেঙে ধাতব মূর্তি বের করা হত। এটি solid casting যার পদ্ধতি মানসোল্লাসে বর্ণিত।[406] এই পরিসরের অপর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *মানসার* [407] এও প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতে ধাতব মূর্তি নির্মাণ প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। দক্ষিণ ভারতে বিশেষত তামিলনাড়ুতে আজও প্রতিমা শিল্পীরা এই পদ্ধতি অনুসরন করেন।[408]

---

[406] সরসী কুমার সরস্বতী, 'অ্যান এনসিয়েন্ট টেক্সট অন দ্য কাস্টিং অফ মেটাল ইমেজেস', *জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট*, খণ্ড- ৪, নং-২, (১৯৩৬), পৃষ্ঠা- ১৩৯-১৪৪

[407] দ্য ফার্স্ট কাস্টিং অফ দ্য ইমেজেস, চ্যাপটার- LXVIII, পি.কে. আচার্য সম্পাদিত, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার একর্ডিং টু মানসার শিল্পশাস্ত্র*, খণ্ড-২, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা- ৮৬-৮৭

[408] অশোক কুমার ভট্টাচার্য, 'আ স্টাডি ইন টেকনিক', শিশির কুমার মিত্র সম্পাদিত, *ইষ্ট ইন্ডিয়ান ব্রোঞ্জেস*, (কলকাতা, সেন্টার অফ অ্যাডভানস স্টাডি ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার,১৯৭৯) পৃষ্ঠা- ৬৪

অন্যদিকে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সাথে প্রারম্ভে আরেকটি ধাপ যুক্ত হত, সেখানে প্রথমে মাটির কাঠামো নির্মাণ করে তাঁর উপর মোমের প্রলেপ দিয়ে তার উপর আবার মাটির প্রলেপ দিয়ে বাকি পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। যার ফলে ভেতরের উক্ত মৃৎ কাঠামো সরিয়ে দিলে একটু ফাঁপা ধাঁচের ধাতব অবয়ব নির্মিত হত, যাকে বলা হয় hollow casting.[409] দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তর ভারতে এই পদ্ধতি অধিক প্রচলিত ছিল, যার উল্লেখ মেলে শ্রীকুমারের *শিল্পরত্ন* গ্রন্থে। এই গ্রন্থে আবার মাটির নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও প্রকারভেদ রয়েছে, যেখানে খুব শক্ত মাটি, মধ্যম প্রকৃতির মাটি, নরম মাটি ইত্যাদি মোট পাঁচ প্রকার মাটি এবং তা প্রস্তুতকরণের প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে।[410] যা ধাতুর পাশাপাশি মাটির প্রয়োগ বা কারিগরি সম্পর্কিত জ্ঞানেরও ইঙ্গিত দেয়।

এক্ষেত্রে এই উপরিউক্ত আলোচনায় মূল যে লক্ষণীয় বিষয় তা হল মাটির ব্যবহার। ধাতব অবয়ব বা স্টাকো উভয় ক্ষেত্রেই ভাস্কর্যের ভিত্তি স্বরূপ মাটির কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ মৃৎ ভাস্কর্যের নির্মাণকারীদের উপস্থিতি বিমূর্ত। তাহলে কি এটা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত, যে ব্যক্তি ধাতব ভাস্কর্য বানাচ্ছে সেই আবার মৃৎ ভাস্কর্যও বানাচ্ছে? কিংবা মৃৎভাস্কররাই কি ক্রমে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বা নির্ধারিত মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার লক্ষে ধাতব ভাস্কর্যের দক্ষতাও অর্জন করেছে? কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে পৃথক জ্ঞানের প্রয়োজন। বাংলার গ্রামীণ মৃৎশিল্পীর ধাতব মূর্তি নির্মাণের জটিল পদ্ধতি রপ্ত করা যথেষ্টই কঠিন। লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা যায় ধাতব মূর্তির ছাঁচ হিসেবে নির্মিত মৃৎ অবয়ব এবং স্থাপত্যিক অলংকরণের অঙ্গ রূপে নির্মিত মৃৎ ফলকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তাহলে কি অনুমান করা চলে একেক শিল্পের সাথে একাধিক কারিগর যুক্ত ছিলেন এবং সামগ্রিক ভাবেই এক ভাস্কর গোষ্ঠীরূপে কাজ করছিলেন তারা? তাহলে এই বিপুল পরিসরে মৃৎ অবয়ব নির্মাণের ধারা বা তার নির্মাতার সামাজিক অবস্থানকে কোন পর্যায়ে রাখা যথার্থ? এই সকল শিল্পের যে মূল কাঠামো মাটি দিয়ে তৈরি হচ্ছে তার নির্মাতা আর উক্ত টেরাকোটা ভাস্কর্যের নির্মাতাকে কি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে নির্ধারণ করা যায়? তাহলে কি বলতে হয় মাটি অপেক্ষা ধাতু (ব্রোঞ্জ, পিতল ইত্যাদির) সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বা মর্যাদা উচ্চতর ছিল? এবং সেই ধাতব ভাস্কর বা কারিগরের পরিচিতির আড়ালে তাই মৃৎ কারিগর এর পরিচয় সুপ্ত থেকে গেছে? তাহলে কি এই

[409] দাশগুপ্ত, 'আ সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ মাইনর টেকনলজিস', পৃষ্ঠা- ৬৩-৭১

[410] ভট্টাচার্য, 'আ স্টাডি ইন টেকনিক', পৃষ্ঠা- ৬৪

তিন ভাস্কর্য কারিগরদের কেন্দ্র করে সামগ্রিক রূপে আলোচ্য কালপর্বে বাংলায় ভাস্করের ধারণা গঠন করা সম্ভব? এও এক প্রশ্ন। যার যথাযথ উত্তর হয়তো আমাদের জানা নেই।

পাশাপাশি অপর একটি বিষয় উল্লেখ করা চলে এই প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটির বাইরে গিয়েও যদি এই শিল্পগুলির বাহ্যিক উপস্থাপনা লক্ষ করা যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলার মৃৎভাস্কর্য এবং মোঘলমারি বা নালন্দার স্টাকোর উপস্থপনা বা উৎকীর্ণ মূর্তির অঙ্গসৌষ্ঠবও কিন্তু বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয়ই মন্দির বা বৌদ্ধবিহারের দেওয়ালগাত্রে প্যানেল রূপে উৎকীর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলায় চিরকালই পাথর ছিল অপ্রতুল এবং প্রস্তর ভাস্কর্য নির্মাণ কার্য যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ও জটিল। অন্যদিকে প্রস্তর অপেক্ষা যেহেতু স্টাকো যৌগ ছিল অপেক্ষাকৃত নমনীয় যা দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণ প্রস্তর অপেক্ষা ছিল সহজসাধ্য অথচ তার রূপবিন্যাশ বা স্থায়িত্ব ধ্রুপদী প্রস্তর ভাস্কর্যের ন্যায়। ফলে একদিকে বৃহৎ ভাস্কর্য নির্মাণ ধারার চাহিদা আর অন্যদিকে অলংকরণ শিল্পে বিপুল পরিসরে উপস্থাপিত পোড়ামাটি শিল্পের একঘেয়েমি কাটাতেই কি বাংলার শিল্পী বা পৃষ্ঠপোষকরা স্টাকোর ন্যায় এই বিকল্প পথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল? সেই দিকটি নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। এছাড়াও এর পাশাপাশি দেখা যায় আবার নালন্দাতে আনুমানিক সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ভাগে মৃৎশিল্পের অনুরূপ শৈলীতে(চিত্র-১৩) প্রস্তর ভাস্কর্যের প্যানেল লক্ষ করা যায় নালন্দার ২নং সাইটে 'পাথর ঘাট্টি' নামক মন্দির অলংকরণে। (চিত্র-১৪) এখানে প্রায় ২২০টি অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং এগুলির মধ্যে কুবের, রামায়ন দৃশ্য, শিব, পার্বতী প্রভৃতি অবয়বের উপস্থাপনা রয়েছে।[411] অর্থাৎ কেবল উপকরণ তথা শিল্প মাধ্যমের ভিন্নতায় আদি মধ্যযুগে বাংলা সহ পূর্বভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুরূপ শৈলীর শিল্পঐতিহ্যের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে, উপস্থাপন ভঙ্গীর নিরিখে আপাতভাবে যাদের পৃথক করা হয়তো মুশকিল। আবার বি.এন.মুখার্জী ধাতব ভাস্কর্য সম্পর্কিত তাঁর একটি আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, পাল-সেন পর্বের বাংলার ধাতব মূর্তিগুলির দৈহিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ উত্থিত ভ্রূ, স্ফীত চক্ষু, প্রসারিত ওষ্ঠ ইত্যাদির সাথে বাংলার পাহাড়পুর, ময়নামতি তে প্রাপ্ত মৃৎ

[411] এফ.এম.আশার, *দ্য আর্ট অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ৩০০-৮০০,* দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস,১৯৮০ পৃষ্ঠা- ৪৮-৪৯

অবয়বের বিপুল সামঞ্জস্য রয়েছে।[412] ফলত যে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে গেলেই অতি সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

তাহলে কি বলা চলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে এবং নিজস্ব শৈল্পিক সতন্ত্রতা সঙ্গে নিয়েই আলোচ্য পর্বে ভাস্কর্য নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত নির্মাতা বা শিল্পীরা এক সমকালীন শৈল্পিক ধারা বা ঘরানা অনুসরণের প্রয়াস করেছিলেন? যার উপাদানের মাধ্যম বা বাহ্যিক উপস্থাপনা ছিল কেবল ভিন্ন? কখনো স্টাকো কখনো মাটি কখনো বা ধাতু? এজাতীয় একাধিক প্রশ্ন কিন্তু আলোচ্য পরিসরে চলেই আসে যাদের উত্তর জানা না গেলেও এগুলির উত্থাপন যে একান্তই অপ্রাসঙ্গিক নয় তা বলা বাহুল্য।

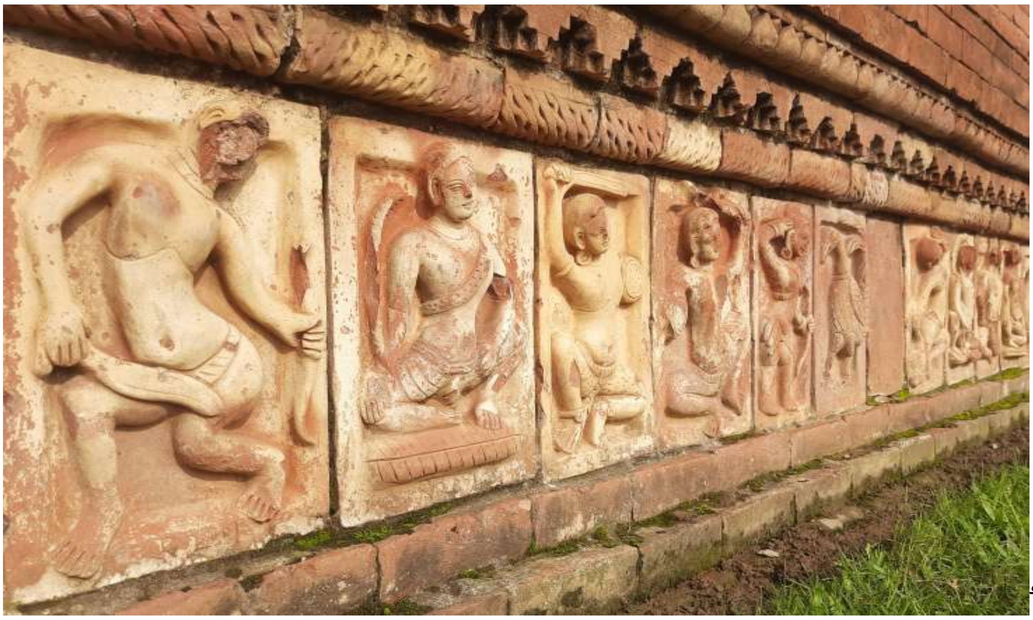

চিত্র-১৩

চিত্র-১৩ পোড়ামাটির প্যানেল, পাহাড়পুর, বাংলাদেশ

সৌজন্যে- ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সায়নী রায়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত, সেপ্টেম্বর,২০২২

---

412 বি.এন.মুখার্জী, 'আ রিজিওনাল ইডিয়ম', *ইষ্ট ইন্ডিয়ান ব্রোঞ্জেস,* (কলকাতা, সেন্টার অফ অ্যাডভানস স্টাডি ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার,১৯৭৯) পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮

চিত্র-১৪

চিত্র-১৪ নারী ও শিশু উপস্থাপনা, (কৃষ্ণ- যশোদা অনুমিত) প্রস্তর ভাস্কর্য অলংকরণ, পাথর ঘাট্টি- নালন্দা

সৌজন্যে- এফ.এম. আশার , *নালন্দা- সিচুএটিং দ্য গ্রেট মনাস্ট্রি*, মুম্বাই:মার্গ, ভলিউম-৬৬, নং- ৩, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৮৪

শেষে বলা যায়, এই বিস্তীর্ণ শিল্প উপস্থাপনে শিল্পীর ভূমিকা বা স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি কতখানি নির্ধারণ করা সম্ভব। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় মৃৎ অবয়ব নির্মাণকারীতেই পরিচিতি বা সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রটি যথেষ্ট জটিলতাপূর্ণ। ফলত সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তা আলোচনা করতে হলে পোড়ামাটি অবয়বগুলির উপস্থাপন পর্যালোচনাই একমাত্র পথ। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার নিরিখে দেখা যায় একাধিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন মৃৎফলকের উপস্থিতি রয়েছে বঙ্গীয় পরিসরে এবং সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতার ও উপস্থিতি নিরিখে মৃৎ ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু বা বাহ্যিক শৈলীর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই পর্বের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যই যেহেতু তা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অঙ্গ, ফলত সেক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা এই অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। ইতিপূর্বেই দেখা গেছে জগজ্জীবনপুরে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের চরিত্র সেখানকার শিল্পের বিষয় নির্ধারণে সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়েছে। আবার বগুড়া জেলার পলাশবাড়ি কেন্দ্রটিতে দেখা যায় সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সংযোগ পরিলক্ষিত এবং সেখানে রামায়ণের আদি ও অযোধ্যা কাণ্ডের কাহিনীর বিস্তীর্ণ উপস্থাপনা রয়েছে। অনুমান করা হয় তা কোনও বৈষ্ণব মন্দির ছিল এবং গুপ্ত সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলেই সেক্ষেত্রে মৃৎশিল্পের ব্যতিক্রমী চরিত্র

লক্ষণীয়। ফলে সেক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি কিন্তু অনেকাংশেই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। তবে আবার পাহাড়পুর বা মহাস্থানের ভাসু বিহার এর ন্যায় কেন্দ্রগুলি লক্ষ্য করলে কিন্তু সেক্ষেত্রে শিল্পীর পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বহুলাংশে অনুভূত হয় যা তাঁর স্বাধীনতার দিকটিকেও হয়তো কিছুটা ভিন্ন রূপে প্রকাশ করে।

উপসংহার

যেকোনো অঞ্চলের বস্তুসংস্কৃতির চরিত্র বিন্যাস সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উপর নির্ভরশীল। আবার অন্যভাবেও বলা চলে, যেকোনো অঞ্চলের সামাজিক গঠন তার বস্তুগত সংস্কৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে যা আদতে সমকালীন ভৌগোলিক পরিসর, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসনিক অবস্থান, ধর্ম, মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজন ইত্যাদি সমস্ত কিছুর দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ যেকোনো শর্তেই সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থার সাথে তার বস্তুসংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধের আলোচনাও শিল্পইতিহাস তথা মুখ্যত মৃৎশিল্পের ইতিহাস কেন্দ্রিক যা বস্তুসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই মানুষ পারস্পরিক সংযোগমাধ্যম বা অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তথা নিজ জীবন, দর্শন, প্রয়োজন, সমাজ সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে তার সৃজনশীলতা বা সৃষ্টি ক্ষমতাকে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত রয়েছে মধ্যপ্রদেশের ভীমভেটকার অতি সুপ্রসিদ্ধ মধ্যপ্রস্তরযুগীয় গুহাচিত্রের ন্যায় একাধিক শিল্পকর্মের উদাহরণ যা ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ধারায় নবদিগন্তের সূত্রপাত ঘটায়। শিল্পকর্ম নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার মধ্যে শিল্পী, শিল্পবস্তু এবং সাধারণ মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। শিল্পকলার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সম্পর্ককে অনুধাবন করা যায় এবং সমসাময়িক ইতিহাসের সমাজ গঠন প্রক্রিয়াকেও চিহ্নিত করা যায়। উক্ত ইতিহাসের অন্বেষণ ব্যতীত এইরূপ শিল্প ইতিহাসচর্চা হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সূচনা অংশেই উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান গবেষণা পত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু একান্ত রূপেই বাংলার মৃৎশিল্প কেন্দ্রিক হলেও এই চর্চা ঠিক প্রথাগত 'শিল্পইতিহাস' নয়। বর্তমানের আলোচনা আদতে বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস, যেখানে তার বাহ্যিক আঙ্গিক বা শৈল্পিক কারিগরির মধ্যে মুখ্য চর্চা সীমিত না রেখে উক্ত শিল্প প্রক্রিয়ার পশ্চাতে নিহিত বিবিধ সামাজিক প্রেক্ষিত তথা মৃৎশিল্পের সমাজ ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে। ফলত সেই সূত্রেই উল্লেখ করা যায়, যেকোনো শিল্প অবয়বের সামাজিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব কেবল তার শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও কারিগরীর বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকেনা। বরং তা সম্পৃক্ত আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সাক্ষ্যরূপে কাজ করে।

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়[413] এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এই জাতীয় আলোচনায় কখনোই শিল্পের বাহ্যিক উপস্থাপনার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়। টেরাকোটা অবয়বগুলি তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দীর্ঘকাল সমাজে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে বলে বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক নথী রূপে আমরা তাকে পাই, ফলে উক্ত সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দীর্ঘকাল সে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় সেই প্রক্রিয়াকে অন্বেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপের কথা বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণা পত্রটির প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল প্রাচীন বাংলার (আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ-দ্বাদশ অধ্যায়) মৃৎশিল্পের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ। সেই সূত্রে একাধিক প্রেক্ষিত উঠে এসেছে সমগ্র আলোচনায়, যথা, কোন প্রেক্ষাপটে কেন এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছে তথা উক্ত শিল্প অবয়বের নির্মাণ, তার চরিত্র বিন্যাস, ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোন প্রক্রিয়া বা প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে? সংশ্লিষ্ট সমাজের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে গণ্য করলে প্রত্যক্ষ রূপে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎ শিল্পের সামাজিক ইতিহাস কতখানি বিশ্লেষণ করা যায় তথা এই শিল্প প্রক্রিয়ার পশ্চাতে নিহিত বৃহত্তর সমাজকে কতখানি অনুধাবন করা যায়? আর উক্ত বৃহত্তর সমাজের অধীনে নির্দিষ্ট রূপে মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষক, নির্মাতা এবং এই শিল্পের অবলোকনকারী সমাজের পৃথক ইতিহাস নির্মাণ কতখানি সম্ভব? পাশাপাশি বাংলা বা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে মৃৎশিল্পের সামাজিক অবস্থান কিরূপ? এজাতীয় একাধিক প্রেক্ষিত অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বিবিধ অধ্যায়গুলির অবতারণা করা হয়েছে এবং তা বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। গবেষণা পত্রটির সামগ্রীক আলোচনা থেকে এই বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পের সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষিতের আভাষ পাওয়া যায়, হয়তো কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা যথেষ্টই সমস্যাজনক, ফলে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এই গবেষণা পত্রটিতে। সামগ্রীক আলোচনার কিছু সংক্ষিপ্তায়নের সহিত উক্ত চিন্তাধারা সমূহকে বর্তমান অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস করা যেতে পারে।

---

413 কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, 'টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি' , গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত *আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া* , *নিউ পার্সপেক্টিভস,* কলকাতা, সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০২ পৃষ্ঠা- ৩৭৯-৩৮৮

আলোচ্য প্রেক্ষাপটে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চায় সমকালীন অন্যান্য শিল্প উপাদান অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মৃৎশিল্প। কেননা প্রাপ্ত অজস্র মৃৎভাস্কর্যগুলি পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় সেগুলি বঙ্গীয় পরিসরে বিকশিত অন্যান্য শিল্পধারা যথা প্রস্তর ভাস্কর্য বা ধাতব অবয়বের ন্যায় প্রথাগত প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রের অনুসারী নয় এবং উক্ত অন্যান্য শিল্প সমূহের বাহ্যিক উপস্থাপন বা উদ্দেশ্যগত ক্ষেত্রও অনুরূপ নয়। উক্ত অন্যান্য শিল্পধারা নির্দিষ্ট রূপে কেবলই ধর্মীয় অবয়বের নির্মাণ এবং ততসম্পর্কিত বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত ছিল, একমাত্র আলোচ্য মৃৎভাস্কর্যেই সমাজের বিস্তীর্ণ যাবতীয় উপাদানকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। বলা চলে বাংলার মৃৎশিল্পের বিন্যাস ও বিকাশের একটি নিজস্ব ধাঁচ ছিল, যা অন্যান্য শিল্প থেকে তাকে এক স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রদান করেছিল। শিল্পশাস্ত্রের প্রতিমাবিদ্যাচর্চা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রতিমার নির্দিষ্ট আসন, আঙ্গিক, মুদ্রা প্রভৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের পাহাড়পুরের উৎখনন রিপোর্টে মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনায় কে এন দীক্ষিত অনুরূপ বক্তব্যের উল্লেখ করে বলেছেন, প্রস্তর বা ধাতব মূর্তি নির্মানকারী ভাস্কররা উক্ত শাস্ত্রীয় রীতি বা ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী কাজ করে থাকেন এবং মূর্তির বাহ্যিক শৈল্পিক কাঠামো ও দৈহিক গঠনতন্ত্রের উপর মনোনিবেশ করেন। কিন্তু মৃৎশিল্প নির্মানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবন দর্শন ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পী তার শিল্পকর্মকে ফুটিয়ে তোলেন।[414] তবে ক্ষেত্রবিশেষে আদি মধ্য যুগীয় বাংলার পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ দেবদেবীর ক্ষেত্রে প্রস্তর বা ধাতব মূর্তির অনুরূপ দৈহিক ভঙ্গিমা উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা যথাযথ নয়। নির্দিষ্ট কিছু প্রতীকীর ভিত্তিতে আপেক্ষিক রূপে তাদের পরিচিতি অনুমান করা গেলেও বহুক্ষেত্রেই তা সংশয়াত্মক। তাহলে কি এক্ষেত্রে অনুমান করা চলে যে, সম্ভবত শাস্ত্রীয় অনুশাসন সংক্রান্ত জ্ঞানের বাইরেই কেবল শিল্পীর চোখে দেখা পূর্বস্থিত দেবদেবী মূর্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশেই বাংলার মৃৎশিল্পীরা উক্ত মূর্তিগুলি তুলে ধরার প্রয়াস করেছিলেন? সেক্ষেত্রেও তাহলে বাংলার মৃৎশিল্পীদের পর্যবেক্ষন ক্ষমতা ও শিল্পজ্ঞান প্রশংসনীয়। তবে সার্বিক পর্যালোচনার নিরিখে বলা চলে বাংলার মৃৎশিল্পের বিশেষত্বই তার সারল্য। আর সেকারণেই সম্ভবত ধর্মীয় অবয়বের

[414] রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত – *এক্সকাভেশন অ্যাট পাহাড়পুর, বেঙ্গল,* মেমোয়ার্স অফ দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, নং- ৫৫,জনপথ, নিউ দিল্লী, দ্য ডিরেক্টর জেনারেল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৫৬

পাশাপাশি মানব জীবন ও সমাজ জীবনের বিবিধ বিচিত্র বিষয়াদি সাবলীলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য মৃৎশিল্পের মধ্য দিয়ে, যা এই সময়পর্বে বাংলার মৃৎশিল্পের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। তবে এই শিল্পের প্রধান উপাদান মাটির কমনীয় চরিত্র এবং নির্মাণ প্রযুক্তির সহজ ভাবের কারণেও এই মাধ্যমে বিবিধ সামাজিক চিত্রের উপস্থাপন সুবিধাজনক হলেও প্রস্তর বা ধাতব ক্ষেত্রে তা প্রায় অসম্ভব। ফলত খুব স্বাভাবিক নিয়মেই এই শিল্প অনেক বেশি উন্মুক্ত, তার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাও অধিক এবং সাধারণ মানুষ তথা সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সূক্ষ্ম স্তরগুলিও এই শিল্পের সাথে অধিক সংযুক্ত। তাই সমকালীন সমাজ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান স্বরূপ এই শিল্পের ভূমিকা যে অসামান্য তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বর্তমান গবেষণা পত্রটির আলোচ্য সময়কাল হিসেবে যদিও মূলত আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক কে নির্বাচন করা হয়েছে কিন্তু বাংলায় মৃৎশিল্পের যথাযথ সামাজিক অবস্থান, প্রাসঙ্গিকতা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস এর সাথে এর সংযোগ অনুধাবন এর উদ্দেশ্যে বাংলায় এর পূর্ববর্তী পর্যায় থেকেই মৃৎশিল্পের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের ইতিহাসও আলোচনা প্রসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। যার ফলে দেখা যায় আলোচ্য সময়পর্বই (আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক) কিন্তু বাংলায় মৃৎশিল্পের সূচনা লগ্ন নয়। এই শিল্পের এক সমৃদ্ধ পূর্বঐতিহ্য বিদ্যমান। প্রাচীন বাংলার এই পোড়ামাটি শিল্প ঐতিহ্য এক বিপুল যুগ পরিবর্তন তথা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাক্ষী। এক দীর্ঘকালীন ক্রমপ্রবহমান মৃৎশিল্প ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য পর্ব সহ সমগ্র প্রাচীন বাংলায়, যা এর সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আরও অধিক মাত্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আলোচনার ভিত্তিতে দেখা গেছে এখানে যেমন প্রাক ঐতিহাসিক পর্বের মৃৎ অবয়বের সন্ধান মেলে পাণ্ডু রাজার ঢিবি, বানেশ্বরডাঙা, মহিষাদল প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে[415] ; তেমনই আনুমানিক তৃতীয়-দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে একাদশ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রে (চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, তিলপি, ধোসা, হরিনারায়ণপুর, বানগড়, রাজবাড়িডাঙা, পান্না, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি, জগজ্জীবনপুর,পিলাক প্রভৃতি)[416] তার সমৃদ্ধ উপস্থিতি বিদ্যমান। সময়ের

[415] সীমা রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ*, আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ভলিউম-২,বাংলাদেশ,২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩৫৬

[416] রায় চৌধুরী, 'টেরাকোটা আর্ট', পৃষ্ঠা- ৩৫৩-৩৬৮

প্রেক্ষিতে ভিন্ন প্রযুক্তি, কলাকৌশল, প্রতীক, বিষয়বস্তু তথা চারিত্রিক বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটেছে বঙ্গীয় শিল্পক্ষেত্রে যা শিল্পইতিহাস চর্চার পাশাপাশি বাংলার সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চার ধারায় বাংলাকে এক বিশেষ স্থান প্রদান করে। বিভিন্ন কালপর্বে ও বিভিন্ন কেন্দ্রে এর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নিঃসন্দেহে সমকালীন সমাজে তার প্রয়োজনীয়তা বা গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রটিকে ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলে এবং সামগ্রীক রূপে বাংলার মৃৎশিল্প চর্চার অনুধাবন তথা সমকালীন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও তার ক্রমবিবর্তনের নানাবিধ দিককে প্রতিফলিত করে।

আলোচনার নিরিখে দেখা যায় যেকোনো সময়পর্বেই মৃৎভাস্কর্যগুলি কিন্তু তার সংশ্লিষ্ট সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বাংলায় পোড়ামাটি শিল্পঐতিহ্যের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ প্রায় ঐতিহাসিক পর্যায়ের অবয়ব হিসেবে যেগুলি পাওয়া যায় তা মূলত হস্ত নির্মিত কারুকার্যবিহীন অতি সাধারণ অবয়ব, যাদের অধিকাংশ প্রজনন স্বত্তা বা উর্বরতা জনিত ধারণার সাথে সম্পর্কিত ছিল বলে অনুমিত। দেখা যায় ক্রমে এই ধারার পাশাপাশি বিবিধ প্রযুক্তিগত, বিষয়বস্তুগত বা বাহ্যিক উপস্থাপনা জনিত একাধিক পরিবর্তন আসতে থাকে আনুমানিক তৃতীয়-দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্ব থেকেই। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সমাজে নতুন ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটেছে যার প্রভাব পরিলক্ষিত পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রেও। আমরা জানি আনুমানিক তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে বঙ্গীয় উপত্যকায় ক্রমে স্থায়ী বসতি, কৃষিকার্যের বিস্তারের পাশাপাশি কারিগরী কর্মকান্ড, প্রযুক্তিগত উন্নতি, সক্রিয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা তথা ক্রমে নগরায়নের সূত্রপাত হয় অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানান ক্ষেত্রে এক উত্তরণের সূচনা হয় যা বাংলার ইতিহাসকে নতুন পথে পরিচালিত করে, নতুন চিন্তাভাবনা ও মননশীলতার জন্ম দেয় এবং একাধারে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের অংশ করে তোলে। ফলত মৌর্য বা বিশেষত শুঙ্গ শৈলীর প্রভাবে বাংলার বিবিধ নগরকেন্দ্রে কালক্রমে একাধিক বিচিত্র আঙ্গিক ও প্রতীক সম্বলিত জাঁকজমকপূর্ণ অবয়বের বিকাশ ঘটেছে। বিচিত্র ছাঁচের প্রয়োগ, জাঁকজমকপূর্ণ অলংকার ও বস্ত্রাদি, কেশবিন্যাস বা দৈহিক ভঙ্গিমা উপস্থাপিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই পর্বে অধিকাংশ অবয়ব ছিল মানুষের সহজ সরল লৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাস এর প্রতিফলন, মূলত শুভ প্রতীক বা মঙ্গলময়তার প্রতীক স্বরূপ গৃহে রাখা হত কিংবা যাত্রাকালে সম্ভবত বহন করা হত। আবার সাধারণ মানুষের সামাজিক আচার, বিশ্বাস অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল এই শিল্প। পাশাপাশি সমকালীন পরিবেশ, পশু-পাখি, কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প তথা

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিকার, মিথুন দৃশ্য, নৃত্য-গীত তথা বিনোদন মাধ্যম প্রভৃতি বিবিধ দিকও কিন্তু প্রকাশিত এই ফলকগুলির মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ আদি ঐতিহাসিক পর্যায় থেকেই বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এই শিল্প।

যদিও প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার নিরিখে দেখা গেছে আনুমানিক তৃতীয় খ্রিস্টাব্দ এর পর থেকে বাংলার মৃৎশিল্পে কিছু পরিবর্তন আসতে থাকে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় বাংলার মৃৎশিল্পে। গুপ্ত শাসকরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন ফলত ক্রমে ব্রাহ্মণ্য প্রতীকী সম্বলিত দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটে। আবার হয়তো কখনও বা লৌকিক কোনও প্রতীকীও প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মধ্যে গৃহীত হয়ে উক্ত কোন দেব/দেবী মূর্তির সহিত সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলত আনুমানিক চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ থেকে বহুলাংশে বিষ্ণু, শিব, নাগ প্রভৃতি কাল্টের সাথে সম্পর্কিত অবয়বের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি বাহ্যিক উপস্থাপনায় পরিবর্তন বা সংখ্যাগত প্রাপ্তিও হ্রাস হতে থাকে। এই পর্যায়ে মৃৎশিল্প কিছুটা ধ্রুপদী গুপ্ত সাংস্কৃতিক শৈলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলে অনুমিত,[417] ফলে উক্ত প্রাথমিক সারল্য বা চিন্তনের খানিক অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যা নিঃসন্দেহে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন তথা পৃষ্ঠপোষক ও দর্শকের পরিবর্তনেরও ইঙ্গিতবাহী।

বাংলায় মৃৎশিল্পের নবস্ফুরণ শুরু হয় আনুমানিক সপ্তম অষ্টম শতক থেকে। যেখানে দেখা যায় মৃৎশিল্প শৈল্পিক বিবর্তনের এক চরম পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। এই পর্যায়ে দেখা যায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলে পোড়ামাটি শিল্পের উপস্থিতি বিদ্যমান, যার মধ্যে মহাস্থানগড় (ভাসু বিহার, বিহার ধাপ, পরশুরামের প্রাসাদ, বৈরাগীর ভিটা, কানাই ধাপ/পলাশবাড়ী ইত্যাদি) ময়নামতি (ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়া, শালবন বিহার, আনন্দ বিহার ইত্যাদি), পাহাড়পুর, জগজ্জীবনপুর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, এছাড়াও আলোচ্য ভূখণ্ডের সন্নিহিত অঞ্চল তথা বিহারের বিক্রমশীলা মহাবিহার এবং ত্রিপুরার পিলাক এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ্য নাম। এই পর্যায়ে দেখা যায় বাংলায় ইতিপূর্বের একক অবয়ব বা ক্ষুদ্র ফলক এর পরিবর্তে তুলনামূলক বৃহৎ আকৃতি সম্পন্ন বর্গাকার বা আয়তাকার পোড়ামাটি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় যারা মূলত সমকালীন বৌদ্ধ বিহার বা ক্ষেত্র বিশেষে ব্রাহ্মণ্য

---

[417] ডঃ উমা চক্রবর্তী, *বেঙ্গল টেরাকোটাসঃ আ নিউ অ্যাপ্রোচ, ফ্রম আর্লিয়েস্ট টাইম টু টুয়েলভথ সেঞ্চুরি সি ই* , আর্লি বেঙ্গল আর্ট সিরিজ, ভলিউম-১, কলকাতা, লেভান্ত বুকস, ইন্ডিয়া,২০২১ , পৃষ্ঠা- ২৯

মন্দির গাত্রে স্থাপত্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল। অর্থাৎ খুব স্পষ্টতই এই পর্বে মৃৎশিল্পের বিকাশের সাথে কিছু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা শক্তি সম্পর্কিত ছিল- ধর্ম, অর্থনীতি ও রাজনীতি যা নিঃসন্দেহে এই শিল্পের নির্দিষ্ট চরিত্র গঠনে ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিবিধ অধ্যায়ের আলোচনার নিরিখে বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথমত বলা যায় আদি মধ্যযুগে বাংলায় প্রসারিত এই শিল্পের পশ্চাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখা গেছে ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে সমগ্র বাংলা মূলত পাললিক সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল নিয়ে গঠিত, যা প্রভূত পাললিক মৃত্তিকায় সমৃদ্ধ ও উর্বর এবং গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি একাধিক জলপ্রবাহ দ্বারা গভীরভাবে প্লাবিত। আদি মধ্যযুগীয় পর্বে বাংলায় মৃৎশিল্পের প্রাপ্তিস্থলগুলির অধিকাংশই নিকটতম ও সম ভৌগোলিক পরিকাঠামোর মধ্যে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের উপরের অংশে[418] তথা উত্তরবঙ্গে (পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ ও উত্তর পশ্চিম বাংলাদেশ) অবস্থিত, (মহাস্থান ও সংলগ্ন কেন্দ্রসমূহ, পাহাড়পুর, জগজ্জীবনপুর)। এই উর্বর অঞ্চল প্রধানত তিস্তা, আত্রাই, মহানন্দা, করতোয়ার জলধারা ও পাললিক ভূমি দ্বারা সংগঠিত। কিছু কেন্দ্র(ময়নামতী ও সংলগ্ন কেন্দ্রসমূহ, পিলাক) দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গ তথা ভূ-তাত্ত্বিকভাবে পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতীর পলি বাহিত নবসৃষ্ট উর্বর ভূমির অধীন ছিল।[419] অন্যদিকে বিক্রমশীলা ছিল মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার অধীন, যা উর্বর মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ। আবার বাংলা মূলত ক্রান্তীয় মৌসুমী বায়ুর অঞ্চল যা পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতে সহায়ক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান। ফলত একাধারে বিপুল নদীপ্রবাহ এবং এই বৃষ্টিপাত বাংলার মৃত্তিকাকে যথেষ্ট উর্বর করে তোলে[420]। সুতরাং বলা চলে, সার্বিকভাবে নদীকেন্দ্রিক অবস্থান এবং বিপুল উর্বর পাললিক মৃত্তিকার উপস্থিতি আলোচ্য ভূখণ্ডে মৃৎশিল্পের নির্মান বা বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। কাঁচামালের পর্যাপ্ত

---

418 শীনা পাঁজা, 'জগজ্জীবনপুর অ্যান্ড বাণগড়ঃ নর্দান ওয়েস্ট বেঙ্গল', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা- ২১১

419 আব্দুল মোমিন চৌধুরী, আকসাদুল আলম- 'হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮ পৃষ্ঠা-২-৫

420 আব্দুল মোমিন চৌধুরী, আকসাদুল আলম- 'হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি', পৃষ্ঠা- ১৫-১৬

যোগান যেকোনও শিল্পের বিকাশে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর যেহেতু টেরাকোটা শিল্পের প্রধান উপকরণ মৃত্তিকা এবং আলোচ্য পরিসরে তা অতি সহজলভ্য ছিল ফলত সেটা সার্বিকভাবে বাংলায় এই শিল্পের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নেই। পাশাপাশি শুকিয়ে পোড়ানো হলে মাটির অবয়ব প্রায় অভঙ্গুর চরিত্র ধারণ করে। সেকারণেই এত বছরের ব্যবধানেও আমরা তাদের অস্তিত্ব পাই। ফলত এই চরিত্র খুব সহজেই শিল্পীদের তাদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যম হিসেবে এই মৃত্তিকাকে বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করে বলা বাহুল্য। আর বাংলায় দীর্ঘদিন ব্যাপী মৃৎশিল্পের উপস্থিতি থাকায় তার নির্মাণ শৈলী বা কারিগরি সম্পর্কে স্থানীয় শিল্পীরা যথেষ্টই ওয়াকিবহল ছিলেন সন্দেহ নেই, এবং তারা সময়ের সাথে প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে নিজ শৈলী নিয়ে বিবিধ অনুসন্ধান বা বিবর্তন ঘটিয়েছেন অতি সহজেই। ফলত বলা চলে বাংলার শৈল্পিক ঐতিহ্যের চরিত্র বহুলাংশে তার ভৌগোলিক পরিসরের শর্ত ও সীমাবদ্ধতা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

তবে কেবল সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটই নয়, সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিসরও এই শিল্পের বিকাশ বা চরিত্র নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সাধারণত মনে করা হয় আদি-মধ্য যুগ ছিল আঞ্চলিকতার যুগ। রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, নতুন ভূমিনির্ভর গোষ্ঠীর উপস্থিতি, কৃষি অর্থনীতির সম্প্রসারণ, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো, স্তরায়ন, নতুন জাতি-বর্ণ কাঠামোর বিস্তার, সাংস্কৃতিক তথা ধর্মীয় জটিলতা ও বৈচিত্র্যের যুগ। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিপুল পরিবর্তন এক নতুন আর্থ-সামাজিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটায় যা সমকালীন শিল্প সংস্কৃতির চরিত্র ও বিকাশকে যে প্রভাবিত করবে বলা বাহুল্য। এর ফল স্বরূপ পূর্ববর্তী পর্ব অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মৃৎশিল্পের আবির্ভাব ঘটে যা ছিল প্রধানত স্থাপত্যিক, এবং নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত। ফলে গুপ্ত শাসনের পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতিতে একাধিক স্বাধীন আঞ্চলিক রাজবংশের উত্থান ঘটে যার মধ্যে একদিকে পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ এবং উত্তরবঙ্গে শশাঙ্ক কর্তৃক গৌড় অঞ্চলে স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান ঘটে।[421] যদিও বঙ্গীয় রাজনীতির এই অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং মোটামুটি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে

[421] আব্দুল মোমিন চৌধুরী, 'থ্রেসহোল্ড অফ রিজিওনাল পলিটিক্যাল এনটিটি', *হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,* আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও রনবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভলিউম ১, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা-৫২৯-৫৩০

বঙ্গীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে পাল রাজবংশের উত্থান ঘটে। অন্যদিকে ছিল বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সমতট- বঙ্গ অঞ্চলের একাধিক স্থানীয় রাজবংশ। ফলত এই সকল শাসকগণ নিজ নিজ অঞ্চলের স্থানীয় শিল্প সংস্কৃতির প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তা অবশ্যই কাম্য এবং তার ফলস্বরূপ বাংলায় উপস্থিত রয়েছে একাধিক স্থাপত্য, ভাস্কর্য সম্বলিত সমৃদ্ধ পুরাকেন্দ্র।

পাশাপাশি এই শিল্পের চারিত্রিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্যায়ের বিবর্তিত ধর্মচেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পর্যায় ছিল বাংলায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিকাশের অধ্যায় এবং ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মে বিবিধ রীতিনীতি ও দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটে। আনুমানিক ষষ্ঠ সপ্তম শতক থেকে বাংলা তথা পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়। ফলত বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে বিবিধ বিহার, মহাবিহার, সংঘারাম এর ন্যায় বৌদ্ধ স্থাপত্য এবং অসংখ্য অভিলেখ, ভাস্কর্য প্রভৃতির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যা একাধারে বাংলার শিল্প-স্থাপত্যের ইতিহাসের পাশাপাশি সমকালীন ধর্মীয় তথা সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরিল্লিখিত বাংলার শাসকবর্গের অধিকাংশই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক, ফলত তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একাধিক বৌদ্ধ স্থাপত্য সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আর এই সূত্রেই বলা চলে বর্তমান আলোচনার প্রধান উপাদান অর্থাৎ আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের বিকাশও মুখ্যত পরিলক্ষিত হয় এই বৌদ্ধবিহার কেন্দ্রিক। সুতরাং সমকালীন বাংলায় মৃৎশিল্পের সমৃদ্ধি বা জনপ্রিয়তা যে আদতে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার সাথে সমানুপাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল বলাই যায়। তবে কেবলমাত্র বৌদ্ধ পরিসরেই এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল তা নয় মহাস্থানে একাধিক অবৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যে মৃৎভাস্কর্যের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়; যেমন মহাস্থান এলাকার পলাশবাড়ী (মতান্তরে বামনপাড়া[422]) এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নাম। এই কেন্দ্রে আনুমানিক সপ্তম শতকীয় একটি বৈষ্ণব মন্দির গাত্রে সমৃদ্ধ শৈল্পিক কারিগরি সম্পন্ন গুপ্ত ব্রাহ্মী বা উত্তর ব্রাহ্মী লিপি সম্বলিত অসংখ্য রামায়ণ এর কাহিনী সম্বলিত ফলক[423] সহ ব্রাহ্মন্য ধর্মের অন্যান্য কিছু দেবদেবীর (ব্রহ্মা, গনেশ, লক্ষ্মী ইত্যাদি) উপস্থাপনা

[422] আফরোজ আকমাম, *মহাস্থান,* বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা বাংলাদেশ, ২০০৬ পৃষ্ঠা-৯৭-৯৮

[423] গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য, 'আর্লি রামায়ণা ইলাস্ট্রেশন ফ্রম বাংলাদেশ', *সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজি,* রোম, ১৯৮৭, পার্ট- ২, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ১০৫২

উক্ত অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জনপ্রিয়তার দিকটিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বৌদ্ধধর্মের সাথে বাংলার মৃৎশিল্পের একপাক্ষিক সম্পর্ককে এক ভিন্ন দিশা দেখায়। কেবল মৃৎভাস্কর্যই নয়, বাংলার বিভিন্ন পুরাকেন্দ্রে প্রস্তর বা ধাতব অসংখ্য সূর্য, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী মূর্তি পাওয়া যায় যা বিভিন্ন সংগ্রহশালা গুলিতে সুরক্ষিত রয়েছে। গুপ্ত পর্ব থেকেই বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেই ধারা আদি মধ্যযুগীয় পর্ব জুড়েও মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাথে একসঙ্গে পথ চলেছিল যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে। কেবল স্থাপত্য ভাস্কর্য নয়, আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় প্রাপ্ত বিবিধ অভিলেখগুলি পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ উভয় পরিসরেই বিপুল ভূমিদানের নজির যা সমকালীন সমাজে উভয় ধর্মের প্রাসঙ্গিকতার দিকটিকে প্রতিস্থাপিত করে। ফলত ধর্মীয় প্রচার বা প্রতিপত্তি স্থাপন স্বরূপ স্থাপত্যিক কাঠামো নির্মানের বহুল প্রবণতা আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় মৃৎশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ত করেছিল সন্দেহ নেই। ফলত বলা যায় আলোচ্য কালপর্বে আদি ঐতিহাসিক পর্ব অপেক্ষা মানুষের ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মাচরণের বিপুল পরিবর্তন তথা উপরি বর্ণিত নতুন ধর্ম ব্যবস্থা যেমন পোড়ামাটি ভাস্কর্যের ব্যবহার বা নির্মাণের উদ্দেশ্যে পরিবর্তন এনেছিল তেমনই নগরাঞ্চলের অবক্ষয়, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, দর্শক তথা পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্রে পরিবর্তন সার্বিকভাবে এই শিল্পের চারিত্রিক পরিবর্তন বা নবরূপায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

আদি মধ্যযুগীয় পর্বে সার্বিকভাবে বাংলার বিবিধ প্রত্নস্থল জুড়ে সূক্ষ্ম তারতম্যে প্রায় সমজাতীয় পোড়ামাটির অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায়। যা অবশ্যই সমগ্র বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে বলা বাহুল্য। সার্বিক রূপে আলোচ্য পর্ব জুড়ে বাংলায় বৃহত্তর রূপে দুই ধরণের পোড়ামাটি ভাস্কর্যের উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়- প্রথমত, যেগুলি ধর্মীয় অবয়ব রূপে নির্ধারিত এবং দ্বিতীয়ত যেগুলির মধ্যে সামাজিক জীবনযাত্রার প্রতিফলন রয়েছে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। সুতরাং আপাতভাবে একাধারে সমকালীন সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার আভাষ প্রদানে যে এগুলি সক্ষম বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রতিটি টেরাকোটা অবয়ব তার নিজস্ব ভঙ্গীতে অনন্য, তার সহিত সম্পৃক্ত ভিন্ন প্রতীক, আদর্শ বা দর্শনের পৃথক ভূমিকা রয়েছে যা এই শিল্পের চরিত্রায়ন, উদ্দেশ্য ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষিত।

আলোচনা সূত্রে দেখা গেছে এই পর্বে বাংলার প্রায় সমস্ত কেন্দ্রেই মৃৎ ফলকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী পর্যায় অপেক্ষা ভিন্ন। এই পর্বে ধর্মীয় বিষয়বস্তু সম্পন্ন অবয়বের মধ্যে প্রধানত উপস্থিত রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবী মূর্তি, অর্ধ-ঐশ্বরিক অবয়ব (গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, কীর্তিমুখ, নাগ), বৌদ্ধ প্রতীক সম্পন্ন অবয়ব (ধর্মচক্র, পদ্ম,পুঁথি) প্রভৃতি। পাশাপাশি বাংলার মৃৎশিল্পে বিপুল হারে নাগ উপস্থাপনা বা সর্পফনা সম্বলিত বিভিন্ন উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধবিহারে এই অবয়বগুলি নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুই ধরণের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, একদিকে সম্ভবত সমকালীন বঙ্গীয় সমাজে উক্ত নাগ কাল্ট সম্পর্কিত আরাধ্য ধর্মীয় অবয়ব তথা দেবদেবীর অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তাকে নির্দেশ করে। আবার বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থের কাহিনীগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে কিন্তু নানাভাবে বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের সাথে গুরুত্বপূর্ণ নাগ সংযোগ উপস্থিত, তৃতীয় অধ্যায়ে এসম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। তবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য যাইহোক বাংলার মৃৎভাস্কর্য যে সমকালীন সমাজের ধর্মীয় চেতনার বিবিধ ক্ষেত্রগুলিকে স্পষ্টতই প্রতিফলিত করে বলা চলে যা সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যদিও এক্ষেত্রে অন্যতম প্রেক্ষিত ও উঠে আসে যে, এই মৃৎশিল্পে নির্ধারিত বিষয়বস্তু আদতে কি উদ্দেশ্যে নির্মিত বা উপস্থাপিত? অর্থাৎ এর পশ্চাতে কি কেবলই সৌন্দর্যায়ন বা নান্দনিকতার চেতনা নিহিত নাকি কোনও বৃহত্তর প্রেক্ষিত বা উদ্দেশ্য থেকে অতি সচেতনভাবেই শিল্পের বিসয়বস্তু নির্ধারিত? আর এই সূত্রেই ধর্মীয় চেতনা সম্বলিত ফলকগুলির ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে বিষয়বস্তু ধর্মীয় হলেও আদতেই এগুলির চরিত্র কতখানি ধর্মীয় আখ্যা দেওয়া যায়? যদিও এজাতীয় প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর আমাদের হাতে নেই তা স্বত্তেও বলা চলে এগুলি এই পর্বে বৃহৎ রূপে বৌদ্ধবিহার এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্রাহ্মণ্য মন্দির গাত্র অলংকরণের অঙ্গ রূপে উপস্থাপিত হয়েছিল ফলে এই শিল্পের ভিত্তির সাথেই ধর্মীয় সূত্র সংযুক্ত ছিল। কিন্তু খেয়াল রাখা প্রয়োজন এগুলি আদতে স্থাপত্য কাঠামোর দেওয়ালগাত্রে অলংকরণ এর অঙ্গ স্বরূপ প্রদর্শিত ছিল এবং সম্ভবত এর সাথে কোনোরূপ আচার বিধি পালনের সংযোগ ছিলনা। আর ইতিপূর্বেও উল্লিখিত এক্ষেত্রে উপস্থাপিত দেবদেবী প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থার অঙ্গ হলেও মৃৎশিল্পে তার বাহ্যিক উপস্থাপন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারী ছিলনা যা ধর্মীয় মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ শর্ত। এই সূত্রেই উঠে আসে বৌদ্ধ বিহারে ব্রাহ্মণ্য অবয়বের উপস্থাপনার উদ্দেশ্য বা প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রটি। সেক্ষেত্রেও একই

কথা প্রযোজ্য; ধর্মীয় চরিত্র নির্ধারিত না থাকলে এধরনের বিধি নিষেধের ক্ষেত্রটি অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে। এরূপ একাধিক প্রেক্ষিত বারংবার উঠে আসে বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের আলোচনায় যার বিশ্লেষণ আদতেই অত্যন্ত জটিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মৃৎশিল্পের ইতিহাস সম্পর্কিত সমকালীন কোনও প্রত্যক্ষ জোরালো নথী সেভাবে উপস্থিত না থাকায় সমসাময়িক অন্যান্য একাধিক উপাদানের ব্যবহার করা হয়েছে মৃৎশিল্পের বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনের জন্য, যার মধ্যে অন্যতম সমকালীন বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে রচিত বেশ কিছু সাহিত্য গ্রন্থ। *'সুভাষিত রত্নকোষ', 'আর্যাসপ্তশতী', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'পবনদূত', 'চর্যাপদ'* প্রভৃতি বঙ্গীয় পরিসরে রচিত সাহিত্য গ্রন্থের পর্যালোচনায় দেখা যায় তা সমকালীন বাংলার গ্রাম সমাজের বিবিধ দিকের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমকালীন বিবিধ নথী বিশেষত তাম্রশাসন গুলির পর্যালোচনায় খুব সহজেই আদি মধ্যযুগীয় পর্বে বাংলায় গ্রামীণ সমাজের প্রসার ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এসকল উল্লিখিত গ্রন্থাবলী তথা সমকালীন বাংলার পরিবেশ, ঋতুবৈশিষ্ট্য, দেবতাদের লীলা, মানুষের অনুভূতি, প্রেম-বিরহ, দৈনন্দিন জীবনযাপন সহ সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনের বিবিধ দিকের ধারণা দেয়, যার সাথে বাংলার মৃৎশিল্পে প্রতিফলিত বিষয়াদির বিপুল সামঞ্জস্য রয়েছে। বাংলার মৃৎফলকে উপস্থাপিত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ বিবিধ দেবদেবীর উল্লেখ রয়েছে এসকল গ্রন্থে। উপরিউক্ত সাহিত্য গ্রন্থের মধ্যে বিশেষত 'সুভাষিত রত্নকোষ' বা 'সদুক্তিকর্নামৃত' সংকলিতই হয়েছিল বাংলার সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে। একাধিক বাঙ্গালী কবির লেখা সহ এদের বিবিধ শ্লোকগুলিতে বাংলার সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনের উল্লেখ রয়েছে। যদিও গ্রন্থগুলি আলোচ্য কালপর্যায়ের একদম শেষের দিকের সংকলন এবং তৎকালীন টেরাকোটা শিল্পীরা আদতেই উক্ত কবিতা বা শ্লোকগুলির সাথে কতখানি পরিচিত ছিলেন তা সংশয়াত্মক। তবে সাহিত্য ও শিল্পে প্রায় অনুরূপ ধর্মীয় বা সামাজিক জীবনের উপস্থাপন নিঃসন্দেহে বাংলার মৃৎশিল্পে উপস্থাপিত বিষয়াদির বাস্তবিকতার ক্ষেত্রটিকে অধিক গ্রহণীয় করে তোলে। অনুরূপ ভাবেই দেখা যায় সমকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পশুপাখির বিস্তীর্ণ উপস্থাপন রয়েছে বাংলার মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রত্নস্থলে। পাশাপাশি উপস্থাপিত রয়েছে বাংলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিস্তীর্ণ প্রতিচ্ছবি যা এই পর্যায়ের মৃৎশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে দিয়ে সমাজের বিবিধ মানুষের জীবনের ইতিহাসের ধারণা পাওয়া সম্ভব। একাধিক ফলকে দেখি নারীরা কুয়ো থেকে জল

তুলে জল ভর্তি কলস নিয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে, কখনো শিশু কোলে নারী, ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষুকের উপস্থাপনা, একাধিক ক্রীড়া জগতের উপস্থাপনা, অবসর বা বিনোদনের জগতের উপস্থাপনা সহ বিভিন্ন বিচিত্র প্রেক্ষিত, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম অনুভূতি বা মুহূর্তগুলিকে শিল্পীরা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি সমকালীন সমাজে বিবিধ পেশাজীবী মানুষদেরও উপস্থাপন করেছেন তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। অপরদিকে বিশেষ উল্লেখ্য শবর, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী গোষ্ঠীর কথা, শিকার ছিল যাদের প্রধান উপজীব্য। চর্যাপদে এই শবর শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে।[424] পাহাড়পুর, মহাস্থান, বিক্রমশীলার বেশ কিছু ফলকে তাঁদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিপুল রূপে প্রান্তীয় মানুষদের উপস্থাপনাও নানা প্রশ্নের উদ্রেক করে। বৌদ্ধবিহারে এই ধরণের উপস্থাপনা নিছকই শিল্পচেতনার প্রসার নাকি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিদার্থে উক্ত প্রান্তীয় মানুষদের সমাজের মূলস্রোতের সাথে সংযুক্ত করার প্রবণতা তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

ফলত এই বিপুল সাহিত্য উপাদান এবং সমকালীন মৃৎফলককে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে তা এই শিল্পের পশ্চাতে নিহিত বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে ধারণা দেয়। তবে এই বৃহত্তর সমাজের অন্তর্গত তিনটি ভিন্ন স্বতন্ত্র সমাজের অনুসন্ধান এরও প্রয়াস গৃহীত হয়েছে বর্তমান গবেষণা পত্রটিতে। যার মধ্যে রয়েছে এই শিল্পের সাথে সম্পর্কিত পৃষ্ঠপোষক সমাজ, এই শিল্পের অবলোকনকারী সমাজ তথা সাধারণ মানুষের সমাজ, এবং এই বিপুল কর্মকাণ্ডের নির্মাতা তথা মৃৎ শিল্পী তথা মৃৎ ভাস্কর দের সমাজ।

প্রথমেই বলা যায় কোন আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ায় কাদের তত্ত্বাবধানে এই শিল্প সংশ্লিষ্ট রূপে বিকাশলাভ করেছে তার বিশ্লেষণ ব্যাতিত এই শিল্পের সামাজিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। উক্ত আলোচনা সূত্রে দেখা যায় অদ্যাবধি স্থিত বাংলার শিল্পকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চায় পৃষ্ঠপোষক, মৃৎশিল্পী বা দর্শকদের অবস্থান বিশ্লেষণের প্রয়াস অনুপস্থিত। এমনকি সেই ইতিহাস বা উল্লেখ কোনও প্রাথমিক উপাদানেও স্পষ্ট নয়। যেহেতু প্রত্যক্ষরূপে কোনও তথ্য অনুপস্থিত ফলত এই পর্বে যেহেতু মৃৎভাস্কর্য মূলত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক বিস্তার লাভ করেছিল ফলে এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত ছিল অনুমান করা যেতে

[424] শ্রী সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী,* (বর্ধমান, সাহিত্যসভা, ১৯৫৬) পৃষ্ঠা- ৮৩

পারে। আলোচনা সূত্রে দেখা গেছে আদি মধ্য যুগীয় বাংলা বা বিহারের একাধিক অভিলেখে সমকালীন শাসক বা তার অনুগত ব্যাক্তিত্ব কর্তৃক বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পরিসরের সার্বিক বিকাশ স্বার্থে ভূমিদান এর সাক্ষ্য রয়েছে। উক্ত দানের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যও সন্নিহিত থাকত।[425] ফলত সেই প্রতিষ্ঠানেরই স্থাপত্যিক অলংকরণের অঙ্গ স্বরূপ উপস্থাপিত মৃৎশিল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কে আদৌ পৃথক রূপে বিশ্লেষণ করা যুক্তিপূর্ণ তা অন্যতম প্রশ্ন, কেননা এই পর্বে মৃৎশিল্পের অস্তিত্ব বা পরিচিতিই সংশ্লিষ্ট স্থাপত্য বা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক। আলোচনা সূত্রে দেখা যায় প্রধানত আলোচ্য পরিসরে বৃহৎরূপে বাংলায় রাজকীয় অনুদানই লক্ষ্য করা যায়। তবে তার চরিত্রেও তারতম্য নিহিত রয়েছে। একাধিক উপাঞ্চলে বিভক্ত বাংলার সর্বত্র কিন্তু এই দানের চরিত্র সমরূপ নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলার উত্তরের উপাঞ্চল তথা পুণ্ড্র অঞ্চল গুপ্ত শাসনের অধীনে একটি ভুক্তি ছিল এবং রাজা কর্তৃক নিযুক্ত উপরিক দ্বারা তা শাসিত হত। রাঢ় বা পুণ্ড্রতে স্থানীয় শাখা ‘অধিকরণ’ ভূমিদানপত্র বা তাম্রশাসন জারি করত (উদাঃ দণ্ডভুক্তি তে গোপচন্দ্রের জয়রামপুর তাম্রশাসন -খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক)। আবার দক্ষিণ পূর্বের বিভাগ তথা সমতট ও গুপ্ত শাসনের অধীনে থাকলেও অধীনস্ত শাসক দ্বারা শাসিত হত, এবং ক্রমেই আধা স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এখানে তাম্রশাসন জারি করত সরাসরি স্থানীয় শাসক (উদাঃ সমতট অঞ্চলের মহারাজা বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসন- ৫০৭ খ্রিস্টাব্দ)।[426] এই প্রশাসনিক পার্থক্যের ফলে তাম্রশাসনের চরিত্র এবং পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্রও যে ভিন্ন তা অনুধাবন করাই যায়। আবার আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগে স্থানীয় শাসকদের আবির্ভাব ঘটে যথা- রাত, খর্গ, দেব প্রমুখ যারা নিজেরাই তাম্রশাসন জারি করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীধারণরাতের কৈলান তাম্রশাসন(৬৬৫-৬৭৫ খ্রিস্টাব্দ), দেব খর্গের রাজত্বের সপ্তম ও একাদশ বছরে প্রদত্ত দুটি আশরাফুর তাম্রশাসন, ময়নামতীর শালবন বিহারে দেব তাম্রশাসন ইত্যাদি। তবে এসকল ক্ষেত্রে যে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজা বা

---

[425] সুচন্দ্রা ঘোষ, *পেট্রোনেজ অফ বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (৬০০-১৩০০ সি ই)*, অক্সফোর্ড রিসার্চ এনসাইক্লোপিডিয়া, রিলিজিয়ন, প্রকাশকাল- ১৫ই আগস্ট, ২০২২ https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.811

[426] রিওসুকে ফুরুই, “বুদ্ধিস্ট বিহারাস ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল কন্টেক্সট”, *বুদ্ধিসম, ল্য অ্যান্ড সোসাইটি,* ৭ (২০২৩), পৃষ্ঠা- ১০৩, hal- 04100180

শাসকই দানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এমন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূমিদানের প্রকৃতি রাজকীয় হলেও রাজা তার মন্ত্রী, সেনাপতি বা অধীনস্ত শাসকের আবেদনে উক্ত ভূমিদান করেছেন। আনুমানিক নবম দশম শতাব্দী থেকে উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল শাসন পর্বের সূচনা হয় যারা পূর্ব বিহার পর্যন্ত ক্ষমতা প্রসারিত করে। বিবিধ পাল শাসক রাও প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধবিহার নির্মান বা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পরিসরে বিপুল দান করেছিলেন। পালরাজা ধর্মপাল স্বয়ং সোমপুর মহাবিহার এবং বিহারের বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণ করেন এবং ধর্মপালের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম তাম্রশাসন, মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন এবং দ্বিতীয় গোপালের মহীপুর শাসন থেকে পালরাজাদের বৌদ্ধ ক্ষেত্রে ভূমিদানের নজির মেলে। জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেননা এক্ষেত্রে দেখা যায় রাজা মহেন্দ্রপালের মহাসেনাপতি বজ্রদেব তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি বৌদ্ধবিহারে নন্দদির্ঘীকউদ্রঙ্গ নামক প্রশাসনিক একক বা অধিবসতি দানের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন এবং মহেন্দ্রপাল তা স্বীকারও করেন। ফলত এখানে দুই ধরণের পৃষ্ঠপোষকতা উপস্থিত ছিল, বজ্রদেব উক্ত বিহার নির্মাণ করেন ও মহেন্দ্রপাল তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন।[427] এই বিহার স্থাপন বা প্রশাসনিক একক এর দানপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে উক্ত স্থানীয় অঞ্চলে তাঁদের নিয়ন্ত্রন বা ক্ষমতা বৃদ্ধি, উক্ত প্রদত্ত সম্পদের পরিচালনার অধিকার এবং তা থেকে অর্জিত পুঁজির অধিকার প্রাপ্তির ইঙ্গিতবাহী। ফলত নিঃসন্দেহে এই বিহার এর সাথে সম্পর্কিত শিল্পের ওপরও এর প্রভাব থাকবে বা তাঁর মূল পৃষ্ঠপোষক আদতে মহেন্দ্রপাল হলেও সেক্ষেত্রে বজ্রদেবের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলা বাহুল্য। অন্যদিকে দশম শতাব্দীতে নিম্ন বঙ্গ অঞ্চলে চন্দ্রদের আবির্ভাব ঘটে এবং এই দুই রাজবংশের আমলে ভূমিদান বা তাম্রশাসন জারির প্রক্রিয়ায় রাজার একাধিপত্য তৈরি হয়। তবে চন্দ্রদের আমলে পৃষ্ঠপোষকতা একান্তই ব্রাহ্মণ্য পরিসরে পরিলক্ষিত হয় যদিও উক্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত বিপুল ধাতব বৌদ্ধ ভাস্কর্য উক্ত অঞ্চলের ধর্মীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে ভিন্ন ইঙ্গিত তুলে ধরে।[428]

ফলত লক্ষ্য করা যায় বাংলায় বৌদ্ধকেন্দ্রগুলির সমৃদ্ধি বা প্রসারে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল যার মধ্যে রাজা ও তাঁর পরিবার, অধীনস্ত শাসক যথা- মহারাজা, মহাসামন্ত প্রমুখ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদস্থ কর্মচারী যথা- মন্ত্রী, সেনাপতি, বিষয়পতি প্রমুখ

[427] ঘোষ, *পেট্রোনেজ অফ বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (৬০০-১৩০০ সি ই)*, পৃষ্ঠা- ১৩

[428] ঘোষ, *পেট্রোনেজ অফ বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (৬০০-১৩০০ সি ই)*, , পৃষ্ঠা- ১৬-১৭

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য পরিসরেও এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায় যদিও সেখানে ব্রাহ্মণ্য মন্দির বা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা ব্যাক্তিগতরূপে ব্রাহ্মণদের অধিক অনুদান দেওয়া হত এবং পরিবর্তে রাজার প্রতি তাঁদের সমর্থন তথা বৈধতা প্রাপ্তি দ্বারা ক্ষমতার প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হত এই পৃষ্ঠপোষকতা। এ প্রসঙ্গেই উঠে আসে বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্র পলাশবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্ন। কেননা অদ্যাবধি প্রাপ্ত নথীর ভিত্তিতে একমাত্র এই কেন্দ্রে নির্দিষ্ট রূপে বৈষ্ণব মন্দির গাত্রে টেরাকোটার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যার বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য উপাদান সম্বলিত। ফলে এর পৃষ্ঠপোষকের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন আসে। সমগ্র আদি মধ্য যুগ জুড়েই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য পরিসরেও বিপুল রাজকীয় দান করা হয়েছে তাহলে এটাও কি অনুরূপ কোনও দানপুষ্ট? ব্রাহ্মণ্য ভাবধারাপুষ্ট কোনও স্থানীয় গোষ্ঠী ছিল এর পৃষ্ঠপোষক? যদিও মনে করা হয় এই কেন্দ্র গুপ্ত প্রভাব সম্পন্ন ছিল এবং একাধিক গুপ্ত তাম্রশাসন থেকে অনুধাবন করা যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে প্রধানত বৈষ্ণব ধর্মই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল[429]। এছাড়া বিবিধ গুপ্ত উপাদানে শাসক কর্তৃক 'পরমভাগবত' উপাধির ব্যবহার ভাগবত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগকে স্পষ্ট করে তোলে। এসময় সম্ভবত নিজধর্ম প্রচার তথা ধর্মীয় পুণ্য অর্জন এবং জনমানসে নিজেদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিতকরণের উদ্দেশ্যে একাধিক বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ্য মন্দির নির্মাণের প্রবণতা, ব্রাহ্মণ্য পরিসরে দানের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। তবে সবক্ষেত্রে শাসকযে প্রত্যক্ষ্যভাবে সকল মন্দির পৃষ্ঠপোষকতা বা সংস্কার করেছেন এমন বলা যথোপযুক্ত নয় কেননা পূর্বেই উল্লিখিত পুণ্ড্র অঞ্চল গুপ্ত শাসনের অধীনে একটি ভুক্তি ছিল এবং রাজা কর্তৃক নিযুক্ত উপরিক দ্বারা তা শাসিত হত।[430] ফলে এই শিল্পের চরিত্র নির্ধারণে এই ধরণের শ্রেণীর উপস্থিতি বা ভূমিকার দিকটিও অগ্রাহ্য করা যথার্থ নয়।

তবে উক্ত আলোচনার নিরিখেই দেখা যায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বা প্রশাসনিক পরিচিতির বাইরেও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন। তাম্রশাসনের পাশাপাশি আলোচ্য বিবিধ প্রত্নকেন্দ্রে অন্যান্য সমসাময়িক উপাদান তথা লিপি সম্বলিত ভাস্কর্য, সিলমোহর,

---

[429] আকমাম, *মহাস্থান,* পৃষ্ঠা- ৯৪-৯৫

[430] রিওসুকে ফুরুই, 'বুদ্ধিস্ট বিহারাস ইন আর্লি মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল কন্টেক্সট', *বুদ্ধিসম, ল্য অ্যান্ড সোসাইটি,* ৭, ২০২৩, পৃষ্ঠা- ১০৩, hal- 04100180

স্তম্ভলিপি ইত্যাদির সূত্রে চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনায় স্পষ্টতই দেখা গেছে রাজকীয় ব্যাক্তিত্ব ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী যথা- বৌদ্ধ ভিক্ষু, বণিক, কায়স্থ, কুম্ভকার, তৈলক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাভুক্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের দানের নজির পাওয়া যায় আলোচ্য পরিসরে। এই সকল মানুষদের দান এবং লিপিসাক্ষ্যে তাদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে তাদের আর্থ-সামাজিক প্রতিপত্তির দিকটিকে পরিস্ফুট করে এবং পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসকে নতুন চরিত্র প্রদান করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই পৃষ্ঠপোষকের ইতিহাস চর্চা থেকেই সাধারণ মানুষের সমাজ সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। আর সর্বোপরি মৃৎফলক গুলিই সমকালীন সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের জীবন্ত দলিল। মৃৎফলক, আলোচিত সাহিত্যাবলী পাশাপাশি রেখে মিশ্র পদ্ধতিতে আলোচনা করলে সমকালীন সাধারণ মানুষের সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া এই যে সার্বিক রূপে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিপুল পরিমাণ অনুদান এবং মানুষের অংশগ্রহণ, তাঁদের যেমন পৃষ্ঠপোষক রূপে পরিগণিত করছি তেমনই দর্শকের অভিধা থেকেও কি তাঁদের বিচ্ছিন্ন করা যায়? সমাজের সাধারণ মানুষ যারা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন সেই কেন্দ্রেরই স্থাপত্যের দেওয়ালগাত্রে উপস্থাপিত টেরাকোটার অবলোকনকারী সমাজের মধ্যেই নিঃসন্দেহেই এসকল মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে অনুমান করতে পারি। আর সেকারণেই হয়তো মৃৎশিল্পের বিষয়বস্তু রূপে এক বিস্তীর্ণ সমাজ চিত্রের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে সচেতনভাবেই। আলোচ্য টেরাকোটা ফলকগুলি হয়তো মানুষকে আকর্ষণের অন্যতম উপাদান ছিল, কেননা উক্ত বিহার বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান জীবনধারণের ভিত্তিই ছিল আগত বিপুল মানুষের অনুদান। পাশাপাশি এসকল কেন্দ্রগুলি ছিল মুখ্যত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নির্মিত, আর রাষ্ট্রের আয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস থাকে সাধারণ মানুষের থেকে যথাযথ রাজস্ব আদায়, ফলত তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যতম পন্থাও যে তাঁদের জীবনযাত্রার উপস্থাপন, এও অসম্ভব নয়। আর বৌদ্ধধর্ম সর্বদাই জাতি বর্ণের ঊর্ধ্বে সাধারণ মানুষের আশ্রয়ের ক্ষেত্র, ফলত সেখানে এজাতীয় মিশ্রিত ঐতিহ্যের সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই কাম্য। এই অবলোকনকারী সমাজ তথা সমকালীন সাধারণ মানুষের অবস্থান বা সমাজকে অন্বেষণ করতে হলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এসকল কেন্দ্রে দান হিসেবে প্রদত্ত বিপুল পরিমাণ লিপি সম্বলিত মহাযান বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী মূর্তি বা ভাস্কর্য। এই মূর্তিগুলির অনুদানকারীদের পর্যালোচনা করলে সমকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের উপস্থিতি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া

সম্ভব। নালন্দা, কুর্কিহার, বোধগয়া, ময়নামতী বা ঝাড়খণ্ডের ইটখোরির ন্যায় বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অজস্র লিপি সম্বলিত ভাস্কর্য অতি যত্ন সহকারে বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং বাংলাদেশের বিবিধ মিউজিয়ামগুলিতে সংরক্ষিত । এই মূর্তি প্রদানকারীদের সামাজিক পরিচিতি সম্পর্কে বিবিধ তথ্য মেলে, যেখান থেকে সমাজে একাধিক পেশাজীবি গোষ্ঠী তথা জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় মেলে, ইতিপূর্বেই একাধিক পেশাজীবী গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে এজাতীয় ভাস্কর্যের অনুদান থেকে প্রাপ্ত নথীর নিরিখে। এসকল দান বা জাতিগোষ্ঠী রূপে তাঁদের উপস্থিতি সমাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। জনপ্রিয় সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে স্থানীয় মানুষের অনুদানের পাশাপাশি তীর্থযাত্রী এবং নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এলাকার বাইরে থেকেও অনুদান আসত, বিহার অঞ্চলে যার প্রবণতা ছিল বেশী। কিন্তু যেসব কেন্দ্র বিশেষ জনপ্রিয় ছিলনা সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্থানীয় অনুদান এর উপরই তারা নির্ভরশীল ছিল।[431] এছাড়া একাধিক তাম্রশাসনের মধ্য দিয়ে সমকালীন পর্বে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, মৃৎশিল্পের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর্শক রূপে যাদের কল্পনা করাই যায়।

এছাড়া এই শিল্পের নির্মাতা বা শিল্পীসমাজ সম্পর্কে বলা যায়, প্রাচীন ভারতের বিবিধ সাহিত্য গ্রন্থে সমাজের অন্যান্য শিল্প বা পেশাজীবী জাতিগোষ্ঠীর উল্লেখ থাকলেও পোড়ামাটি শিল্পী তথা নির্দিষ্টরূপে মৃৎ-ভাস্করদের উল্লেখ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাঁদের পরিচয়, কারিগরী তথা নির্ধারিত নির্মাণ বিধি জনিত কোনও তথ্য কিন্তু উপস্থিত নেই। এই দীর্ঘকালীন সমৃদ্ধ শিল্পের নির্মাতাদের অনুপস্থিতি বা নীরবতা উক্ত শিল্পী ও মৃৎশিল্পের সার্বিক সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদার ক্ষেত্রটিকে কোথায় দাঁড় করায় তা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুম্ভকার শ্রেণীর উল্লেখ থাকলেও মৃৎশিল্পীর সুস্পষ্ট উপস্থিতি কোথাও নেই। বর্তমান গবেষণা পত্রের আলোচনা একান্তভাবেই 'মৃৎভাস্কর্য' কেন্দ্রিক, এবং মৃৎশিল্পী বলতে নির্দিষ্ট রূপে আদি-মধ্যযুগে বাংলায় 'মৃৎভাস্কর'দের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে, যারা মূলত বাংলার পোড়ামাটি অবয়ব বা ভাস্কর্য নির্মাণের সাথে যুক্ত ছিলেন। শিল্পশাস্ত্রের বর্ণনানুযায়ী যারা প্রস্তর মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণের সাথে যুক্ত ছিলেন তথা ভাস্কর[432] তাঁরা 'রূপকার',

---

431 সেনগুপ্ত, 'ডোনর্স অফ ইমেজেস ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া', পৃষ্ঠা- ১৬৩-১৬৪

432 আর.এন.মিশ্রা, *শিল্প ইন ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন,* নিউ দিল্লী, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি অ্যান্ড আরিয়ান বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৯ পৃষ্ঠা- ৯০-৯৭

ধাতব মূর্তি নির্মাণকারীরা হলেন ‘পিতলকার’, যারা রূপকার এর সমকক্ষ ছিলেন এবং পার্থক্য ছিল কেবল তাঁদের শিল্পমাধ্যমে।[433] কিন্তু উক্ত ভাস্কর গোষ্ঠীর মধ্যে কিন্তু মৃৎশিল্পী উল্লিখিত নয়। আদি মধ্য যুগের সামগ্রিক ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায় বিবিধ পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী বা কারিগর বা ভাস্কর শ্রেণী উপস্থিত থাকলেও নিশ্চিত রূপে মৃৎ কারিগর অনুপস্থিত। তাহলে কি বলতে হয় মৃৎ ভাস্কর্য শিল্পীরা তাঁদের পরিচিতি নিয়ে সুস্পষ্টভাবে তখনও সমাজে পেশাজীবী গোষ্ঠী রূপে আকার ধারণ করতে পারেনি, বা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিচিতি লাভ করতে পারেনি? নাকি কুম্ভকার গোষ্ঠীর সার্বিক পরিচিতির আড়ালে মৃৎ ভাস্কররা অন্তর্হিত হয়ে পড়েছিল? আর সেকারণেই কি কোনও লিখিত উপাদানে তাঁরা অনুপস্থিত? তাহলে তা সুদীর্ঘ কালব্যাপী বাংলায় চলে আসা পোড়ামাটি শিল্প এবং মৃৎ-ভাস্করদের সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রটিকে কোথায় দাঁড় করায় তা একটি অন্যতম প্রশ্ন। কেননা যে সমৃদ্ধ শৈল্পিক উপস্থাপনা, দৈহিক বিন্যাশ, গভীর চিন্তন, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ক্রমপ্রবাহমানতা বাংলার মৃৎশিল্পে লক্ষ্য করা যায় তা মৃৎ ভাস্করদের অনুপস্থিতির ধারণাটিকে বহুলাংশেই নস্বাৎ করে।

এই সূত্রেই উল্লেখ করা চলে সমকালীন বাংলার অন্য দুই ভাস্কর্য ও তাঁদের নির্মাণ মাধ্যম এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় সমকালীন বাংলায় মৃৎশিল্পের অনুরূপ ভাস্কর্য ধারার বিকাশ ঘটেছে যথা স্টাকো এবং ধাতব মূর্তি নির্মান। চতুর্থ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে যার নিরিখে দেখা যায় এই দুই শিল্প মাধ্যমে মূর্তি নির্মান প্রক্রিয়ায় আগে পোড়ামাটির কাঠামো নির্মাণ করা হয়ে থাকে যার ওপর যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট উপাদান অর্থাৎ চুন, বালির সংমিশ্রণ এবং ধাতব উপাদান এর প্রলেপ দিয়ে মূল মূর্তি নির্মিত হয়। অর্থাৎ ধাতব অবয়ব বা স্টাকো উভয় ক্ষেত্রেই ভাস্কর্যের ভিত্তি স্বরূপ মাটির কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ মৃৎ ভাস্কর্যের নির্মাণকারীদের উপস্থিতি বিমূর্ত। তাহলে যারা এই মৃৎকাঠামো বা ছাঁচ বানাচ্ছে এবং যারা বিপুল মৃৎ ভাস্কর্য বা ফলক তৈরি করছে তারা কি আলাদা কারিগর? এেকেক শিল্পের সাথে কি একাধিক কারিগর যুক্ত ছিলেন? নাকি এটা অনুমান করা চলে, যে ব্যক্তি ধাতব ভাস্কর্য বানাচ্ছে সেই আবার মৃৎ ভাস্কর্যও বানাচ্ছে? যদিও এর সম্ভাবনা কমই মনে হয় কেননা উভয় প্রক্রিয়ায় বিস্তর ফারাক এবং ধাতব ভাস্কর্য নির্মাণ এ পৃথক জ্ঞান প্রয়োজন। যেভাবে আলোচ্য পর্বে বাংলায় মৃৎশিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত

---

[433] মিশ্রা, *শিল্প ইন ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন,* পৃষ্ঠা- ৯০-৯৭

হয় তাতে মনে হয় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীই তার দায়িত্বে ছিলেন। তবে কি সামগ্রিক ভাবেই এক ভাস্কর গোষ্ঠীরূপে কাজ করছিলেন তারা সমকালীন সমাজে? এধরণের প্রশ্ন কিন্তু চলেই আসে। তাহলে এই বিপুল পরিসরে মৃৎ অবয়ব নির্মাণের ধারা বা তার নির্মাতার সামাজিক অবস্থানকে কোন পর্যায়ে রাখা যথার্থ? তাহলে কি এই তিন ভাস্কর্য কারিগরদের কেন্দ্র করে সামগ্রিক রূপে আলোচ্য কালপর্বে বাংলায় ভাস্করের ধারণা গঠন করা সম্ভব? এও এক প্রশ্ন। যার যথাযথ উত্তর হয়তো আমাদের জানা নেই। বলা বাহুল্য মৃৎভাস্কর্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদত্ত না হলেও কিংবা নির্দিষ্ট পেশাজীবী রূপে মৃৎভাস্কর দের পরিচিতি বা পদের অনুসন্ধান না থাকলেও উক্ত ভাস্কর্য বা ভাস্করের যে অস্তিত্ব ছিলনা এমন ধারণা করে নেওয়া যথেষ্টই সরলীকরণ সিদ্ধান্ত এবং বাংলার এই দীর্ঘকালীন সমৃদ্ধ শিল্পধারা এই ধারণাকে নস্বাৎ করে। এই সার্বিক নীরবতা যে তাদের সামাজিক অস্তিত্বগত অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে এমন ধারনা নিতান্তই অযৌক্তিক বরং এই প্রবণতা বাংলা তথা ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় একাধিক প্রশ্ন বা ভাবনার অবকাশ তৈরি করে বলা বাহুল্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম অধ্যায়ে মৃৎশিল্পের প্রযুক্তি অনুসন্ধানে এথনোআর্কিওলজিক্যাল পদ্ধতির অনুসরণের আলোচনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় আদি ঐতিহাসিক পর্বের মৃৎশিল্প সংক্রান্ত ধারণা পাওয়া গেলেও আলোচ্য পর্ব অনুপস্থিত। ফলত আদি মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল গুলিতে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা করলে হয়তো আলোচ্য মৃৎশিল্পের নির্মাণের পশ্চাতে নিহিত সামাজিক প্রক্রিয়া তথা তার নির্মাণকারীদের সম্পর্কেও যে ধারণা পাওয়া যেতে পারে তা অসম্ভব নয়। ফলত এজাতীয় গবেষণার পরিসর নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাসে নতুন দিশা দেখাতে পারে অনুমান করাই যায়।

অদ্যাবধি আলোচনার নিরিখেই এই মৃৎশিল্পের চরিত্র সম্পর্কে অপর একটি প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করা চলে। অদ্যাবধি আলোচনার নিরিখে যথার্থই বলা যায় বাংলার এই মৃৎশিল্পধারা অন্য শিল্পমাধ্যম থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র শিল্পঘরানার প্রসার ঘটিয়েছিল যার বিশেষত্ব ছিল সারল্য। আপেক্ষিকভাবে প্রায় সকল আলোচনায় এই শিল্পের চরিত্র সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তা সহজ সরল শিল্পবৈশিষ্ট্যের প্রতীক এবং লোকঐতিহ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। নিঃসন্দেহে আলোচিত বিবিধ কেন্দ্রগুলির প্রাপ্ত মৃৎভাস্কর্য গুলির বাহ্যিক ভঙ্গিমা বা মুখাবয়বে যেমন একাধারে স্থানীয় লোকঐতিহ্যের প্রভাব রয়েছে তেমনই তার বিষয়বস্তুও তাই। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য ময়নামতীর নাম। এমনকি

পাহাড়পুর বা জগজ্জীবনপুরের মৃৎফলকের বাহ্যিক উপস্থাপনায় পাল শৈলীর মার্জিত, শান্ত ছাপ খানিক থাকলেও সার্বিক রূপে তাকেও আপেক্ষিকভাবে গ্রামীণ লোকঐতিহ্যপুষ্ট রূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষও অনেক সময় পোড়ামাটি শিল্প বা মৃৎশিল্প মানেই কোনোরূপ চিন্তা না করে তাকে লোকশিল্প রূপে বা সমাজের মূল স্রোতের শিল্পধারার বাইরে টেরাকোটার অবস্থান নির্ধারন করে থাকেন। কিন্তু এখানে অবশ্যই প্রশ্ন আসে সত্যই কি তাই ? যে শিল্প উপদান তৈরি হচ্ছে তার পশ্চাতে তার সমাজ অর্থাৎ কোন সমাজে কাদের উদ্দেশ্যে সেগুলি তৈরি হয়েছে তা মাথায় রাখা আবশ্যক। সাধারণ উপাদান দ্বারা স্বল্পব্যায়ে সহজ উপায়ে নির্মিত হলেও এবং সেখানে তাদের উপস্থাপনেও বহুলাংশে লোকায়ত জীবন থেকে রস আস্বাদন করে থাকলেও তার মাধ্যম বা চরিত্রও যে লোকায়ত হবে কিংবা প্রান্তীয় স্তরের শিল্প রূপে গন্য করা হবে এমন নয়। আলোচনা সূত্রেই দেখা গেছে এর পশ্চাতে মূলত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর দান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন, 'গ্রামীণ লোকশিল্পী বা স্বভাব শিল্পী যখন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তথাকথিত উচ্চ স্তরের বা উচ্চ কোটির মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোন বিশিষ্ট প্রযুক্তি ও শৈলীতে শিক্ষিত হয়ে তাঁদের বা সাধারনের প্রয়োজনে যে শিল্প সৃষ্টি করেন বা মধ্যযুগ অবধি করেছিলেন তাকে সমাজের তথাকথিত "উচ্চ-কোটির" পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ও পুষ্ট "উচ্চ" মার্গের শিল্প কর্মের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।' একই শিল্পী লোকশিল্পের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ মার্গের শিল্পের সৃষ্টিকর্তা রূপে পরিচিতি লাভ করতে পারে উপযুক্ত আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ পেলে।[434] অর্থাৎ তার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা চলে, যে আঞ্চলিক পরিসরে শিল্পধারার বিকাশ ঘটছে তার সামগ্রীক অবস্থান তথা শিল্প গড়ে ওঠার পশ্চাতে যে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট বিদ্যমান থাকে সেটি অনুধাবন অত্যন্ত জরুরী, তার ওপর নির্ভর করে শিল্পের চরিত্র কিরূপ হবে। সেই অনুসারে আলোচ্য পরিসরে বাংলার এই মৃৎশিল্পকে 'লোকশিল্প' বলা কতখানি যুক্তিযুক্ত হবে তা প্রকৃতই প্রশ্নের উদ্রেক করে।

সুতরাং সহযেই বলা যায় সংশ্লিষ্ট সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, ভৌগোলিক পরিমণ্ডল এর সম্মিলিত প্রক্রিয়া কাজ করেছে বাংলায় এই ধরণের শিল্প ঐতিহ্যের বিকাশে। বলা চলে বিবিধ

---

[434] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে*, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩

আঞ্চলিক পরিসরে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং কিছু নিজস্ব শৈল্পিক স্বতন্ত্রতা সঙ্গে নিয়েই আলোচ্য পর্বে এক সার্বিক শিল্প ঐতিহ্যের প্রসার ঘটেছিল বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক পরিসরে যা বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে এক ভিন্ন প্রেক্ষিতে তুলে ধরে। কিছু স্থানীয় চরিত্র বা তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও বিভিন্ন কেন্দ্রের এই শিল্পধারাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শৈলী রূপে আলোচনা করা যায়না। বরং আলোচ্য ভূখণ্ডে বাংলা-বিহারের এই বৃহত্তর পরিসরে স্থাপত্যিক নির্মাণের অংশ রূপে আবিষ্কৃত প্রায় সমরূপ মৃৎভাস্কর্য ধারা আদতে এক বৃহত্তর শিল্প বা সাংস্কৃতিক বলয়ের আভাষ দেয় এবং হয়তো প্রশ্ন রাখা যায় এই মৃৎভাস্কর্যের ঐতিহ্য এক স্বতন্ত্র ভাস্কর্য ঘরানা রূপে আখ্যা দেওয়া যথাযোগ্য কিনা? বলা বাহুল্য আলোচনা নিরিখেই দেখা গেছে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের পাশাপাশি অনুরূপ ধাঁচে, অনুরূপ ভঙ্গীতেই বাংলা বিহারের অন্যান্য কিছু কেন্দ্রে (মোঘলমারি, নালন্দা) স্টাকো ভাস্কর্যের উপস্থিতি রয়েছে। ফলত কেবল উপাদানের পার্থক্যে এই শিল্পকেও কি উক্ত ভাস্কর্য ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করা যায়? এজাতীয় প্রেক্ষিত কিন্তু উত্থাপিত হয় সহজেই। আবার কেবল বাংলা বা বিহারই নয়, আলোচনা সূত্রেই দেখা গেছে আদি মধ্যযুগীয় সমঐতিহ্যের মৃৎশিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তেও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় এর একটি তত্ত্বের অবতারণা করা যেতে পারে। যেখানে তিনি আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিকতার উত্থান আলোচনা প্রসঙ্গে এক স্তরায়ন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন, যথা- 'From local through supra local to regional, at times expanding into supra-regional'[435]. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোচ্য মৃৎশিল্প সম কালপর্বে উক্ত সমাজের মধ্য থেকেই প্রসার লাভ করেছে। ফলত আলোচ্য পর্বে মৃৎশিল্পের প্রসারের চরিত্রের সাথে এই তত্ত্বের সংযোগ অনুসন্ধানের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস করা যেতেই পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মুখ্যত মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মৃৎশিল্পের সূচনা হয়, যা প্রায় চতুর্থ পঞ্চম শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এমনকি তার পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গ রূপে তা ব্যবহৃত। এরপর পরবর্তী গুপ্ত অধ্যায় থেকে বাংলার বিবিধ উপাঞ্চলগুলিতে স্থানীয় পরিসরে মন্দির ইত্যাদির অঙ্গ রূপে পোড়ামাটি ফলক উপস্থাপনের

---

[435] ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *দ্য মেকিং অফ আর্লি মেডিএভাল ইন্ডিয়া,* নিউ দিল্লী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা- ৩৫

প্রবণতা শুরু হচ্ছে, কিন্তু সেগুলির বিশেষ অস্তিত্ব নেই (Local)। ক্রমে বাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে একাধিক স্থানীয় সংস্কৃতি বা শিল্পের সাথে সংযোগ তৈরি হয়। ক্রমে সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ স্বরূপ একাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এর উৎপত্তি ও তার অঙ্গ রূপে টেরাকোটার প্রসার ঘটতে থাকে। অনুমান করা চলে মহাস্থানের পলাশবাড়ি কেন্দ্র থেকে এর সূচনা হয় অধিক স্পষ্ট রূপে। যেখানে খানিক উত্তর ভারতীয় গুপ্ত ভাস্কর্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বলে গবেষকরা মনে করে থাকেন। ফলত এর মধ্য দিয়ে বাংলার মৃৎশিল্প হয়তো স্থানীয় স্তর অতিক্রম করে খানিক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরে যুক্ত হচ্ছিল (Supra-local)। এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখি একদিকে পাল রাজবংশের রাজত্বকালে বাংলার পোড়ামাটি শিল্প এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আঞ্চলিক স্তরে প্রসার লাভ করছে পুণ্ড্র বরেন্দ্র অঞ্চল ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশে। অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় দেব, খর্গ, রাত, চন্দ্র প্রভৃতি রাজবংশের তত্ত্বাবধানে এক পৃথক আঞ্চলিক স্তরে বাংলার মৃৎশিল্পের প্রসার ঘটেছে (Regional)। আর ক্রমে এই শিল্প বাংলার আঞ্চলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে অতিআঞ্চলিক স্তরে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের অংশ হয়ে ওঠে এবং ফলস্বরূপ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তেও বাংলার মৃৎশিল্পের অনুরূপ শিল্পও উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় বা উক্ত ভূখণ্ডের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় বলা বাহুল্য(Supra-regional)।

ফলত আলোচনার শেষ ভাগে এসে বলা যায় বর্তমান গবেষণা পত্রটি প্রধানত আদি মধ্য যুগীয় বাংলায় গড়ে ওঠা পোড়ামাটি শিল্পধারা বিকাশের পশ্চাতে নিহিত সামাজিক প্রক্রিয়া বা সম্পৃক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণের প্রয়াস। পাশাপাশি এই সূত্রেই বলা যায় মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস কোথায় তা অন্যতম প্রশ্ন। সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায় প্রথাগত ধ্রুপদী শিল্পের বাইরে মৃৎশিল্প এক সম্পূর্ণ নিজ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিকাশ লাভ করেছিল এবং সমাজব্যবস্থার অতি সূক্ষ্ম স্তর স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আদি মধ্য যুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছনোর মত কোনও নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষ তথ্য আমাদের নিকট উপস্থিত নেই। ফলত এই আলোচনা সমসাময়িক অন্যান্য তথ্যের উপর নির্ভরশীল এবং মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাসের যে অনুসন্ধান এই গবেষণা পত্রে করা হয়েছে তার কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেলেও তা বহুলাংশে অনুমান নির্ভর। অর্থাৎ বর্তমান এর এই উপসংহার ঠিক প্রথাগত

উপসংহার এর ন্যায় সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তপ্রদানকারী নয় বরং একাধিক প্রশ্ন উদ্রেককারী, বাংলার মৃৎশিল্পের পর্যালোচনায় যাদের আলোচনা নিঃসন্দেহে আবশ্যক।

পাশাপাশি এই আলোচনা সূত্রেই বলা যায় বর্তমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত হল বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস কোথায়? কিংবা বাংলা তথা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে এই শিল্পের অবস্থান কোথায়? এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে হলে স্থিত বিবিধ শিল্প ইতিহাস চর্চার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান আলোচনা যেহেতু নির্দিষ্ট রূপে মৃৎ-ভাস্কর্য কেন্দ্রিক সেক্ষেত্রে মুখ্যত ভাস্কর্য সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চার সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যেহেতু মূল আলোচনা বর্তমানে বাংলা কেন্দ্রিক ফলত মুখ্যত বাংলা বা পূর্বভারতীয় প্রেক্ষপটেই তা আলোচনা করা যেতে পারে। শিল্প ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বনামধন্য শিল্পও ঐতিহাসিকরা বাংলা বা পূর্বভারতীয় ভাস্কর্য সম্পর্কে একাধিক গবেষণা করেছেন। প্রথমেই উল্লেখ্য জে.সি ফ্রেঞ্চ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, আর.ডি.ব্যানার্জী, ষ্টেলা ক্র্যামরিশ, জে এন ব্যানার্জী , সুসান এল হান্টিংটন প্রমুখ বাংলা তথা পূর্বভারতীয় শিল্প/ভাস্কর্য ইতিহাস চর্চার অন্যতম পথপ্রদর্শক। কিন্তু দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসকল ঐতিহাসিক গবেসকরা মূলত বঙ্গীয় বা ভারতীয় ভাস্কর্যের আলোচনায় প্রস্তর বা ধাতব শিল্পকেই মান্যতা দিয়েছেন, মৃৎশিল্প সেখানে বহুলাংশেই উপেক্ষিত। অর্থাৎ সার্বিক ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে মৃৎভাস্কর্যকে আদতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সেভাবে। প্রস্তর বা ধাতব ভাস্কর্যের প্রয়োগ সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় কিংবা শাস্ত্রীয় নিয়মবিধির অনুসারী হওয়ায় কি সেগুলি ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও অধিক সম্মানীয় পদে উন্নীত? এছাড়া উপকরণ রূপেও প্রস্তর বা ধাতব উপাদানের মূল্য অধিক, পাশাপাশি অধিক জটিল কারিগরি বিদ্যার উপস্থিতি এসকল বিষয় কি মৃৎশিল্প অপেক্ষা অন্যান্য শিল্পকে ভাস্কর্যের বিচারের মানদণ্ডে এগিয়ে রেখেছিল? আর মৃৎশিল্প নেহাতই সাধারণ মানুষের শিল্প রূপে অবহেলিত? ফলত একদিকে প্রাচীন বিবিধ লিখিত উপাদানে মৃৎশিল্পের শূন্যতা এবং অন্যদিকে আধুনিক ইতিহাসচর্চায় তার সীমিত উপস্থিতি আদতে বাংলার এই মৃৎশিল্পের সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থানের ক্ষেত্রটিকে কোথায় দাঁড় করায় তা নিঃসন্ধেহে ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পাশাপাশি যদি পৃথক রূপে টেরাকোটা সম্পর্কিত ইতিহাসচর্চা দেখি সেখানেও দেখব ষ্টেলা ক্র্যামরিশ, সরসী কুমার সরস্বতী, দেবাঙ্গনা দেশাই, এস এস বিশ্বাস, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর

ন্যায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যাবতীয় আলোচনা মুখ্যত টেরাকোটার বাহ্যিক উপস্থাপন, বিষয়বস্তু, বর্ণনার মধ্যে সীমিত। এর পশ্চাতে নিহিত সমাজ ইতিহাস বা সম্পৃক্ত আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের বিশ্লেষণাত্মক প্রয়াস প্রায় নেই বললেই চলে। আদি ঐতিহাসিক মৃৎশিল্প তবু আলোচনা থাকলেও বিশেষত আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প সম্পর্কে কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা প্রায় নেই। ফলত বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান আদতেই জটিলতাপূর্ণ। সূচনা অধ্যায়ে মৃৎশিল্প কিংবা সার্বিক ভাস্কর্য জনিত শিল্পইতিহাস চর্চার বিস্তৃত উপস্থাপন করায় পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় এই অধ্যায়ে খুব বিস্তৃত রূপে সেগুলি তুলে ধরা হয়নি।

Bibliography

PRIMARY SOURCES

Excavation Reports:

- Alam, Md. Shafiqul and Miah, Md. Abdul Hashem, *Excavations at Ananda Vihara, Mainamati, Comilla*, 1979-82, Dhaka: Department of Archaeology, Bangladesh, 1999
- Alam, Md. Shafiqul, *Excavations at Rupban Mura, Mainamati, Comilla*, Dhaka, Bangladesh, Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2000
- Alam, Md. Shafiqul, Mian, Md. Abdul Hashem, Khaleq, Md. Abdul, *Excavations at Bihar Dhap, Bogra 1979-1986*, Dhaka, Bangladesh, Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, 2000.
- Alam, Mohammad Shafiqul and Salles, Jean-François (eds.) *France Bangladesh Joint Venture Excavations at Mahasthangarh, First Interim Report 1993-1999*, Vol. I, Dhaka, Bangladesh, Department of Archaeology, 2001

- Das, S.R., *Rajbadidanga: 1962 (Chiruti: Jadupur) An Interim Report on Excavations at Rajbadidanga and Terracotta Seals and Sealings*. Kolkata, The Asiatic Society, 1962.
- Dikshit, Rao Bahadur K.N., *Excavation at Paharpur, Bengal, Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 55, Janpath, New Delhi, The Director General *Archaeological Survey of India*, 1999.
- Dutta, Ashok, *Excavation at Moghalmari, An Interim Report*, Kolkata, The Asiatic Society, 2008.
- Imam, Abu, *Excavation at Mainamati: An Exploratory Study*, Dhaka, Bangladesh, ICSBA, 2000.
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R)* – 1957-58
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R*) – 1958-59
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R)* – 1959-60
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R)* – 1960-61
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R)* – 1961-62
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R)* – 1962-63
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R.)* – 1963-64
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R.)* – 1964-65
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R.)* – 1965-66
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R.)* – 1966-67
- *Indian Archaeology: A Review (I.A.R.)* – 1967-68
- *Indian Archaeology: A Review*, (I.A.R) Exploration and Excavations: Chandraketugarh, West Bengal – 1956-57, Archaeological Survey of India, Government of India, New Delhi
- Miyan, Mohammad Abul Hashem, 'Archaeological Excavations at Jagaddal Bihar: A Preliminary Report', in *Journal of Bengal Art*, Vol. 8, Dhaka, Bangladesh, ICSBA, 2003
- Rahman, Habibur, *Excavation Report on Itakholamura*, Dhaka, Bangladesh, Department of Archaeology,Ministry of Cultural Affairs, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, 1997.
- Roy, Amal, *Jagajjivanpur, 1996-2005 (Excavation Report)*, Kolkata, Directorate of Archaeology and Museum, Information and Cultural affairs department, govt. Of west Bengal, December, 2012.

- Verma, B.S., *Antichak Excavation 2 (1971-1981)*, Delhi, Archaeological Survey of India, 2011.

Inscriptions:

- Barua, B.M. 'The Old Brāhmī Inscription of Mahasthan,' in *Indian Historical Quarterly*, Vol. X, 1934
- Basak, R.G., 'Tippera Copperplate Grant of Lokanatha', in *Epigraphia Indica*, Vol. XV, New Delhi, ASI, 1982
- Bhandarkar, D.R – 'Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan', Hirannada Shastri, K, N, Dikshit, N P Chakraborty, (ed.) *Epigraphia Indica,* vol. 21 (1931-32), Janpath, New Delhi, The Director General Archaeological Survey of India, 1984 (Reprint)
- Bhattacharya, Gouriswar, 'A Preliminary Report on the Inscribed Metal Vase from the National Museum of Bangladesh,' in Debala Mitra (ed), *Explorations in the Art and Archaeology of South Asia: Essays Dedicated to N. G. Majumdar*, Calcutta: Directorate of Archaeology and Museums, 1996.
- Bhattacharya, Suresh Chandra, 'The Jagjibanpur Plate of Mahendrapāla Comprehensively Re-edited,' in *Journal of Ancient Indian History*, 23,2005–2006.
- Furui, Ryosuke, 'Indian Museum Copper Plate Inscription of Dharmapāla, Year 26: Tentative Reading and Study,' in *South Asian Studies* 27, no. 2 (2011).
- Furui, Ryosuke, Re-reading two copperplate inscriptions of Gopāla 2, year 4', in *Pragdhara,* New Delhi, Kaveri Books, 2009
- Kielhorn, F., 'Khalimpur plate Inscription of Dharmapâladêva', in *Epigraphia Indica*, Vol. 4, 1896-97.
- Laskar, G.M, Ashrafur Copper-plate Grants of DevaKhaḍga, in Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, 1 (6), Asiatic Society of Bengal, 1906
- Mukherji, Ramaranjan, Maity, Sachindra Kumar – Corpus of Bengal Inscriptions Bearing on History and Civilization of Bengal, Calcutta, Firma K.L.M, 1967

- Sircar, D.C. (ed), *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization, From the Sixth Century B.C. to the Sixth Century A.D.*, Vol. 1, Calcutta, University of Calcutta, 1942
- Sircar, D.C. (ed), *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization, From the Sixth to Eight Century A.D.*, Vol. 2, Calcutta, University of Calcutta, 1983
- Sircar, D.C., 'Copper-Plate Inscription of King Bhavadeva of Devaparvata', in *Journal of the Asiatic Society, Letters* 17, no. 2,1951.
- Sircar, D.C., 'The Kailan Copper-plate Inscription of King Sridharana Rāta of Samatata', in *Indian Historical Quarterly*, Vol.23, 1947
- Sircar, D.C., 'The Paschimbhag Plate of Srichandra', *Epigraphia Indica*, Vol. 37, Part 7, Year 5, Delhi, ASI, 1968.

Literature:

- Acharya, P.K. (ed.), 'The First Casting of the Images', Chapter- LXVIII, *Indian Architecture According to Mānsāra-ŚilpaŚāstra*, Vol.-II, Oxford University Press
- Ingalls, Daniel H.H., An Anthology of Sanskrit Court Poetry, *Vidyākara's "Subhāṣitaratnakoṣa*", Cambridge, Harvard University Press, 1965
- Francis, H.T (Translated), *The Jataka,* (edited by Professor E. B. Cowell), Vol. 5 Cambridge, at the University Press, 1905
- Francis, H.T and Neal, R.A (Translated), *The Jataka*, (edited by Professor E. B. Cowell), Vol. 3, Cambridge, at the University Press, 1897
- Dhoyi, *Pavanadūta,* (in Bengali, Translated by Shyamapada Bhattacharya), Sanskrit Sahitya Bhandar, Volume 17, Calcutta, Nabapatra Publications.
- Mallinson, Sir James (Translated), *Messenger Poems by Kalidasa, Dhoyi & Rupa Gosvamin*, (edited by Isabelle Onians and Somadeva Vasudeva), Clay Sanskrit Library, New York University Press, JJC Foundation, 2006
- Cowell, E.B, and Rouse W.H. (translated), *The Jataka*, (edited by Professor E. B. Cowell), Vol. 6 Cambridge, At the University Press, 1907
- Banerjee, Suresh Chandra, *Saduktikarṇāmṛita of Śrīdhardāsa*, Calcutta, Pharma KLM, 1965

- Saraswati, Sarasi Kumar, 'An Ancient Text on the Casting of Metal Images', Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol. 4, No. 2, 1936
- Sen, Sukumar, *Caryāgīti Padābalī* (in Bengali), Burdwan, Sahitya Sabha, 1956

SECONDARY SOURCES

Unpublished Ph.D Thesis:

- Chakraborty, Priyankara, *Tracing the History of Literary Culture in Early Medieval Bengal, in the Light of Inscriptions (6th century to 13th century CE)*, Unpublished PhD Thesis, Jadavpur University, 2022.
- Dutta, Anwita, *The Cultural Significance of Early Historic Terracotta Art of West Bengal: An Ethnoarchaeological Approach,* Unpublished PhD Thesis, Deccan College Post Graduate and Research Institute, Pune, May 2013
- Hazra, Chitralekha, *Social and Cultural Life in Religious Complexes in Bengal and Bihar: 600 CE - 1300 CE*, Unpublished PhD Thesis, University of Calcutta, 2022.

Books and Articles: (in English)

- Ahmed, Bulbul (ed.) *Buddhist Heritage of Bangladesh*, Bangladesh, Nymphea Publications, 2015
- Ahmed, Nazimuddin, *Mahasthan*, Dhaka, Department of Archaeology and Museum, 1981
- Akmam, Afroz, *Mahasthan,* Bangladesh National Museum, Dhaka, Bangladesh, 2006
- Alam, Aksadul, 'Bengal and South East Asia: Commercial and Cultural Linkages', *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 2, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Alam, Mohammad Shafiqul, 'Ceramics from Mahasthan: An Ethno Archaeological Study', in Journal of Bengal Art, Volume 4, Dhaka, ICSBA, 1999

- Asher, F.M, *Nalanda- Situating the Great Monastery*, Mumbai: Marg, Volume-66, No-3, 2015
- Asher, F.M. *Art of Eastern India 300–800*, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1980.
- Banerji, Arundhati, *Early Indian Terracotta Art 2000-3000 BC – Northern-Western India*, New Delhi, Harman Publication House, 1994
- Banerji, Arundhati, *Images, Attributes and Motifs: Studies in Early Indian Art and Numismatics*, Vol.-1, Delhi, Sandeep Prakashani, 1993
- Banerji, R.D., *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture*, Delhi, Manager of Publications, 1933.
- Basu Majumdar, Susmita. 'Media of Exchange: Reflections on the Monetary System', In Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti (eds.), *History of Bangladesh*, Volume 2, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018.
- Basu, Durga, 'Stucco Art', in Excavations at Moghalmari: First Interim Report (2003-04 to 2007-08), Asok Dutta, Kolkata, The Asiatic Society, 2008
- Basu, Sakti Kali, *Development of Iconography in Pre-Gupta Bengal*, Punthi Pustak Prakashani, Kolkata, 2004
- Bhattacharya, Amitabha, *Historical Geography of Ancient and Early Medieval Bengal,* Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar
- Bhattacharya, Ashok Kumar 'Terracottas of Bengal, Sunga-Kushan Period', in *Indian Terracotta Sculpture: The Early Period,* edited by Pratapaditya Pal, Marg, 2002
- Bhattacharya, Ashok Kumar, 'A Study in Technique', in *East Indian Bronzes*, edited by Sisir Kumar Mitra, Kolkata, Centre of Advanced Study in Ancient Indian History and Culture, 1979
- Bhattacharya, Ashok Kumar, 'An Introspection on the Studies in Indian Art,' in *Journal of Ancient Indian History*, edited by Sudipa Ray Bandopadhyay, Volume 24, Kolkata, University of Calcutta, 2008.
- Bhattacharya, Gauriswar 'Mainamati: City on the Red Hills', *Bengal Site and Sites*, edited by Pratapaditya Pal and Enamul Haque, New Delhi, Marg, 2003

- Bhattacharya, Gauriswar, ‘Early Ramayana Illustrations from Bangladesh’, Rome, *South Asian Archaeology*, 1987, Part-2, 1990
- Bhattacharya, Gauriswar, ‘Trio of Prosperity: A Gupta Terracotta Plaque from Bangladesh’, *South Asian Studies*, 1996
- Bhattasali, Nalinikanta, *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, Dhaka, Published by Rai S.N. Bhadra Bahadur, 1929.
- Biswas, S. S, *Terracotta Art of Bengal*, Agam Kala Prakashan, Delhi, 1981
- Busac, M.F., and Sandrine Gill. "Moulded Terracotta Plaques from Mahasthan." *Journal of Bengal Art*, Vol. 6, Bangladesh, ICSBA, 2001.
- Chakraborty, Dilip Kumar ‘Paharpur: Buddhist Complex of Early Bengal’, in *Bengal Site and Sites*, 2003
- Chakraborty, Dilip Kumar, *Ancient Bangladesh, A Study of the Archaeological Sources with an Update on Bangladesh Archaeology,* 1990-2000, The University Press Limited, 2001
- Chakraborty, Dr. Uma, *Bengal Terracottas: A New Approach*, *From Earliest Time to Twelfth Century CE,* Early Bengal Art Series, Volume-1 Kolkata, Levant Books, India, 2021
- Chakraborty,Srabani, ‘Water Bodies, Riverine Ports and Communications: Making of the Trans-Meghna Sub-Regional Personality in Early Medieval Bengal’, in Proceedings of the Indian History Congress, Volume-76, Indian History Congress, 2015
- **Chandra, Pramod,** *The Sculpture of India, 3000 BC - 1300 AD,* Washington, National Gallery of Art, 1985
- Chatterjee, Brajadulal, *The Making of Early Medieval India,* New Delhi, Oxford University Press, 1997
- Chatterjee, Rama, ‘Important Hoards and Finds’, in *East Indian Bronzes* edited by Sisir Kumar Mitra, Kolkata, Centre for Advanced Study in Ancient Indian History and Culture, 1979

- Chatterjee, Sharmistha, and Sayan Bhattacharya. 'Ethnography for Archaeology: Amongst the Potters of Bishnupur, District Bankura', In Nupur Dasgupta and Pranab Kumar Chattopadhyay (eds.), *Methodologies of Interpreting the Ancient Past of South Asia: Studies in Material Culture*, Delhi, Sharada Publishing House, 2016.
- Chowdhury, Abdul Momin and Alam, Aksadul, 'Historical Geography', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Chowdhury, Abdul Momin, 'Threshold of Regional Political Entity', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Chowdhury, Dr. Saifuddin, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh*, Bangla Academy Dhaka, 2000
- Chowdhury, Saifuddin, 'Terracotta Art', edited by Sirajul Islam *Banglapedia,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, Volume-10
- Coomaraswamy, A.K, *History of Indian and Indonesian Art*, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publication, 1972
- Dasgupta, Nupur, 'A Social History of Minor Technologies', in *History of Science and Technology* edited by Ratan Lal Hanglu, New Delhi, Rawat Publications, 2011
- Desai, Devangana 'Indian Terracottas in Their Social Context (c. 600 BCE – c. 600)', in *Art and Icons: Essays on Early Indian Art*, Aryan Books International, 2013
- Desai, Devangana 'Social Background of Ancient Indian Terracottas' (circa 600 B.C. – A.D. 600), Debi Prasad Chattopadhyay (ed*.) History and Society: Essays in Honour of Professor Nihar Ranjan Roy*, K. P. Bagchi & Co., 1978
- Dey, Gauri Shankar and Dey, Subhradeep, *Chandraketugarh: A Lost Civilization, Art and Art Motif*, Sagnik Books, Kolkata 2004
- Dey, Subrata, 'Terracotta Plaques of Pilak' In *Tripura: A Hidden Cultural Heritage*, *Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology* 7, 2019.
- Dhar, Parul Pandya, 'Epic Visions in Terracotta, Stone, and Stucco, Ramayana in Indian Sculpture', in Parul Pandya Dhar (ed.) *Connected Histories of India and South East Asia*, Sage Publications, 2023

- Durga Basu, 'Early Medieval Material Culture of Coastal Bengal with Special Reference to the Site of Kankandighi', *Religion, Landscape and Material Culture in Pre- Modern South Asia* (eds. Tilottama Mukherjee and Nupur Dasgupta) London and New York: Routledge 2023
- Dutta, Dr. Ashok, 'Excavation at Mogalmari: A Pre-Pala Buddhist Monastic Complex', in *Mogalmarir Bouddho Mahavihar Bibidho Prosongo*, edited by Surjo Nandi, Kolkata: Parul Publications, 2016.
- Dutta, Sanjukta, 'Building for the Buddha: Patrons in the Pala Kingdom', *Studies in History*, Jawaharlal Nehru University, 2019
- French, J.C., *The Art of the Pala Empire of Bengal*, London, Oxford University Press, 1928.
- Furui, Ryosuke 'Social Life: Issues of the Varṇa-jāti System', in *History of Bangladesh,* edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakraborty, Vol. 2, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Furui, Ryosuke, 'Buddhist Vihāras in Early Medieval Bengal: Organizational Development and Historical Context', *Buddhism, Law and Society*, 2023, 7, hal-04100180
- Furui, Ryosuke, *Land and Society in Early South Asia, Eastern India 400-1250 AD*, New York, Routledge Publications, 2020
- Gangopadhyay, Kaushik, 'Terracotta Objects in Archaeology: An Ethno-Archaeological Study', edited by Gautam Sengupta and Sheena Panja, *Archaeology of Eastern India,* New Perspectives, Kolkata, Centre for Archaeological Studies and Training Eastern India, 2002
- Ganguli, Manmohan, *Handbook to the Sculptures in the Museum of Bangiya Sahitya Parishad*, Kolkata, Bangiya Sahitya Parishad, 1922.
- Ghosh, Suchandra 'Buddhist Cultural Linkages Between Bengal and Southeast Asia', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 2, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2018

- Ghosh, Suchandra and Pal, Sayantani 'Everyday Life in Early Bengal', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 2, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Ghosh, Suchandra, 'Nature of Royal Patronage in South-Eastern Bengal: 507 AD – 1250 AD', *Journal of Bengal Art*, Vol. 13-14, Dhaka, Bangladesh, ICSBA, 2008-2009
- Ghosh, Suchandra, 'Situating Water Bodies in the Landscape of Early Medieval Bengal and Assam: Gleanings from Epigraphy and Literature', Proceedings of the Indian History Congress, Volume–69, Indian History Congress, 2008
- Ghosh, Suchandra, 'Understanding a Site: Case Study of Mainamati in South Eastern Bangladesh', in *Studies in South Asian Heritage,* edited by Mokammal Hossain Bhuiyan, Essays in Memory of M Harunur Rashid, Bangla Academy, 2015
- Ghosh, Suchandra, *Patronage of Buddhist Monasteries in Eastern India (600-1300 CE),* Oxford Research Encyclopedia, Publication Date: 15th August 2022
- Gupta, P.L, *Gangetic Valley Terracotta Art*, Indian Civilisation series, No. XVIII, Prithivi Prakashan, Varanasi-5 (India), 1972
- Haque, Enamul 'Mahasthangarh: Great Citadel', in *Bengal Site and Sites*, edited by Pratapaditya Pal and Enamul Haque, New Delhi, Marg, 2003
- Haque, Enamul, *The Art Heritage of Bangladesh*, Dhaka, Bangladesh, The International Centre for Study of Bengal Art, 2007
- Haque, Enamul. *Studies in Bengal Art Series: No. 4, Chandraketugarh: A Treasure House of Bengal Terracottas.* ICSBA, Dhaka, 2001.
- Hasan, S. Jamal, 'Buddhist Remains in Tripura', *Journal of Bengal Art*, Vol. 7, Dhaka, ICSBA, 2002. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.811
- Huntington, Susan L. *The Pala-Sena School of Sculpture*, Leiden, E.J. Brill, 1984.
- Hussain, A.B.M(ed.), Mainamati-Devaparvata, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997
- Jahan, Shahnaz Hussain 'Bengal and the Indian Ocean Maritime Trade Network During the Early Historic Period', in *Archaeology of Early Historic South Asia*, edited

by Gautam Sengupta and Sharmi Chakraborty, New Delhi, jointly published by Pragati Publications and Centre for Archaeological Studies and Training Eastern India, 2008

- Kala, S.C, *Terracottas of North India*, Delhi, Agam Kala Prakashan, 1993
- Kingsley, Bonnie M, The Terracottas of the Tarantine Greeks, An Introduction to the Collection in the J. Paul Getty Museum, J. Paul Getty Museum Publication, 1976
- Kramrisch, Stella 'Indian Terracottas', *Exploring India's Sacred Art*, Selected Writings of Stella Kramrisch, Barbara Stoller Miller (ed.), Philadelphia, University of Pennsylvania Publication, 1983
- Kramrisch, Stella, *Indian Sculpture*, London, Oxford University Press, 1933.
- Kramrisch, Stella, *The Art of India*, London, The Phaidon Press, 1954.
- Majumdar, R.C, *History of Bengal,* Volume 1, Dhaka, Bangladesh, The University of Dhaka Publishers, 1943
- Majumdar, Susmita Basu, 'Media of Exchange: Reflections on the Monetary System', In *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 2 Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Mishra, R.N, *Art in Indian Tradition,* New Delhi, Indian Institute of Advanced Study and Aryan Books International, 2009
- Mishra, R.N., *Ancient Artists and Art Activities,* Institute of Advanced Study, Shimla, 1975
- Mitra, Debala, *Buddhist Monuments*, Kolkata, Sahitya Parishad, 1971
- Mukherjee, B.N, 'A Regional Idiom', in *East Indian Bronzes,* edited by Sisir Kumar Mitra, Kolkata, Centre of Advanced Study in Ancient Indian History and Culture, 1979
- Mukherjee, Chandrani Banerjee, 'Nalanda and Vikramshila, Analyzing the Contours of Urbanity', Ancient India, *Modern Historical Studies*, Volume-13-14, 2019-20
- Mukherjee, Meera, *Folk Metal Craft of Eastern India*, New Delhi, All India Handicrafts Board, Govt. of India

- Mukherjee, Samir Kumar, 'A Note on Some Buddhist Antiquities in Terracotta from West Bengal', *Journal of Bengal Art*, Vol. 1, The International Centre for Study of Bengal Art, 1996
- Mukhopadhyay, Chitralekha, 'Social Background of Donors in Early Medieval Bihar and Bengal', *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 69, 2008
- Neumann, Erich, *The Great Mother; An Analysis of the Archetype,* translated by Ralph Manheim, Princeton University Press, 1974
- Pal, Pratapaditya (ed.), *Indian Terracotta Sculpture: The Early Period,* Volume 54, Marg, 2002
- Pal, Sayantani, 'Religious Patronage in the Land Grant Charters of Early Bengal (Fifth – Thirteenth Century)', in *Indian Historical Review*, 41(2), Sage Publications, 2014
- Panja, Sheena 'Jagjivanpur and Bangar: Northern West Bengal', in *History of Bangladesh,* edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1 Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Picron, Claudine Bautze, 'Images of Devotion and Power in South and Southeast Bengal', *Esoteric Buddhism in Medieval Maritime Asia,* Singapore, ISEAS Press, 2012
- **Prasad B.N.,** *Rethinking Bengal and Bihar*, New Delhi, Manohar Publications, 2022.
- Prasad, Birendra Nath, *Archaeology of Religion in South Asia,* London and New York, Routledge, 2021
- Rahman, Shah Sufi Mostafizur, 'Recent Discovery of Glass Beads from Mahasthangarh: An Archaeological Perspective', in *Journal of Bengal Art*, Vol. 4, ICSBA, 1999
- Rahman, Shah Sufi Mostafizur, *Archaeological Investigation in Bogra District, (From Early Historic to Early Medieval Period),* Studies in Bengal Art Series, International Centre for Study of Bengal Art Publication, Dhaka, Bangladesh 2000
- Rao, Vinay Kumar, 'The Terracotta Plaques of Pagan: Indian Influence and Burmese Innovations', in *Ancient Asia* 4, 2013

- Ray Chowdhury, Seema. 'Terracotta Art' In Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakrabarti (eds.), *History of Bangladesh*, Volume 2, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018.
- Ray, Amita, 'Some Stucco Sculptures from Rajbaridanga, Murshidabad', *Journal of the Varendra Research Museum*, Rajshahi Bangladesh, University of Rajshahi, 1974
- **Ray, Krishnendu, '***Aspects of Rural Social Life in Early Medieval Bengal: Glimpses from the Saduktikarnamrita of Sridhardasa (Early 13th Century)'* in *Journal of Bengal Art*, Vol. 18, Dhaka, ICSBA, 2013.
- Rezowana, Sharmin, 'Representation of Lotus on Terracotta Plaques 4th to 13th Century C.E, in *ICON - Journal of Archaeology and Culture,* edited by Brijesh Rawat, Bhopal/New Delhi, Wakankar Rock Art and Heritage Welfare Society in Association with BR Publishing Corporation, Volume-4 2017
- Roy Chowdhury, Sima, 'Style and Chronology: Problems in Evolving a Temporal Framework for the Early Historical Terracottas from Bengal', in *Archaeology of Eastern India, New Perspectives*, Edited by Gautam Sengupta and Sheena Panja, Centre for Archaeological Studies and Training Eastern India, Kolkata, 2002
- Roy Chowdhury, Sima, 'Terracotta Art', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Asiatic Society of Bangladesh, Volume-2, Bangladesh, 2018
- Sahai, Bhagwant, *Iconography of Some Important Minor Hindu and Buddhist Deities*, Abhinav Publication, New Delhi, 1975
- Salles, Jean-François, 'Mahasthan', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1 Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Sanyal, Rajat, 'Antichak', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Asiatic Society of Bangladesh, Bangladesh, 2018, Volume-1
- **Sanyal, Rajat**, *'Inscribed Sculpture*', in *Vibrant Rock*, Edited by Gautam Sengupta and Sharmila Saha, Kolkata: Directorate of Archaeology and Museums, Government of West Bengal, 2014.

- Sanyal, Rajat, 'Moghalmari', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Saraswati, Sarasi Kumar, *Early Sculpture of Bengal*, Sambohi Publications, Kolkata, 1962
- **Saraswati, Sarasi Kumar, Sarkar, Kshitish Chandra and Kramrisch, Stella** *Kurkihar, Gaya and Bodhgaya*, Rajshahi, 1936.
- Sen, Swadhin and Alam, Mohammad Shafiqul, 'Paharpur', in *History of Bangladesh,* edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Sengupta, Arputharani, *Art of Terracotta: Cult and Cultural Synthesis in India,* Delhi, Agam Kala Prakashan, 2005
- Sengupta, Gautam 'New Evidence on Early Bengal Sculpture', in *Studies in Art and Archaeology of Bihar and Bengal*, edited by Dr. Debala Mitra and Dr. Gaurishwar Bhattacharya, Delhi: Shri Satguru Publications, 1989
- Sengupta, Gautam, 'Art of South Eastern Bengal: An Overview', in Ashok Kumar Bhattacharya (ed.), *Journal of Ancient Indian History*, Vol. 19, 1989-90, Kolkata, Department of Ancient Indian History and Culture, Calcutta University, 1994
- Sengupta, Gautam, 'Donors of Images in Eastern India (c.800 – 1300 AD.)', in *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 43, 1982
- Sengupta, Gautam, 'Nandadirghivihāra: An Overview', *in Ganga Brahmaputra and Beyond: Exploring Art and Iconography of Eastern and North Eastern India*, Delhi, Primus Books, 2023
- Sengupta, Gautam, 'Stucco Statuary in Eastern India', in *Akshayanivi*, (ed. Gauriswar Bhattacharya), New Delhi: Sri Satguru Publications, 1991
- Sengupta, Gautam, *Ganga Brahmaputra and Beyond: Exploring Art and Iconography of Eastern and North Eastern India*, Delhi, Primus Books, 2023
- *Sengupta, Gautam, Ganga Brahmaputra and Beyond: Exploring Art and Iconography of Eastern and North Eastern India.* Delhi, Primus Books, 2023.

- Sengupta, Gautam, Roy Chowdhury, Sima, and Chakraborty, Sharmi, *Eloquent Earth, Early Terracottas in the State Archaeological Museum* West Bengal, Kolkata: Directorate of Archaeology and Museum, West Bengal and Centre for Archaeological Studies and Training, Eastern India, 2007
- Sengupta, Sanjay 'Terracotta Ornamentation on the Religious- Architectures of Bengal: Gradual Deconstruction of Cultural-Units through the Expanse of Lokāyata', *Journal of Bengal Art,* Vol. 25, ICSBA, January 2020
- Shen, Chen, *The Warrior Emperor and China's Terracotta Army*, Toronto, Ontario, Canada, Royal Ontario Museum Press, 2010
- Singh, A.K., and Dilip Kumar (eds.). *Antichak Excavations Report (1960–69).* Patna, Bihar, Department of Ancient Indian History and Archaeology, Patna University.
- Singh, Upinder, *A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the Twelfth Century*, Delhi, Pearson Longman, 2008,
- Sourav, Shohrab Uddin, 'Terracotta Art from Early Historic to Pre-Medieval Period' in *Archaeological Heritage*, edited by Sufi Mostafizur Rahman, Dhaka, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, December 2007
- Sourav, Sourab Uddin and Rezowana, Sharmin, 'Animal Representation (Mammals) in Sompur Mahavihāra in Situ Terracotta Plaques', *Journal of Bengal Art*, Vol. 17, Dhaka, ICSBA, 2012
- Sourav, Sourab Uddin and Rezowana, Sharmin, 'Krishna Legend in Bhabadev Bihar', in *Journal of Bengal Art*, Vol. 20, Dhaka, ICSBA, 2015
- Srivastava, S.K, *Terracotta Art in Northern India*, Delhi, Parimal Publications, 1996
- Thapar, Romila, *The Penguin History of Early India from the Origin to AD 1300*, New Delhi, Penguin Books, 2002
- Tiwari, Sachin Kr., 'Stucco Art of Nalanda, Excavated Site, District Nalanda, Bihar: An Archaeological Overview', in *Annals of Archaeology,* Volume 1, First Edition, New Delhi Sryahwa Publications, 2018

Books/Articles in Bengali:

- অর্ণব চ্যাটার্জী, "পূর্ব ভারতের স্টাকো শিল্প", *ইতিহাস অনুসন্ধান,* (সম্পা. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়) কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০২৩

- আক্তার, সাহিনা "সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে বাংলার সমাজজীবন", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুস্ত্রিংশ খন্ড, শীত সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৬
- আখতার, শরমীন, 'ময়নামতি-লালমাই প্রত্নস্থলের পোড়ামাটির ফলকচিত্রে সমতট অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা', *প্রত্নতত্ত্ব,* জার্নাল অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ভলিউম-১৭,জুন ২০১১
- ঘোষ, দেবপ্রসাদ - *ভারতীয় শিল্পধারা (প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত)* , সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬
- ঘোষাল, জয়দীপ 'প্রাচীনকালের মৃৎপাত্রের নির্মাণশৈলী জানার প্রেক্ষাপটে বীরভূম জেলার সর্পলেহনা গ্রামের আধুনিক কুম্ভকারদের উপর একটি সমীক্ষা', *ইতিহাস অনুসন্ধান,* (অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) খন্ড- ৩৮, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০২৫
- চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , কলকাতা, স্যান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, ১৩৭৮
- বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালির দান,* কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৬৯
- ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় , *আদি মধ্যযুগীয় ভারতে গ্রামীণ বসতি ও গ্রাম সমাজের কয়েকটি দিক* , (সায়ন্তনী পাল অনুদিত), কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২২
- মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ - *বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত,* প্রগ্রেশিভ পাবলিশার্স কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০০
- মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ, *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে,* কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯)
- মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন ও শরমিন রেজয়ানা, *পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাচীন বাংলার নৃত্যগীত, প্রত্নতত্ত্ব,* বাংলাদেশ, জার্নাল অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ২০১৪

- যাকারিয়া, আব্দুল কালাম মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪
- রহমান, শাহ সুফী মোস্তাফিজুর সম্পাদিত, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭
- রায়, নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, দেজ' পাবলিশিং, ১৪০২
- সরকার, দীনেশ চন্দ্র , *শিলালেখ- তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ,* কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৮২
- সেনগুপ্ত, গৌতম 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত আদি ঐতিহাসিক যুগের পোড়ামাটির শিল্পঃ অনুসন্ধানের রূপরেখা', আগ্নিক ভট্টাচার্য সম্পাদিত *ইতিবৃত্ত,* দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত, খণ্ড-২, ২০১৫
- সেনগুপ্ত, গৌতম ও সেনগুপ্ত, মধুরিমা, 'প্রাচীন বাংলার লোকায়ত শিল্পধারা', *লোকশ্রুতি,* রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৪
- সৌরভ, সৌরভউদ্দীন, 'পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকচিত্রে উদ্ভিদবৈচিত্র্যের প্রতীকায়ন', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১০
- হোসেন, মোহা. মোশাররফ এবং রহমান, ড. মো. আতাউর, *মহাস্থান,* প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৬